সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

(সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্য)

নন্দরাণী চৌধুরী

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৪ এলগিন রোড
কলিকাতা-২০

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পক্ষে প্রণতি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও লোক-সেবক প্রেস, ৭৬-এ আচার্য জগদীশ বসু রোড হইতে মুদ্রিত।
প্রকাশ কাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭

মুখবন্ধ

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট রবীন্দ্রচর্চার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার একটি হলো বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে রবীন্দ্র আলোচনা সংগ্রহ। এই সংগ্রহের কাজ ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা গত পাঁচ বছর ধরে করে চলেছেন।

এই খণ্ডটি ওই ধারার প্রথম গ্রন্থ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় দীর্ঘকাল রবীন্দ্রআলোচনা করেছেন। **শ্রীমতী নন্দরাণী চৌধুরী** সেগুলির সংকলন করেছেন ও বহু শ্রম স্বীকার করে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে প্রথম খণ্ডটিকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

পরবর্তী খণ্ডে প্রবাসী থেকে রবীন্দ্র বিষয়ক যাবতীয় সংবাদ ও আলোচনা সংকলিত হবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
সভাপতি, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

॥ নিবেদন ॥

বিগত ৩০শে মার্চ ১৯৩০ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জন্ম শত বর্ষ পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষে কোথাও কোনও অনুষ্ঠান বা সভা-সমিতির আয়োজন হয়েছিল বলে জানি না। বাঙলা দেশের মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। একালের বাঙলা সাহিত্যের পাঠক তাঁকে চেনে না। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক-সমালোচকের পক্ষে তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনাগুলির সংগে পরিচয় রাখাও প্রয়োজন। সেই কারণেই টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে এবং পরম প্রীতিভাজন বন্ধু অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর নির্দেশে ও সাহায্যে আমি এই গ্রন্থ মারফৎ-সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পরিচয় ও রবীন্দ্র সমালোচনার অংশ-বিশেষ সংকলন করে পাঠক সাধারণের কাছে পেশ করছি।

পূর্বে আমার ধারণা ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন লিপিকার বন্ধ কাণা 'গলি'র মতন। যে দুপুর বেলায় কেবল একটুখনের জন্য সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে—'কিছুই বোঝা গেল না।' জানতাম মহাকবি আর নির্মম সমালোচকের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান আর সেই ব্যবধান বিদ্বেষ-বিষাঙ্কুরে আকীর্ণ। একজন সকল কাঁটা ধন্য করে অজস্র ফুল ফুটিয়ে গেলেন,—অপর জন ফুলগুলি ছিন্ন ভিন্ন করে ফসলের ক্ষেতকে কাঁটাগাছে ভরে দিয়ে গেলেন। কিন্তু যত বেশী করে সুরেশচন্দ্রের সমালোচনার সংগে পরিচিত হয়েছি ততই মনে প্রশ্ন জেগেছে—"তাই কি?" কানে বেজেছে সমাজপতির কথা "নবযুগের বাংলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা বাদ দেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তাঁহার জন্য দাশুরায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা।" মনে হয়েছে মরু-ভূমির গভীরে থাকে ফল্গু, আমাদের অগোচরে নিভৃত সূর্য পরিক্রমার পথে আছে কত অনাবিষ্কৃত গ্রহ! সমাজপতির মনের গভীরে কোনও তপস্যা ছিল কি না সেই অনুসন্ধান সার্থকভাবে করতে পারি এমন সামর্থ আমার নেই তাই তার দায়িত্ব রইল পাঠকদের উপর।

যাঁদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, উপদেশ আমার বক্তব্য বিশদ করার উপযোগী তথ্য আহরণের ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে এই গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষ্যে আজ সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

প্রুফ দেখায় যাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন তাঁরা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—

তাঁদের নিজেদের কাজ মনে করেই তা তাঁরা করেছেন তবু তার মধ্যে পুত্র শ্রীমান্ গৌতম চৌধুরীর উৎসাহ মনে রাখবার মত।

সবশেষে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়ে একাজ করিয়েছেন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

নন্দরাণী চৌধুরী

"ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ংকর ভক্ত যেমন রাবণ।"

ভূমিকা

'কিমিদম্' ? আদি কবি বাল্মীকির মতই সাহিত্যের স্বরূপ জানবার আগ্রহে মানুষের ঐ একটিই জিজ্ঞাসা—। যুগে যুগে এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন, দিচ্ছেন তাঁরা সমালোচক। তাঁরা সাহিত্যের মূল্য-মান, রূপ-রস আমাদের কাছে বিশদ করেন, ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের আসন লেখক আর পাঠকের মাঝখানে। কাজ তাঁদের মধ্যস্থতার। যেমন পাঠক আর পাঠ্যপুস্তকের মাঝখানে অধ্যাপক, ভিন্ন ভাষাভাষী শ্রোতা আর বক্তার মাঝখানে দোভাষী, অচেনা দেশে অপরিচিত পরিবেশ ও বিদেশী ভ্রমণবিলাসীদের মাঝখানে গাইড, উপাস্য এবং উপাসকের মাঝখানে পুরোহিত,

An interpreter between the inspired and the uninspired.—

(কার্লাইল)

এই শেষতম কাজটিই তাঁর প্রধান কাজ এবং দুরূহতম কাজ। অধ্যাপকের মত ব্যাখ্যা, দোভাষীর মত ভাষাজ্ঞান, গাইডের মত নির্ভুল তথ্যনিষ্ঠা পুরোহিতের মত ভক্তিযোগ--প্রভৃতি গুণগুলির সংগে তাঁর এমনি একটি দুর্লভ ক্ষমতা থাকা চাই যার ফলে তিনি একটি আলোভরা মনের খবর সার্থক বার্তাবহের মত আর একটি মনে পেঁৗছে দিয়ে সেখানেও আলো জ্বালিয়ে তুলতে পারেন। বাতাস যেমন সহজেই পুষ্পসৌরভ পেঁৗছে দেয় আমাদের ঘ্রাণশক্তির কাছে। আপাতঃ সহজ অথচ দুর্লভতম এই গুণটির অভাবেই অনেক নামী সমালোচকের সমালোচনাই মানবমনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা বহু থাকতে পারেন কিন্তু সার্থক সাহিত্য সমালোচক কোটিকে গোটিক।

"কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী"—কণ্ঠকে এমন সুরবাহারে পরিণত করা যেমন সকল সুরজ্ঞের পক্ষে সম্ভব হয় না, তেমনি সমালোচনার যথাবিহিত গুণাবলীর সুসম্পূর্ণ অনুশীলন অনেক সমালোচকের পক্ষেই অসম্ভব। তাই প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, দৃষ্টিকোণ অনুসারে নানা সমালোচক নানা ধারায় সমালোচনা করে থাকেন। তার থেকেই সমালোচনার নানা শাখা উপশাখার সৃষ্টি। নিজস্ব ধারায় এগিয়েও অনেক সমালোচক তাঁর অন্বিষ্টকে খুঁজে পান না। তিনিই ভাগ্যবান যিনি হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, সোনার পাহাড় ডিঙিয়ে রসবতী রাজকন্যের সন্ধান পান। অর্থাৎ বাধার বিন্ধ্য পেরিয়ে, অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনির পর্ব-পরম্পরা এড়িয়ে মূল রসলোকে প্রবেশ করতে পারেন। সমালোচকরা নানা ভিন্ন পথে এই রসলোকের অন্বেষণ করেছেন। যুগভেদে আর দেশভেদে তার ভিন্ন নাম ভিন্ন দাম। সমালোচকদের কেউ বা প্লেটো-এরিষ্টটল, কেউ বা আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্ত কেউ বা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ। দেশের মানুষ কাউকে বা স্বীকৃতি দিয়েছে, কাউকে দেয় নি। কেউ বা পেয়েছেন খ্যাতির বরমাল্য কারো বা ভাগ্যে শুধুই অখ্যাতির বিড়ম্বনা।

সমালোচনার কথা

আমাদের বাঙ্গলাদেশে সমালোচনার ইতিকথা কদিনেরই বা! বড়জোর একশো বছরের, আর তারও উদ্ভব য়ুরোপীয় সাহিত্য ও আদর্শের প্রভাবেই। বৈষ্ণবযুগে

কেবল সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক টীকা লেখা হয়েছিল। মধ্যযুগে বা মঙ্গলকাব্যের যুগেও পূর্ণাঙ্গ কোনও সমালোচনা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। মধ্য যুগের শেষভাগে সাহিত্য বিচারের মত মন এবং রসবোধের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের মধ্যে। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের চূড়ান্ত ঘোষণা—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' ভারতচন্দ্রের জানা ছিল। তিনি লিখেছেন—

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

এরপর ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙলাদেশের জীবনে ও সাহিত্যে আশ্চর্য পটপরিবর্তন দেখা দিল। ঊনিশ শতকের ৫০ বছরের মধ্যেই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, বিদ্যাসাগরের হাতে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ও সাময়িকপত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি আর পুষ্টি হোলো—বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের উপযোগী সুদৃঢ় ও যথাযোগ্য ক্ষেত্র তাঁরাই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল হোগলকুড়িয়ার কবি ও সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে'র। তিনিই প্রথম এই পত্রিকায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কবিয়ালদের জীবনী ও কাব্যসংগ্রহ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁরই সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে' তৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হোত। সাময়িক পত্রে পুস্তক সমালোচনার সেই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। তাঁকে ঘিরেই সেদিন ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যরথীরা একটি সাহিত্যমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। সাময়িকপত্রে সাহিত্য বিচার বা গ্রন্থ সমালোচনা এর পর চালু হয়ে গেল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র মধ্য দিয়ে সমালোচনা সাহিত্য পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোল উনিশ শতকের সপ্তম দশকে। সেখানেও শিরোনাম বঙ্কিমচন্দ্রের এবং তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার! তাঁর বঙ্গদর্শনেই প্রকৃত সমালোচনা সাহিত্যের সংগে তৎকালীন মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। তিনি শুধু ভাবীকালের সমালোচকদের জন্য পথ নির্মাণই করেন নি—পথ-নির্দেশও দিলেন। সব্যসাচী তিনি। তাঁর যেমন পালন তেমনি শাসন, যেমন গ্রহণ তেমনি বর্জন। সে যুগে তাঁর নিষেধ ছিল অনিবার্য, প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য। ঊনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর তাঁরই চরণমুদ্রার অনুসরণে, কেবলমাত্র পদ্ধতিতে ঊনিশ বিশ হেরফের ঘটিয়ে, পথ চলেছেন সে যুগের নামী সমালোচকেরা। পদ্ধতিগত অনুসৃতি সত্ত্বেও প্রতিভার অভাবে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও আসতে পারলেন না। এ'রা হলেন রাজনারায়ণ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সুধীবৃন্দ।

কিন্তু বিশ শতকের আগেই বাংলাদেশে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হোল। যা ছিল পথ তাই তখন প্রবাহ হয়ে দেখা দিল। যেমনি তার বিস্তার, তার গভীরতা, তেমনি তার প্রাণবান গতি। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিভাবকত্বের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশভরা আলোর তলায় বুকভরা আশা নিয়ে মুক্তিপাগল মানুষ ধ্বনি তুলেছিল—ভাঙরে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন।' এ যুগে মহানায়কত্ব একা রবীন্দ্রনাথের। সমালোচনার ইতিহাসেও সে এক উজ্জ্বল সূর্যের আলোভরা অধ্যায়—মানুষ আনন্দে অধীর হয়ে বলেছে—

"ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।"

না—অবশ্যই সব মানুষ সেদিন এ আনন্দের সমান অংশীদার ছিলেন না, হতে পারেন নি। ঊনিশ শতকী সাংস্কৃতিক আশ্রয়ের বাতায়নতলে তাঁরা তখন দিশেহারা। বহুদিনের বহু আরামের উষ্ণ উত্তপ্ত বালাপোষের মত যা আশ্রয় দিয়েছে সেই মর্মে মর্মে জড়ানো মূল্যবোধের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা কি সহজ কথা? তা ছাড়া ছিল সংশয়; নোতুনকে বিশ্বাস করার মত মনোবল আর সাহসের অভাব। এঁদের একদল চাইলেন তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের তর্কাতীত সিদ্ধান্তগুলি আরো জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে—যেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন দুর্ভেদ্য নীতিবোধের বর্ম পরে। অপর দল স্পষ্টতই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড উঁচিয়ে ধরলেন, উৎসাহের আতিশয্যে কেউ কেউ বা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষোদ্গারের মাধ্যমে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি সুরু হোলো দুই পক্ষেই। গত শতাব্দীর যে সব পত্রিকার সমালোচনার জ্বালামুখ থেকে উদ্গীর্ণ হোত বিষবাষ্প, তাদের মধ্যে "সাহিত্য" পত্রিকার নাম সর্বাগ্রে। সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সুরেশচন্দ্রের জীবনী

সুরেশচন্দ্রের জীবন বংশগৌরবে গরীয়ান। বাংলা দেশের যে প্রাতঃস্মরণীয় নামটি চরিত্র দৃঢ়তায় ও মানবমহত্ত্বের উত্তুঙ্গতায় প্রায় এভারেস্ট শৃঙ্গের মত, সেই মহামতি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন সুরেশচন্দ্র। মাতা ছিলেন বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠাকন্যা হেমলতা দেবী, পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল। সমাজপতি এঁদের উপাধি ছিল। আদি বাসস্থান ছিল কৃষ্ণনগর জেলার অংশমালী গ্রাম। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ (১৮ই চৈত্র ১২৭৬) কলকাতায় সুরেশচন্দ্রের জন্ম।

স্বয়ং বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সুরেশচন্দ্র এবং তাঁর ভাই যতীশচন্দ্র বাড়ীতেই লেখাপড়া করেছিলেন। এঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের স্কুল কলেজ থাকা সত্ত্বেও স্কুলে পড়েন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় চেয়েছিলেন—"ভাল করে পড়াশুনা করে ওরা বাঙ্গলা শিখবে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখতে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুরেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর "সাহিত্য সেবকের ডায়ারী"তে।

সাহিত্যসেবা

সুরেশচন্দ্র আজীবন বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করেছিলেন নানাভাবে। তৎকালীন পত্র পত্রিকায় তিনি গল্প, কবিতা, সমালোচনা লিখেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন, (বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙ্গালী প্রভৃতি). বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যাপারেও দীর্ঘকাল সহায়তা করেছেন। মূল সংস্কৃত থেকে তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'কল্কিপুরাণ' এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'টু আর্মস' এর বঙ্গানুবাদ তাঁর এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

কর্তৃক বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া ডাবলিউ এল কোর্টনি ও জে এম কেনেডি রচিত হাউ দি ওয়ার বিগ্যান—এর অনুবাদ তাঁর সম্পাদনায় "হম্ভার এণ্ড ষ্টাউটন" কোম্পানীর পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে এই অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়া সাজি (গল্প সংকলন গ্রন্থ), ছিন্নহস্ত (ডিটেকটিভ উপন্যাস), আগমনী (সম্পাদিত—পূজাবার্ষিকী), কবিতাপাঠ (সংকলিত পাঠ্যপুস্তক) প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে "বঙ্কিম প্রসংগ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থশেষের চারটি প্রবন্ধই বঙ্কিম সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের স্মৃতি-কথা। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁর অনেক রচনা এখনো পুরাতন পত্রিকায় আছে—যাদের একটি তালিকা শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' সিরিজের ৫ম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

প্রতি যুগের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের মত তিনিও কয়েকখানি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন। গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের নাম যথাক্রমে নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাসের পত্র, হরিশচন্দ্র নিয়োগীর ২য় সংস্করণ 'বিনোদমালা' এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের তৃতীয় সংস্করণ 'প্রদীপ'।

সুরেশচন্দ্র যে একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসেবাই করতেন এ বিষয়ে এর পর আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। এ ছাড়াও সে যুগে সুরেশচন্দ্রের খ্যাতি ছিল বাগ্মী হিসেবে। এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"সুরেশচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অনেকেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি কখনও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতেন না, বরং এরূপ করাকে অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেন। সাধু ভাষায়, স্বল্প সময়ে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তিনি শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করিতে পারিতেন।"

সুরেশচন্দ্র একাধারে লেখক, সম্পাদক, সমালোচক, বাগ্মী হিসাবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেও কেন যে একালের মানুষের মন থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছেন তার কারণ অনুসন্ধান করা অনুচিত নয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অপুত্রক সুরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে সুরেশচন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছি। কখনো কোথাও সুরেশচন্দ্রের রচনার কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি চোখে পড়েছে যা তাঁকে রবীন্দ্রবিদ্বেষী সমালোচক হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত করেছে। বলা বাহুল্য যাঁরা তাঁর এই পরিচয়টুকু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁরা রবীন্দ্র-অনুরাগী, রবীন্দ্র-ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা, কঠোরতম সমালোচনায় তাঁরা মর্মাহত হয়েছেন, তাই সুরেশচন্দ্রের ঐ পরিচয়টুকু ব্যতীত তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলেন নি। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালা সিরিজের ৫ম ভাগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্যকৃতির উল্লেখ কালে তাঁর রবীন্দ্র-বিদ্বেষের কোনও উল্লেখ করেন নি বরং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সমালোচনা পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন—

"অপেক্ষাকৃত সামান্য আয়োজন লইয়া বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা প্রভূত খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই প্রধানতঃ এই খ্যাতির কারণ। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও

সরস বাক্যবাণের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা একটা বিশিষ্ট ভংগী অর্জন করিয়াছিল এবং উত্তরকালে তাঁহার অন্য সকলবিধ রচনার স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও এই সমালোচনার জন্য রসিক-সমাজ তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্টিকার্যে উদ্বুদ্ধ কারবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল ; তিনি নিজে যতটুকু সাহিত্যসৃষ্টিই করিয়া থাকুন, সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর এই কারণে আমরা সমাজপতিকে শুধু একজন সাহিত্যিকরূপে গণ্য না করিয়া যুগ হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্যে' এই যুগের পরিচয় অক্ষয় হইয়া আছে।"

সাহিত্যপত্রিকার কথা

সাহিত্য পত্রিকার অংকুরোদ্গম হয়েছিল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' (১২৯৬ শ্রাবণ; জুলাই ১৮৮৯) নামক পত্রিকায়। সে ইতিহাস ২৯ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। বৈশাখ। ১৩২৬ এর 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। সে ইতিহাসটুকু উদ্ধারযোগ্য।

"উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যের' ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ সালে উপেন্দ্র-বাবু ৩নং বিডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক একখানি মাসিক পত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে, এবং আমি উপেন বাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে, এবং বর্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, আমার অগ্রজতুল্য সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমের' কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষের 'সাহিত্য কল্পদ্রুম" নয় মাসে সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম খন্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি, এবং কল্পদ্রুম বর্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' নামে ষ্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জন্য প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যের' মলাটে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' এর নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যের' স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যের' স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর, বোধ হয় ১২৯৮ সালে, উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'-এর সম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে' বন্ধ করিয়া দেন।

উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যের' প্রথম প্রবর্তক, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহার ও তাহার সম্পাদকের হিতৈষী ও অনুরাগী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সূত্রে জড়াইয়া নিয়তি আমাকে 'সাহিত্যের' সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ মহা-

কালের ইঙ্গিতে কোথায় উড়িয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু সেই ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। গত বৎসর কাগজের অভাবে 'সাহিত্য' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের' জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন 'সাহিত্য' ও তাহার সম্পাদক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। * * *

যে সাহিত্য আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায় বিশেষেরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যের' প্রচার,—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।"

এখানে বক্তব্য এই যে যথার্থ সাহিত্যসেবীর শ্রদ্ধা নিয়েই সুরেশচন্দ্র এখানে উপেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশ ব্যাপারে একক কৃতিত্বের সম্মান দাবী করেন নি—বরং যথার্থ সততার সংগে উপেন্দ্র-নাথের ঋণ স্বীকার করে সম্পাদকের যোগ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছেন।

সাহিত্য কল্পদ্রুমের আশ্রয় ত্যাগ করে 'সাহিত্য' পত্রিকা সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাস থেকে ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদনায় সাহিত্য কল্পদ্রুমও প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম বর্ষের সাহিত্য কল্পদ্রুম নবম সংখ্যায় শেষ হওয়ায় "সম্পাদকের নিবেদনে" সুরেশচন্দ্র লিখেছিলেন—

"এই পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অন্য ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। বিগত মাঘ মাসে আমি প্রকাশক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' সম্পাদন ভার গ্রহণ করি।*** পূর্বতন সম্পাদক মহাশয় যে পথে গিয়েছিলেন, আমি ,নানা কারণে একেবারে সে পথ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ, সকল বিষয়ে, তাঁহার অনুসৃত পথেও চলিতে পারি নাই। এই উভয় সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, নবম সংখ্যায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' প্রথম বৎসর শেষ করিতে হইল ......"

বহুদিন ধরেই নিজস্ব সম্পাদনায় মাসিকপত্র প্রচারের বাসনা ছিল সুরেশচন্দ্রের। তিনি মথুরানাথ সিংহের সহায়তায় 'সাহিত্য' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের বন্দোবস্ত যখন পাকা করে এনেছিলেন এমন সময় উপেন্দ্রনাথের অনুরোধে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' ভার গ্রহণ করায় 'সাহিত্যের' প্রকাশ বিলম্বিত হয়।

'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামটি সুরেশচন্দ্রের মনোমত ছিল না। তিনি "সম্পাদকের নিবেদনে" লিখেছেন—"জগতে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় কি? অতএব 'কল্পদ্রুমের' ন্যায়, যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ সাহিত্য দিয়া তৃপ্ত করিব, আমাদের এমন দুরাশা নাই।" সুতরাং সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৯৭ সালের বৈশাখে 'কল্পদ্রুম' কাটা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হয় তখনও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পত্রিকার প্রকাশক ও কার্যাধ্যক্ষ রইলেন। কিন্তু ১২৯৮ সালে সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' আশ্রয় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রকাশ করেন। তখন তিনি নিজেই সাহিত্যের স্বত্ত্বাধিকারী হলেন। এ প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ

মুস্তফী ১২৯৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় বর্ষের সাহিত্য কল্পদ্রুমে "নববর্ষের নূতন কথায়" লিখেছিলেন "আমাদের সাহিত্য কল্পদ্রুমেরও একটি বৎসর পূর্ণ না হইতে, 'সাহিত্য' আসিয়া, ইহার ছায়ায় আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বটবৃক্ষ, যেমন ছেদককেও ছায়া দান করে, তেমনই 'কল্পদ্রুম'ও, নিজ জীবনের দ্বিতীয় বর্ষটি উদযাপন করিয়াছে। গত ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য 'কল্পদ্রুমের' ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়া, এ বৎসর বেশ শক্ত সমর্থ হইয়াছে, নিজে চলিতে ফিরিতে পারে, দুকথা বলিতে কহিতে ও পথ চিনিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, তাই, এবার আর "আওতায়" না থাকিয়া, উপযুক্ত মালী দ্বারা সাহিত্য-উদ্যানের অপর এক পরিষ্কৃত স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।" - - ব্যোমকেশ বাবুর এই 'নূতন কথায়' সুরেশচন্দ্রের উপরেও এক ঝলক নূতন আলোকপাত হয়েছে। উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'ছেদক' কথাটি যথেষ্ট ইংগিতবহ এবং সুরেশচন্দ্রের কারো "আওতায়" না থাকার কারণ হিসেবেও কথাটি তাৎপর্যময়। নির্মম সমালোচক সুরেশচন্দ্রের যে বিরোধ প্রবণতা সে যুগের সাহিত্যসেবী মাত্রেরই নিকট ভীতিপ্রদ ছিল তারই মূলসূত্র ব্যোমকেশ বাবুর উদ্ধৃতিটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।

১২৯৭ এর বৈশাখ থেকে ১৩২১ এর চৈত্র পর্যন্ত এবং ১৩২৩ এর বৈশাখ থেকে ১৩২৭ এর কার্তিক পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল সুরেশচন্দ্র যথার্থ কৃতিত্বের সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। ১৩২২ সালে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি কিন্তু কেন হয় নি তার কোনও কৈফিয়ৎ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় সম্পাদক দেন নি।

জনপ্রিয়তায় 'সাহিত্য' ছিল প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়—

'সাহিত্য' দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অচিরাৎ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকার গৌরব অর্জন করিল। বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এমন অল্প লেখকই আছেন, যাঁহাদের কোন-না-কোন রচনা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ না করিয়াছিল। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশ করিতে পারিলে অনেক লেখকই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন,—'সাহিত্যের' এমনই সুনাম ছিল।"

'সাহিত্যের' পরিচয়

১২৯৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে সাক্ষাতের স্মৃতিকথায় সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি 'সংস্করণ পরিচিতি' দিয়েছিলেন,—

"সেকালে 'সাহিত্যের' একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব সরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকা। ইহা 'রাজ-সংস্করণ'। রাজ সংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ অথবা সংস্করণের রাজা তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। একজন গ্রাহক হইয়াছিলেন .... টাঙ্গাইলের জমিদার কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী.........।" অবশিষ্ট নিরানব্বই খানি নির্বাচিত সুধীবৃন্দের মধ্যে বিলি করা হোত। অবশ্য সাহিত্যের এ চিত্র একেবারে তার শৈশবের। সাহিত্য

পত্রিকার ১২৯৯ সালের আখ্যাপত্রটি—সাহিত্য/মাসিকপত্র ও সমালোচনা/শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত/তৃতীয় বর্ষ/১২৯৯/কলিকাতা/২৩নং বিদ্যাসাগরের ষ্ট্রীট সাহিত্য কার্যালয় হইতে/শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত/ও/১৭নং রঘুনাথ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, মনিকা প্রেসে/শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত। এইভাবে পরিকল্পিত ছিল। পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপা ছিল রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী। সেকালে সাহিত্য পত্রিকায় প্রবীণ ও নবীন অনেক লেখকের রচনা স্থান পেত। কিছু নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—

অক্ষয়কুমার বড়াল, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, কুলভূষণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, চন্দ্রনাথ বসু; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়; ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নলিনীকান্ত মুখো-পাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, প্রজ্ঞাদেবী, প্রমীলা নাগ; প্রিয়নাথ সেন; বিনয়কুমারী বসু; মথুরানাথ সিংহ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শরৎ-চন্দ্র দাস; শৈলেশচন্দ্র মজুমদার; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার; সখারাম গণেশ দেউস্কর; সতীশচন্দ্র ঘোষ; সরলাবালা সরকার; সরোজকুমারী দেবী; হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়: হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি।

'সাহিত্য' লেখক গৌরবে গরীয়ান তো ছিলই, উপরন্তু ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতির বিশিষ্ট পদ্ধতির মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, যা পাঠ করবার জন্য সেকালের পাঠকগণ উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন।

সম্পাদক সুরেশচন্দ্র

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সম্পাদনা ও সমালোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'সূচনায়' এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'সূচনায়' পাঠকদের অবহিত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লিখিত মতামতগুলি সমালোচক সুরেশচন্দ্রের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং আশা করা যায় সুরেশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে সাহায্য করবে। তিনি লিখেছিলেন—

"কর্তব্য কার্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে হয়। সামাজিক বা অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে যদি কেহ স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ মতবাদ দেখিতে পান, আশা করি, সেজন্য আমাদের অপরাধী করিবেন না। নিরপেক্ষ ভাবে সকলের মতামত প্রকাশ করাই সম্পাদকের কর্তব্য। এ বিষয়ে কোনও সম্পাদকই সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিশেষের সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, যে কোনও আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা, 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইবে। যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা সাহিত্যের উপকার আশা করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার

করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হইব না। এজন্য যদি আমরা কাহারও অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করি, আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আমাদের ক্ষমা করেন।"

সাহিত্য পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় সুরেশচন্দ্র 'জমিদারী পঞ্চায়েত পত্রিকা' ও 'সুলভ দৈনিকের' সমালোচনা করেন 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' শিরোনামে। ঐ একই শিরোনামে তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক প্রণীত পদ্য-গ্রন্থ 'আক্ষেপ', তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন সঙ্কলিত 'কবিবচন-সুধা', শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বীরমালা' ও 'অনাথ বালক' নামে একটি উপন্যাস এবং ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যায় শ্রীনবীনচন্দ্র দাস প্রণীত অনুবাদগ্রন্থ 'রঘুবংশ' শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু প্রণীত 'পল্লীগ্রাম বা হিন্দুধর্মের মহিমা' (উপন্যাস), শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ গ্রন্থ 'নূতন কলকৌশলের কথা', শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'এটা কোন যুগ?' শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মনোরমার গৃহ' এবং "মুরলী" ও "বিকাশ" নামে অজ্ঞাত লেখকের দুটি কবিতা পুস্তক সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচক সুরেশ-চন্দ্রের এই প্রথম উপস্থিতিতে কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই। চতুর্থ বর্ষ থেকে মাসিক সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃতপক্ষে সূত্রপাত। সেকালের বিখ্যাত পত্র পত্রিকার সমালোচনাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় থেকে গ্রন্থ সমালোচনা আর মাসিক সাহিত্য সমালোচনার অন্তর্গত থাকে নি। গ্রন্থ তখন থেকেই পৃথকভাবে সমালোচিত হতে থাকে। 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' যেমন বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকাগুলির সমালোচনা থাকত তেমনি 'সহযোগী সাহিত্যে' থাকত এদেশের ও বিদেশের ইংরাজী সাময়িক পত্রের পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা। * সেকালের সাধারণ মানুষ এবং বিদগ্ধ মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তাই সাহিত্য পত্রিকার এমনই একটা আসন ছিল যা যে কোনও সম্পাদকেরই ঈর্ষার বস্তু। ঠিক এই ধরণের জনপ্রিয়তা ছিল শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দৈনিক নায়ক পত্রিকার। একদিকে ধারালো ও রসালো মন্তব্যের মনোহারী আয়োজন, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদেরও চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার বেআব্রু দুঃসাহস, যেমন ছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমনি ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির। যদিও দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং রচনাশৈলীতে এঁরা দুজনেই দুই প্রান্তবর্তী তবু আপন সীমায় দুজনেই সম্রাট। পত্রিকা সম্পাদনে সুরেশচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। কে, কবে কোথায় কোন রচনা প্রকাশ করতেন, না-করতেন সব যেন তাঁর নখদর্পণে থাকত। পরবর্তী কোন সময়ে ঐ সব রচনার কোনওটি যদি পূর্বপ্রকাশের উল্লেখ না করে কোথাও পুনর্মুদ্রিত হোত

* অবশ্য সহযোগী সাহিত্যেও কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য পরিচিতিও প্রকাশিত হোত।

তাহলে সুরেশচন্দ্রের হাতে সেই পত্রিকার সম্পাদকের নিস্তার ছিল না।† তিনি অজস্র পত্র পত্রিকার মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্র পত্রিকার সমালোচনা করেছেন। পূর্ব প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত কোনও কোনও পত্রিকার পূর্বগৌরব ক্ষুণ্ন হতে দেখে তিনি দুঃখবোধ করেছেন, সম্পাদকের প্রতি নিবেদন করেছেন যাতে পত্রিকার পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারে তিনি প্রয়াসী হন।‡ কোনও পত্রিকা সময়মত প্রকাশিত না হলেও তিনি উদ্বেগ বোধ করতেন। পত্রিকা সম্পাদনের প্রথম থেকেই দেশের অন্যান্য পত্রিকাগুলির প্রকাশকাল, সম্পাদকের পরিবর্তন, সম্পাদকের যোগ্যতা অযোগ্যতা সর্বদিকে তাঁর সজাগ ও তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকত। কোনও পত্রিকা প্রকাশ অকস্মাৎ বন্ধ হলেও সে সংবাদ যেমন তাঁর পত্রিকা মারফত পাওয়া যেত তেমনি

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৩০০ সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—"এ সংখ্যায় 'আকবরের স্বপ্ন' নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লেখক। আমরা ইতিপূর্বে ঠিক এই প্রবন্ধটিই বৈশাখ মাসের 'সাধনা'র সার-সংগ্রহ নামক প্রবন্ধে অবিকল মুদ্রিত দেখিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সাধনার নাম উল্লেখ করিলে ভালো করিতেন। নতুবা, প্রথম দৃষ্টিতে, এই প্রবন্ধ তত্ত্ব বোধিনীর নিজস্ব বলিয়া বোধ হইতে পারে।" সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩০১ সালের মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ পালের 'চলিত গল্প" প্রসঙ্গে এবং পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন ১৩০১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়' সম্বন্ধে এবং ঐ একই সালের পঞ্চম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণের' সমালোচনা প্রসঙ্গে একই অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলী ছড়া" সম্বন্ধেও এ অভিযোগ করেছেন। (১২ পৃঃ ও পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য)

‡ ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৩০০, সাহিত্যের মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় --তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যঃ—"তত্ত্ববোধিনীর মত পুরাতন কাগজ দ্বিতীয় নাই। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এখন ১৮১৫ শক চলিতেছে। মানবের ন্যায় মানব কৃতকার্যেরও যে জন্ম জরা মৃত্যু আছে তত্ত্ববোধিনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তত্ত্ববোধিনীর সেদিন এখন কোথায়? বলিতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তত্ত্ববোধিনী এখন পূর্বগৌরবে বঞ্চিত হইয়া, কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া আছে মাত্র।..........." "বর্ষাকালে আমেরিকাস্থ প্রদেশ বিশেষের দৃশ্য"—একটি বালকের রচনা। কিন্তু ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি বলিয়া স্থান পাইল, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। বালকের রচনা ভাল বোধ হইয়া থাকিলে, উৎসাহ দিবার জন্য, তাহাকে এক জোড়া সন্দেশ কি একটা খেলানা কিনিয়া দিলেই চলিত, নয়ত সখা-সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিলেও তিনি যা হয় করিতে পারিতেন। দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির প্রচার যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহার সম্পাদক, সে কাগজে এরূপ ছেলেখেলা শোভা পায় না

পাওয়া যেত নূতন পত্রিকার জন্মলগ্নের শুভসংবাদ এবং সোচ্চার অভিনন্দন বাণী। এত অজস্র পত্র পত্রিকার সমালোচনা সেকালের আর কোনও মাসিক পত্রেই হোত না। অনেক পত্র পত্রিকার জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী এই সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহাসিক মূল্য তাই প্রশ্নাতীত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রথমে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকার জন্মলগ্নের অভিনন্দন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনার' সম্পাদকতা পরিত্যাগের সংবাদ (পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য) এবং 'সাধনার' বিলোপের সংবাদ (পৃঃ ২১—২২ দ্রষ্টব্য) সাহিত্য পত্রিকা মারফত পরিবেশিত হয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, এই সাধনা পর্বের রবীন্দ্র রচনার সমালোচনায় কিছু কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য সত্ত্বেও যে আন্তরিকতা নিয়ে সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন তা 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষী' নামে পরিচিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্বন্ধে নতুন কথা বলে, নতুন করে তাঁর সমালোচনার মূল্যায়নের প্রেরণা দেয়। সাধনা ব্যতীত তিনি যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার সমালোচনা করেছিলেন সেগুলি যথাক্রমে—ভারতী, নব্যভারত, পুরোহিত, প্রদীপ, উৎসাহ, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, জাহ্নবী; প্রবাসী; দেবালয়; সুপ্রভাত; ভারতমহিলা; তত্ত্ববোধিনী; সবুজপত্র; অর্ঘ্য; উপাসনা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, নবযুগ ও অঙ্কুর। এত দীর্ঘ সময় ধরে এত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করে একাদিক্রমে সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্র সমালোচনা ও সেই সমালোচনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে বাদ প্রতিবাদের ঘনঘটা তা লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে এই পত্রিকা সে যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে কিভাবে সদা-সক্রিয়, গতিশীল, মন্তব্যমুখর ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উত্তেজিত করে রাখতে পারত, গড়ে নিতে পারত এমনি সাহিত্যিক সিচুয়েশন যা প্রতিভাবান লেখকের উজ্জ্বলতম তীক্ষ্ণতম স্ফুরণে একান্তভাবে সহায়ক হয়ে উঠত।

সম্পাদক হিসেবে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কঠোর মানুষ ছিলেন। কোনও রচনাই তিনি এডিট করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত "সুরেশ-স্মৃতির" কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"প্রবন্ধ নির্বাচনের কড়াকড়ি 'সাহিত্যকে' অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছিল। এখন লেখকের সংখ্যা অসংখ্য, বুঝিবা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এমন দিনে যে কেহ লিখিতেছেন, যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন। বিষয় বিন্যাসে ও বচন বিন্যাসে স্বেচ্ছাচার সমানভাবে প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। এমন দিনে প্রবন্ধ নির্বাচন করা যে কত কঠিন, তাহা 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সর্বদা স্বীকার করিতে হইত। তথাপি দৃঢ়তা তাঁহার রক্ষাকবচ ছিল।

এই দৃঢ়তা কেবল প্রবন্ধ বর্জনেই ব্যক্ত হইত না, প্রবন্ধ সৃষ্টিতেও ইহা আর এক আকারে আত্মপ্রকাশ করিত তাহা আবদার। সম্পাদক অনেক সময়ে নিজেই বিষয় নির্বাচন করিতেন, লেখক নির্বাচন করিতেন এবং লেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এই দৃঢ়তা সাহিত্যের আসরে যাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত টানাটানিতে না পড়িলে লেখনী ধারণ করিতেন না। ইহাতে অনেক নূতন পুরাতন লেখক জড়তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য যে তাড়না ছিল, সে বড় মধুর স্নেহের তাড়না, তাহা কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, সমাজপতি তাহা জানিতেন।"

পত্রিকা সম্পাদনায় এই কঠোরতা বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। সুরেশচন্দ্র সংকলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে' সম্পাদক বঙ্কিমের কিছু সংবাদ আছে। তাতে জানা যায় যে, বঙ্গদর্শনের আমলে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রতিটি লেখা ভালো করে দেখে 'রিভাইজ' করে, কোনটি বা কাটতে কাটতে পুনরায় নিজেই লিখে প্রেসে পাঠাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হোত। পত্রিকা সম্পাদনায় এই অতিরিক্ত পরিশ্রম, যত্ন সুরেশচন্দ্র সমাজপতিরও ছিল।* এ যুগে কিন্তু সম্পাদকেরা ভয়ে হোক অথবা অন্য যে কারণে হোক প্রতিষ্ঠাবান লেখকের লেখা এডিট করার ঝুঁকি নেন না বলে অতি-আধুনিক সমালোচক মহল থেকে অভিযোগ উঠছে। "সম্পাদকরা, দেখে থাকবেন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা কদাচ এডিট করেন না। অর্থাৎ বানান, ব্যাকরণ, তথ্য সমাবেশ ইত্যাদিতে ভুল চোখে পড়লেও তার সংশোধন হতে দেখবেন না। সম্পাদকদের প্রশ্ন করলে জবাব শুনতে পাই, লেখকরা চটে যাবেন, বরদাস্ত করবেন না। এ এক সাংঘাতিক অবস্থা। এমনি নাকি আমাদের আত্মাভিমান যে পরিষ্কার ভ্রম ত্রুটি-বিচ্যুতি (কার না এসব ঘটে?) পর্যন্ত অন্যের হাতে সংশোধন হতে দেখলে আমরা আহত হই...........।" (একান্তে—শ্রীচাণক্য সেন)

প্রসঙ্গচ্যুতির আশঙ্কায় সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বর্জন করে এই বলে উপসংহার করা চলে যে তিনি নির্বাচিত লেখক গোষ্ঠী নির্বাচিত-সংশোধিত রচনাবলী, 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' ও 'সহযোগী সাহিত্য' শীর্ষক দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সার্থক ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়মিত প্রকাশ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যের আকার-প্রকার রুচি-অরুচি ও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ইতিহাসকে সার্থকভাবে বহন করেছিলেন, লালন করেছিলেন, ধারণ করেছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস তাই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের যুগসন্ধির ইতিহাস, বঙ্কিমের যুগের সংগে রবীন্দ্র যুগের গ্রন্থিবন্ধনের ইতিহাস—আর এ ইতিহাস তৈরী করে গেছেন সম্পাদক সুরেশচন্দ্র।

সমালোচক সুরেশচন্দ্র

সুরেশচন্দ্র ছিলেন সাময়িক পত্রের সমালোচক। তিনি প্রতি মাসে তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে নিয়মিত ভাবে অধিকাংশ প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সমালোচনা করতেন। এ সমালোচনায় একালের 'পুস্তক পরিচয়' এর সমালোচনার চেয়ে কিছু দায়িত্ববোধের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনা দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারত, উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের বাদ-

* রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনে একাধিক পত্র সম্পাদনা করেছিলেন। "দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে সকল সাহিত্যিক দায়িত্ব ও আত্মীয়তার দাবি পালন করেছেন তার তালিকায় অপরের রচনা সংশোধন ও সম্পাদন পরিমাণের দিক দিয়ে বড় কম নয়"—একথা বলেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন তাঁর "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত রচনা" প্রবন্ধে এবং এই প্রবন্ধেই কবি-সংশোধিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রসহ তাঁর সংশোধন-সম্পাদনের বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে।

প্রতিবাদের আবহাওয়া তৈরী করতে পারত এবং প্রাচীন ও নবীন মতের বিরোধের শুভ পরিণাম হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে যথার্থ মননশীলতার ও চিন্তাশীলতার চর্চা হোত। সাহিত্য নদীর মত। সব সময়ে সোজা সরল পথে সে প্রবাহিত হয় না, বাঁক ফেরে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই বাঁক ফেরার মুহূর্তগুলো বিতর্ক আর বাদ-বিতণ্ডার ঘূর্ণীঝড়ে ভরা। একে অতিক্রম করে পেতে হয় নতুন পথ, অবাধে প্রবাহিত হওয়ার প্রাণবান গতি। এই বাঁক ফেরার সময়টা লেখক পাঠক ও সমালোচক এই তিনজনের ক্ষেত্রেই ত্র্যহস্পর্শ দোষে দুষ্ট। তিনজনেই তখন সংশয়াবিষ্ট, দ্বিধায়-জিজ্ঞাসায় জড়ানো একই কালের ত্রিবিধ মানুষ সাহিত্যের সেই পালাবদলের ইতিহাসে অস্থিরচিত্ততার আঁকাবাঁকা স্বাক্ষর রাখে। আমরা সুরেশচন্দ্রের সেই সব আঁকাবাঁকা স্বাক্ষরগুলিকে একনজরে দেখে রবীন্দ্র-বিরোধের বিভীষিকা দেখি, কিন্তু একটু অভিনিবেশ নিয়ে দেখলে হয়তো অতখানি আঁৎকে ওঠার কোনও কারণ থাকবে না।

সমকালীন সাহিত্য বিচার সমালোচকের পক্ষে সত্যই কণ্টকর এবং অনেকাংশে অসুবিধাজনক। দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ এবং বিচারবুদ্ধি বিজ্ঞ না হলে সমালোচ্য বিষয়-বস্তুকে নির্ভুল ব্যাখ্যায় বোধগম্য করা যায় না। এ ছাড়া নিজস্ব শিক্ষা, রুচি, সংস্কার ও বাসনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ সমালোচকের কলঙ্কশূন্য লেখনীতে লিখতে পারাও দুরূহ। তবু সে যুগে সুরেশচন্দ্র সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার যে নজির রেখেছেন তা অকিঞ্চিৎকর নয়—তা ছিল সাহিত্য পত্রিকার জনপ্রিয়তার প্রথম এবং প্রধান হেতু। তাঁর সমালোচনা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আমদের জানিয়েছেন,--

"সাহিত্যের সমালোচনা সাহিত্যের বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে অকুণ্ঠিত ভাবে তিরস্কার পুরস্কার বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই সাহিত্য সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ব-বোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকার চর্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে। আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, এই মমত্ববোধ প্রবল হইলে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বতঃই সীমাশূন্য ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই,—লাভবান হইয়াছে।" যদিও এ রচনা শোকসন্তপ্ত অনুরাগী-জনের উচ্ছ্বাসে আবেগে ভরা তবু শেষ কথাটি বড় সত্য। "ইহাতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই লাভবান হইয়াছে।" একথা বলার একমাত্র কারণ এই যে যদি কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সমালোচনাগুলিই নয় অন্যান্য লেখকদের প্রতি সুরেশচন্দ্রের সমালোচনাগুলির সংবাদ রাখা সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে যে সে যুগের সাহিত্য-প্রাঙ্গণের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবাঞ্ছিত আগাছার জঙ্গল 'সাফ' করার ব্যাপারে সুরেশচন্দ্রের কৃতিত্বের দাবীও ছিল অনেকখানি। 'সাহিত্য' পত্রিকায় রচনার প্রকাশ লোকে সৌভাগ্য বলে মনে করলেও, সাহিত্যের 'সমালোচনা'র ভয়ে বা সমাজপতির বাক্যযন্ত্রণার ভয়ে লোকে 'তটস্থ' হয়ে থাকত। প্রদীপ সম্পাদক লিখেছিলেন-- "মাসিক সন্তাড়নার ভয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে।" এবং "যত শীঘ্র সম্পাদকের 'সন্তাড়নবৃত্তি' ঘুচিয়া যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ততই মঙ্গল।"

চলেছিল লেখায় ও রেখায় এবং তাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত রথী মহারথীরা। একদিকে যেমন বিভিন্ন সম্পাদক, লেখক তাঁকে "পরনিন্দাব্যবসায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ (?) মাসিকের অসাধারণ ভাষাবিৎ সম্পাদক," "হাম্‌বড়া," "গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল," "সাহিত্য-সমাজপতি," "সম-আলোচক রজক," "সফরী ফর্‌ফরায়তে সম্পাদক" প্রভৃতি অভিধায় আপ্যায়িত করেছিলেন তেমনি প্রবাসী পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অভিনব উপায়ে আক্রমণ করেছিলেন চিত্রে। "প্রবাসীর শেষ পৃষ্ঠায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' ইতিশীর্ষক একখানি বানরের ছবি অঙ্কিত দেখিতেছি। দুই পার্শ্বে দুই বানর উপবিষ্ট, একের হস্তে দর্পণ তাহাতে বানরের প্রতিবিম্ব। রামানন্দ প্রাণপণে রসিকতার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা এই বানুরে রসিকতার রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না।" এই রকম আপত্তিজনক আর একটি চিত্রের উল্লেখ পাচ্ছি পৌষ ১৩১০-এর সাহিত্যে, প্রবাসীর সমালোচনায় (পৃঃ ৫৭৪)। "এবারকার তুলির ফল,—'বঙ্গের একশ্রেণীর সমালোচকের নমুনা'—সমালোচকের লাঙ্গুলে—'শিশুবোধক' বাঁধা।" ......"এক শ্রেণীর সমালোচক বলিলে কাহাদের বুঝিবে? নিশ্চয়ই যাহারা রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়, যাহারা প্রবাসীর পোঁ ধরিতে অক্ষম, এবং যাঁহাদের উপদ্রবে চুরি করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলেই, ধরা পড়িতে হয়, তাহারা? —না? সম্পাদক একটি কথা জানিয়া রাখুন বিশ্ববিদ্যালয় দাগিয়া দিলেই প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গর্ব বৃথা।" এমনি ভাবে সুযুক্তিপূর্ণ তর্কবিতর্কের পরিবর্তে কটূক্তি-পূর্ণ বাদ প্রতিবাদের ও দলাদলির দড়ি টানাটানির একটা প্রতিযোগিতা সেদিন সাহিত্যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমালোচনা যখন নেহাৎ-ই অপরিণত—সেই সময় হয় এই অশালীন উতোর-কাটাকাটি নয় কেবলমাত্র নিন্দা বা স্তুতিকেই লোকে সমালোচনা বলতে অভ্যস্ত ছিল। সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত রুচিবোধ এই তীব্র বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে তৃপ্তি পেত। দেশে সমালোচনার ভালো আদর্শ ছিল না—পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত হয়ে ওঠার চেষ্টা পরিশ্রম বা যোগ্যতাও অনেক সমালোচকের ছিল না তাই সাহিত্যে তখন যুক্তিবিহীন পিঠ-চাপড়ানো নয় চাবুক আস্ফালন ছাড়া সমালোচকের কাজ ছিল না। কোনও কোনও সমালোচক অবশ্য এই ধরণের সমালোচনা পদ্ধতিতে ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন, তীব্র উত্তেজনাময়ী বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্তে মননশীল বিচার বিশ্লেষণ ও সহানুভূতিপূর্ণ রস বিচারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তার ফলেই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হোল নতুন পথ, পরিত্যক্ত হোল সুরেশ সমাজপতির চৌকীদারের ভূমিকা, এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদূষকের ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ বহু আলোচনার মধ্যে এই নতুন পথের সন্ধান তিনি আমাদের দিয়েছিলেন—সুরেশচন্দ্রের জীবিতকালেই সে পথের সার্থকনামা যাত্রী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী এবং বীরবল। প্রচলিত পথ যে সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃত পথ নয় তাঁরা সে কথা হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং ঘোষণাও করলেন বলিষ্ঠ ভাষায়!

অজিতকুমার বললেন—"সাহিত্য সমালোচনা বলিতে আমাদের দেশের প্রাকৃত-জনের সংস্কার এইরূপ যে, রচনামাত্রকে ভালো এবং মন্দ—এই দুইটা মোটা ভাগে বিভক্ত করিয়া বাটখারার দুই পাল্লায় চাপাইয়া তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি সাহিত্যকে এমন খণ্ডভাবে দেখাকে আমি সত্য দেখা বলিয়া মনে

রিতে পারি না। বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি বিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে ; সেই সূত্র তাঁহার পূর্বকে উত্তরের সংগে গাঁথিয়া তোলে, হার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা-অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে হা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—সেই জন্য কবির বা সাহিত্যিকের চনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো। কবির বা াহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালোমন্দকে াপিতে হইবে, তা বই ভালো এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে, ুই টুকরা করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।"

সাহিত্য জগতে বীরবল নামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত ধারার সার সংক্ষেপ করে বললেন—

"আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে।"......

"একজাতীয় সমালোচনা আছে, যার রিজন্-এর সংগে কোনোই সম্পর্ক নেই, যার ষোল আনা আনরিজন্-এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। কোনো কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ-বিরাগ কাব্যজগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ সংস্কারের কথা, এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়।"............

"এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্য জগতের ধর্মাধিকরণেব দল কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারি নে, কারণ কাব্যজগতের অলংঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানি নে। কাব্যেরও অবশ্য Law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তাঁর Rules এর স্রষ্টা, যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে পাই সে নিয়মাবলীর সাহায্যে সেক্স্পীয়রের নাটক বিচার করা যায় না। বের্গস' যাকে বলেন Creative evolution, কাব্যজগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেন নি, কারণ সে কাজের ভার তো মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।"

পরিষ্কার বোঝা গেল সাহিত্য সমালোচকরা তাঁদের পত্রিকায় যে এক ধরণের জজিয়তি করে থাকেন এবং তা যে সমালোচনার 'অপথ' তাই এখানে প্রমথবাবুর বক্তব্য।

এই বর্তমান কালেও সাময়িক পত্রের সমালোচকরা খুব বেশী দূর এগোন নি ; অবশ্য পত্রিকাগত দলাদলি ও সম্পাদকীয় তর্কযুদ্ধ এখন নেই বললেই চলে—গতানুগতিক নিস্তেজ নিরুত্তাপ গ্রন্থ-সমালোচনার নামে যা আছে তা গ্রন্থ পরিচয় মাত্র তার বেশী কিছু নয়।

সমাজপতির রবীন্দ্র সমালোচনা—প্রথম যুগ

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কাব্য-জীবন তাঁর চারপাশের মনন ও বুদ্ধির জগতে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের মুক্তির ইতিহাস তাঁরই শক্ত হাতের রচনা। সেক্ষেত্রে তাঁকে দেখেছি নিয়তির মত ভ্রূক্ষেপহীন দৃঢ়চিত্ত ভাগ্য-বিধাতারূপে। অথচ ভ্রূক্ষেপের হেতু ছিল অনেক। তাঁর ক্রান্তিকারী রচনায় আক্রান্ত হোলো ঊনবিংশ শতাব্দীর তৎকালীন সাহিত্য বিশ্বাস। ফলে একদিক থেকে যেমন এলো অজস্র অভিনন্দন, অপরদিক থেকে কঠিন আক্রমণ। নববর্ষের সূচনায় চৈত্র-সংক্রান্তি আনে কালবৈশাখী, রুক্ষ ধূসর-ধূলোর ঝড়। নূতন যুগসূর্যের মত রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সাহিত্যে এলো সেই বর্ষশেষের সংক্রান্তির ঝড়। সেও এক বিচিত্র কালবৈশাখী ; অনেক প্রাচীন প্রত্যয়ের ভিত্তিপ্রস্তর শিথিল হোল। ঝড়ের পথে বিজয়কেতন যার উড়লো, কী তার পরিচয়, কী তার করকোষ্ঠী তা নিয়ে সেদিন সাহিত্যে যারা যোগ বিয়োগের অংক কষেছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যের তাঁরাই আদিমতম ভাষ্যকার। তাঁদের সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণী আজ অনেকাংশেই ব্যর্থ বা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবু তাঁরাই সাহিত্য চর্চাকে সেদিন কী প্রাণবন্ত কী প্রবাহিতই করে রেখেছিলেন। সেদিনও ছিলেন দু চারজন স্থিতধী প্রাজ্ঞ মানুষ যাঁদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে ভুল করে নি। তাঁরাও বলে-ছিলেন 'ঝড় উঠলো,' কিন্তু বলেন নি দুয়ার বন্ধ করতে। বঙ্কিম আপন কণ্ঠের মালা তরুণ কবির কণ্ঠে দুলিয়ে দিলেন এবং সংগে সংগে শঙ্কিতচিত্ত অভিভাবক তাঁকে সাবধান করলেন তাঁর 'ছায়া' সম্বন্ধে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, এঁদের মধ্যে রবীন্দ্র বিরোধ আবিষ্কার করেছেন অনেকে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এরাঁ সেদিন পিতৃসুলভ হৃদয় আর অভিভাবকের মন নিয়ে অমিততেজ শিশু-রবিকে সর্ববিধ অমঙ্গল আর ভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের "ভাই হাততালি" আর "চন্দ্রনাথ বসু"র লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার মনে হয় তা কনিষ্ঠের ইষ্ট কামনায় জ্যেষ্ঠের উপদেশ বা সাবধান বাণী। এগুলির মূল্য যতই সামান্য হোক না কেন শিশুকবি যে দেশের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে, সংস্কৃতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়ার, বুঝে শুনে চোখ কাণ সজাগ রেখে পথ চলার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতে ভুল নেই। দেশের অন্তঃস্থলে যে দেশাচার আর লোকাচারের বেড়ায় ঘেরা হিন্দু ধর্মটিকে সতর্ক প্রহরায় রক্ষণ ও পালন করছে হিন্দুর পৌত্তলিক মন ; সে আন্দাজ তিনি ঐ অভিভাবকোচিত পরামর্শগুলির মাধ্যমে পেয়েছিলেন। সেদিন এই অভিভাবকদের উপদেশাবলীর উত্তর তিনি দিয়েছিলেন কনিষ্ঠের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যেই। তবু বঙ্কিমচন্দ্র বা চন্দ্রনাথ বসু তাঁদের প্রতিভা বলেই ভাবীকালের যুগন্ধর সাহিত্য প্রতিভাকে ঠিকই আবিষ্কার করেছিলেন। ভাঙনের মহারথে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন নবসৃষ্টির বিশ্বকর্মারূপে।

এই বয়ঃজ্যেষ্ঠদের পরেই তাঁর ওপর আক্রমণ এসেছে প্রত্যাশিত পথে তাঁর সম-সাময়িক এবং কনিষ্ঠদের তরফ থেকে। এঁদের না ছিলো পূর্বসূরীদের অগাধ জ্ঞান, না ছিলো নবাগতের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বা সহানুভূতি। এঁদের চিত্তদৈন্য এঁদের রচনাকে দীন করেছে, মলিন করেছে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক সম্বন্ধকে। এঁদের অন্যতম ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। কালীপ্রসন্ন কাব্য

বিশারদও ১৮৬১-তে জন্মেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যব্রতীও ছিলেন তবু এ'রা পরস্পরের বন্ধু হননি কারণ মানুষ হিসেবে এ'রা ছিলেন দু-জাতের দু-জগতের। কাব্যবিশারদ 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের হিতবাদী পত্রে 'রুচিবিকার' নামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কোন এক ভদ্রমহিলার অপমান করার অপরাধে তিনি নয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর কাব্যবিশারদ ঐ হিতবাদী পত্রেই কড়ি ও কোমলের কিছু কিছু চরণ উদ্ধৃত করে অনেকগুলি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। সেইগুলি পরে 'মিঠে-কড়া' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেককাল পরে সেইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কেবলি মনে হয় মানুষ কত অকারণে মানুষকে কী পরিমাণ অকরুণ এবং অশোভন লাঞ্ছনাই না করতে পারে! এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কড়ি কোমলের-ই 'পত্র' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি মনে না প'ড়ে উপায় নেই—

"জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।

কাব্যবিশারদের প্রয়াস সমস্তটাই এই ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কালি ছিটোনোর প্রয়াস। কিছু উদাহরণ দিলে পরবর্তী সমালোচক সুরেশচন্দ্রের ভূমিকাটুকু সহজ-বোধ্য হবে।

তদানীন্তন কড়ি ও কোমলের ১৪ পৃষ্ঠায় আছে—'পুলক নাচিছে গাছে গাছে' (যোগিয়া কবিতার একটি পংক্তি)। এই একটিমাত্র পংক্তিকে শাপ-শাপান্ত করতে কাব্যবিশারদ মহাশয় যে পংক্তিগুলি রচনা করেছিলেন—

"মানুষের মনে মনে এতদিন ছিলে ভাল,
কেন রে পুলক আজ
তোমার এ দশা হোল।

নাচিতেছ কোন্ গাছে
কোথায় সে গাছ আছে ?
না জানি কেমন গাছ -- হায় রে কপাল।
শেওড়া কি সহকার,
ঠিক করে সাধ্য কার ?
তাল নারিকেল কিম্বা খর্জুর কাঁটাল
কিম্বা নাচ ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্রতর তরুশিরে
আকন্দ এরণ্ড ঘেঁটু এর কোন্‌টিতে ?
বিচুটী কি আলকুশী

কোথা তুমি থাক খুশী
ছোট গাছ ব'লে বুঝি চাহ না বরিতে ?
ওল কচু কাঁটানটে
এরাও তো গাছ বটে
পুলক নাচিছ শিরে এর মধ্যে কার ?
তেশিরে কি মনসার ?
শুধু নাম করা ভার
—উদ্দেশে প্রণাম করি — বল না এবার ?
ধুতুরায় নাচ কিরে
কচি কচি বংশ শিরে
নয় রাঙচিত্র-গাছে কিম্বা বাব্লায়।
ওই যা হয়েছে ভুল!
জাতি আদি যত ফুল
তার মধ্যে নাচ তুমি কাহার মাথায় ?
যেমন আমার মন
ভাবি নাই, এতক্ষণ
গোলাপ, টগর, জুঁই, মল্লিকা, মালতী।
জানি না পুলক নাচে
এর মধ্যে কোন্ গাছে।
সুধালে পুলক হায় কহে না ভারতী।"

এর পর রবীন্দ্রনাথের কড়ি-কোমলের ১০৬ পৃষ্ঠায়—

"তোদের ফেলে সারাটি দিন " ,
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বকবকম।
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।
তাই খানিকটা ফোঁসফোঁসিয়ে
বিদায় হোলো রবিকাকা॥

প্যারডিতে কাব্যবিশারদ লিখলেন ঃ—

উড়িস্নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা,
(তোর) বক্বকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা
তাও ছাপালি গ্রন্থ হোল
নগদ মূল্য একটাকা।"

এ সব কবিতার মূল্য মাত্র এই যে পাঠক সমাজে একটা সস্তা শিহরণ তারা সেকালে এনেছিল, সেই সব মনেই বিশেষ করে যারা মানুষকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হতে দেখলে আমোদ অনুভব কোরত। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বংশগৌরব

অর্থগৌরব সেদিন অনেকের মতো কাব্যবিশারদের কাছেও যে ঈর্ষার বস্তু ছিল তারও প্রমাণ পাই নীচের ছত্রগুলিতে—

"আয় তোরা কে দেখ্‌তে যাবি
ঠাকুরবাড়ীর মস্ত কবি!
হায় রে কপাল, হায় রে অর্থ।
যার নাই তার সকল ব্যর্থ॥"

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ধাতুগতভাবেই এ'রা ছিলেন নিন্দুক মাত্র—কারো কিছু ভালো এ'দের চোখে পড়ত না। বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করে ইনি লিখেছিলেন "বঙ্গীয় সমালোচক!" রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই ইনি রাহু ছিলেন না, রাহু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও! প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিতে ইনি সেযুগে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছিলেন না, ক্ষুদ্রতা ছিল তাঁর মনে — তারই অনাবৃত উম্ঘাটন এই মিঠে কড়ায় দেখতে পাই।

কড়ি ও কোমল তখনকার দিনের কাব্যের ইতিহাসে নূতন ধারার সৃষ্টি করেছিল। হেম, নবীন, মধুসূদনের পথ থেকে তা বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল, স্বতন্ত্র পথে স্বাধীন-সবল যাত্রা। অনেক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পথ বদলাবার মানুষ ছিলেন না, নিজের সাধনায় অটল থেকে আত্মশক্তিতে শেষক্ষণটি পর্যন্ত আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। তিনি ভুল-ত্রুটি করেছেন, তা স্বীকার করেছেন সংশোধন করেছেন পরিমার্জনা করেছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষান্তি ছিল না জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত। এহেন অমিততেজ মানুষের কাছে এই সব প্যারডির প্রলাপ নিতান্তই বাতুলতার উদাহরণ। তবু তিনি সেদিন এ আঘাতেও ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, ব্যথিত হয়েছিলেন—সবিনয়ে 'মানসীর' নিন্দুকের প্রতি নিবেদন কবিতায় নিন্দাজীবিদের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ আচরণের প্রার্থনা জানিয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণের কড়ি কোমলে যা সকলের ভালো লাগে নি যা একান্তই ব্যক্তিগত সেই সব কাব্যাংশগুলি মুদ্রিত করেন নি। এতেও নিন্দাজীবিদের স্বভাব পরিবর্তিত হয় নি। বরং তাঁরা উল্লসিত হয়ে মনে করেছেন এ তাঁদের কাব্যবিশারদত্বের-ই বিজয়গর্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে কড়ি ও কোমলের কাব্যমূল্য ছিলো অন্য রকম। তিনি কড়ি ও কোমলের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন—

"সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য বিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক।"

যদিচ এই প্যারডি কোনমতেই কাব্য-সমালোচনা নয় তবু সমালোচনার ইতিহাসে গৌরচন্দ্রিকা রচনায় এ'দেরই নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কারণ প্যারডিতে এ'রা যে পথ প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কালে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার মধ্যে তারই পরিণতি দেখা গেল।

সমাজপতির রবীন্দ্র বিরোধিতার স্বরূপ

কাব্যবিশারদের পরই উল্লেখযোগ্য নাম সুরেশচন্দ্র সমাজপতির। সেই ১২৯৮ সাল থেকে অর্থাৎ সাহিত্য পত্রিকার জন্মকাল থেকে আজ এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত

তাঁর ডাক-নাম বা নাম-ডাক যাই বলা হোক্ তা রবীন্দ্র বিরোধী সমালোচক হিসেবে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের দিনের রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচকগণ পর্যন্ত অনেকেই তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতার উদাহরণ-সহ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় এমন অজস্র উদাহরণ আছে যা তাঁকে নিঃসংশয়ে রবীন্দ্র-ভক্ত বলেও প্রমাণিত করবে। মানুষের মন একরঙা নয় তা বৈচিত্র্যময়, রহস্যময়। সেই মনেরই প্রকাশ যখন সাহিত্যে দেখি তখন তাকে সব সময়ে সহজ বুদ্ধির ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। সেই কারণেই সমালোচকরা সব সময় সাহিত্য-আলোচনার কর্তব্যটি খুব সহজভাবে পালন করতে পারেন না। স্বর্গে পৌঁছানোর কোনো বাঁধা সড়ক নেই বলেই না যত পথ তত মত গড়ে উঠেছে! সাহিত্য-সমালোচনারও কোনো বাঁধা ছক নেই বলে নানা সমালোচক নানা রকম ছকে তাঁদের 'সাহিত্য মীমাংসা' 'সাহিত্য বিচার' 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতির বয়ান গড়ে তুলেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই সব কোনও ছকের মাপে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেন নি। তিনি কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার আদর্শ, কিছুটা কাব্য-বিশারদের ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ এবং অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবধর্ম (যাকে 'নিত্য-কৃষ্ণ বসু' 'মুখড়' স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন) অনুসারে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। তাঁর "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" বিভাগটি যদি যথার্থ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পড়া যায় তবে সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য-বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ধারণায় পৌঁছানো চলে।

সুরেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতিব প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নিজের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশকালে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, এবং পত্রিকা সম্পাদন ব্যাপারে বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত নানা উপদেশ দিতেন। যদিও সাহিত্য পত্রিকাতে রচনা দিয়ে সাহায্য করার মত সামর্থ্য তখন আর তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—"আমি লিখতে পারব না কিন্তু তোমাদের যখন যা দরকার হবে জেনে যেও, আমি অনেকদিন 'বঙ্গদর্শন' চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারি পর্যন্ত।" প্রকাশিতব্য রচনাগুলি ভালো করে 'রিভাইজ' করে কেটে-ছেঁটে দেওয়ার উপদেশ তিনি প্রায়ই সুরেশচন্দ্রকে দিতেন। ভালো লেখা আয়ত্ত করার প্রসঙ্গে পরিহাসছলে এমন কথাও বলতেন—"এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায় আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা পাকে জান?" এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কখনও কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়োজন আছে বলেই মনে করতেন। একবার সুরেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—"গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময় মন্দ? অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয় জান?" অবশ্য "ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব original,—smart,—to the point না হইলে effective হয় না।" শুধু গালাগালির পক্ষপাতী বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই ছিলেন না।

সুরেশচন্দ্র সমালোচনার নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেও শুধু অকথ্য গালাগালি করেন নি। উপরন্তু তাঁকে অকথ্য গালাগালি করা হলে তিনি সংযতভাবে তার উল্লেখ করেছেন। অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩০০ সংখ্যা, আশ্বিন

ও কার্তিক সংখ্যার নব্যভারত পত্রিকার সমালোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্যে নিছক গালাগালির তীব্র নিন্দা করে তিনি লিখেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "ফুলরেণু"তে এবারও কয়টি সনেট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একবার কর্তব্যের অনুরোধে গোবিন্দবাবুর কবিতার সুখ্যাতি করিতে না পারিয়া তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি, এবং "কৃতজ্ঞতা স্বীকার" নামক তাঁহার একটি সনেটের নায়ক হইয়াছি। প্রথম চারি লাইনের আমরা অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই—তা গোবিন্দবাবু যদি আবার সনেট লিখিয়া আমাদের গালি দেন ত আমরা নাচার।.. গোবিন্দবাবু একটি সনেটে কিশোরীর রূপের সঙ্গে নেয়াপাতি ডাবের উপমা দিয়াছিলেন। আমরা তাহা সুকবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুকরণ ও হাস্যাস্পদ বলিয়া ছিলাম। গোবিন্দবাবু তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে, "হাস্যাস্পদ" ও "অনুকরণ", এই দুইটি শব্দে উদ্ধারের চিহ্ন সন্নিবেশিত করিয়াছনে, তাহাতে অর্থ বেশ বুঝিতে পারা শায়। গোবিন্দবাবুর বক্তব্য এই যে, "সম-আলোচক রজক সাহিত্য-পাটে আছড়াইয়া তাহার ময়লা কাপড় ধুইয়া দিয়াছে।"...আমরা হাস্যমুখে কেবল গোবিন্দবাবুর সুরুচির প্রশংসা করি এবং যদি রাগ না করেন ত বলি যে, এইরূপে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া, নিজের কবিতাকে প্রশংসার উপযুক্ত করিলে কাজটা মন্দ হয় না। গোবিন্দবাবুর আর একটি সনেট "রুচিফোবিয়া", ইহাতে সুরুচির পক্ষপাতী সমালোচককে শ্বান্ অর্থাৎ কুকুর বলিয়াছেন। (বোধ করি, কথাটা শ্বন্, ছন্দের খাতিরে বা না জানার দরুন শ্বান্ হইয়া পড়িয়াছে।)—গোবিন্দ-বাবু নব্যভারতের নিশান উড়াইয়া বলিতেছেন, "রুচিফোবিয়ার আমি ফরাসী পাস্তুর!" বহুত আচ্ছা! বলিতে কি, আমরা গোবিন্দবাবুর স্পর্ধা, এবং নব্য-ভারত সম্পাদকের সাহস ও অবিবেচনা দেখিয়া বিস্মিত ও হতাশ হইয়াছি। একজন কবি অবস্থা গতিকে, ক্রোধবশে গালি দিয়া পদ্য লিখিয়া কবিতার অপব্যবহার করিলেন, এবং দেবী প্রসন্নবাবুর মতন একজন সম্পাদক সম্পাদকের দায়িত্ব ভুলিয়া, অনায়াসে তাহা পত্রস্থ করিলনে। এই দেবীপ্রসন্নবাবুই এই সংখ্যার নব্যভারতের সমালোচনা স্তম্ভে লিখিয়াছেন—"আমরা এরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব উদ্গারিত হইতে দেখিলেই খুব দুঃখিত হই।.. এরূপ শ্লেষোক্তি হিতবাদীর যোগ্য নহে।" দুঃখ কি কেবল পরের দোষ দেখিলে উপস্থিত হয়? আশ্চর্য যে, অন্যকে যে কাজ করিতে দেখিলে দুঃখ হয়—একজন বিজ্ঞ সম্পাদকের স্বয়ং সেইরূপ কার্যের সহায়তা করিতে লজ্জা বা সংকোচ হয় না। আমরাও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ কবিতা প্রকাশ করা কি নব্যভারতের 'যোগ্য' হইয়াছে?

কর্তব্যের অনুরোধে আমরা এরূপ অশিষ্টাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা কর্তব্য পালনের অনুরোধে শত তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সাহিত্য-সংসারে এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার মার্জনীয় নহে মনে করিয়া সাহিত্যের এতখানি স্থান নষ্ট করিলাম।"

যদিও নিছক গালিগালাজ সুরেশচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না তবুও তিনিও যে সর্বত্র সুরুচির পরিচয় দিতে পেরেছেন এমন মনে করলে ভুল হবে। এইটুকু মনে করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আচরিত ও প্রচারিত রীতি-নীতিগুলি তাঁর আদর্শ ছিল যদিও সফল উত্তরসাধক হওয়ার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা তাঁর ছিল না। বঙ্কিম-

চন্দ্রের সংগে তাঁর অনুসারী উত্তরাধিকারীদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের ফলে "সাহিত্যে"র মূল প্রকৃতি সম্বন্ধেও গুরু-শিষ্যের মধ্যে মতবৈষম্য অবধারিত ছিল।

সাহিত্যের জগতে একটি তর্ক বহুকালের—সাহিত্য আনন্দের জন্য না শিক্ষার জন্য। যদি ধরে নেওয়া যেত যে, মানুষকে যা সত্যিই আনন্দ দেয় তা শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষার অংগই হয়, তাহলে হয়তো এই বিতর্কের একটা সমাধান হতো। কিন্তু আনন্দ আর শিক্ষা দুটোরই যুগভেদ এবং দেশভেদে চেহারা বদলায়। ফলে যে নীতিশিক্ষামূলক রচনাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া সমালোচকেরা কেউ কেউ সৎসাহিত্য বলবেন, আজকের নীতিবাদী সমালোচকও হয়তো তাকে সৎসাহিত্য বলবেন না, কারণ নীতিও আপেক্ষিক। নিও ক্লাসিকাল সাহিত্য তাত্ত্বিক সিডনি তাই বিরোধ মেটাতে গিয়ে বলেছিলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত delightful teaching অর্থাৎ যার মধ্যে delight আর teaching দুই-ই আছে। এই লড়াই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে নিরর্থক। শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাটা বুঝে নেওয়া চাই। বঙ্কিমের মন যেমন উদার ও বিস্তৃত ছিল তাঁর সমকালীনদের অনেকেরই তা ছিল না। কলেজ-পাঠ্য 'সমালোচনা সংগ্রহে' বহুকাল ধরে রাজনারায়ণ বসুর মেঘনাদবধের যে প্রবন্ধটি ছাপা হচ্ছে তাতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে "মেঘনাদে এমন নীতিগর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে।...এ বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনায় নীতিকে কখনো কখনো এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে তার ফলে পাঠকের রসবোধ আহত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে নীতি প্রচার নয় এ কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, নীতি আর আর্টের উদ্দেশ্য এক যদিও আর্টের উদ্দেশ্য নীতি নয়। বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন ও চিত্তশুদ্ধিজনন।"

এই নীতিজ্ঞান দিয়েই সুরেশচন্দ্রের কাব্যবোধ গড়ে উঠেছিল। সমালোচক সুরেশচন্দ্রের নীতিবোধ, ধর্মবোধ, রসবোধ, রুচিবোধ কী ধরণের ছিল তা জানতে পারলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় সুরেশচন্দ্রের বহুরূপী ভূমিকার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হোত। অবশ্য এ সম্বন্ধে সাধারণ একটি ধারণা গড়ে তোলা খুব অসম্ভব বলে মনে হয় না। সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য-বিশ্বাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবণতা, অসহিষ্ণু আপসবিমুখ মনোভাব আভাসে ইশারায় প্রকাশিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাতে আমরা বুঝতে পারি, তিনি ছিলেন রক্ষণশীল সনাতনপন্থী হিন্দু মনের মানুষ। ঠাকুরবাড়ি সেদিন বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সমাজ সংস্কারে, সাহিত্য-সংগীত-চিত্রে ঠাকুরবাড়ি সেদিন প্রাণবন্ত ফলন্ত উজ্জ্বল উচ্ছল ভবিষ্যৎ বাঙলার জননীস্বরূপা! জীবনের ও সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে এত অভাবনীয়তা, এত উদ্ভাবন, এত আলোর-জোয়ার সেকালের মানুষের কাছে ছিল ধারণাতীত, অভাবিত। সারা দেশ জুড়ে সে এক মহাজাগরণ—এক অভ্যুদয়ের লগ্ন।—দিকে দিকে জীবন তখন বিপুল উদ্যমে জেগে উঠছিল, নবযুগের ভাব-বিপ্লবের সেই প্রবল নাড়ায় আচ্ছন্ন চেতনার ভ্রান্তি, মোহ-

আবরণ ছিন্ন করে 'প্রবন্ধ' হওয়ার সেই শুভলগ্নে সুরেশচন্দ্র তাঁর রক্ষণশীল চিন্তাধারা নিয়ে, তাঁর আচরিত ও প্রচারিত মত ও পথের নিশানা নির্ভুল অক্ষরে 'সাহিত্যে' মুদ্রিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত সাহিত্যপত্রে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "বাঙ্গালীর আদর্শ" প্রবন্ধে বলেছিলেন, "অধঃপতনের কাল প্রকৃত সংকট-কাল নয়; কিন্তু অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সংকট-কাল।" কথাটা সত্য, কারণ অভ্যুদয়ের কালে একটা অবোধ্যতা অস্পষ্টতা থাকে—সত্য-মিথ্যা পথ-বিপথ গ্রহণীয়-বর্জনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই থাকে না। তখন কেবল "ভাঙ্গা নহে, গড়া;—গড়া নহে, সংশোধন; সংশোধন নহে, সংস্কার;—সংস্কারও নহে, চিরাগতকে নবাগতের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া,—" এ কাজে যে দৃঢ়তা, যে নিপুণতা, যে শক্তি, যে প্রতিভার প্রয়োজন তা দুর্লভ। তাই ভয়, দ্বিধা আর সংশয়। তাই এক পক্ষ এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন 'অচলায়তনে'র রুদ্ধ দ্বারগুলি অবারিত করতে, চেয়েছিলেন আর অপর পক্ষ সনাতনী বিশ্বাস নিয়ে সেই " 'অচলায়তনে'র সচল যুগে"ও আক্ষেপ করেছিলেন—ভাল হোক্ মন্দ হোক্ সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ এতকালের অচলায়তনেই তার আশ্রয় তার আশ্রম তার উপাসনা তার মুক্তি। সুরেশচন্দ্রের মন ছিল সনাতন হিন্দুধর্মাশ্রমের খাঁটি আশ্রমিকের ছাঁচে ঢালা। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে, প্রবন্ধে, নাটকে যেখানেই তাঁর এই ধর্মবিশ্বাস আহত হয়েছে সেখানেই তিনি উদ্যতফণা কাল-সর্পের মত লেখনীমুখে অনর্গল গরল বর্ষণ করেছেন। সেইজন্যে সে যুগে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনায় বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-উপহাস ঐ ধর্মগত দলাদলির পরিণাম হয়ে দেখা দিত যে তার একটি তথ্য পাওয়া যায় সাহিত্য (১৩০০) আষাঢ় সংখ্যার সহযোগী সাহিত্যে। সে সময়ের বাঙগলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সমালোচক সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে—"ব্রাহ্ম সমালোচক হিন্দু লেখকের উপর গালি পাড়েন; হিন্দু, ব্রাহ্ম দেখিলে,—তৈলে-বার্তাকুবৎ চটিয়া উঠেন। খৃষ্টান পাদ্রী শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর গুলি-গোলা নিক্ষেপ করেন। হিন্দু উদারতার ততটা দাবি করেন না; কিন্তু যাঁহারা "উদারতা উদারতা" করিয়া অনবরত উচ্চ চীৎকার ছাড়েন, তাঁহাদের এতটা অনুদারতা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব আদৌ অসহনীয়। সাধারণতঃ এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক অসৎ সমালোচনার সমষ্টি,—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণবায়ুর পক্ষে বিষাক্ত; উহা অতীব অস্বাস্থ্যকর, শোচনীয়,—উহা সর্বথা সাংঘাতিক।" এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র আছে "বাঙ্গালী সমালোচক,—বাঙ্গালা সাহিত্য বা বিলাতি সাহিত্যেরই হউন,—জাতিগত, বংশগত ও সম্প্রদায়গত সহস্র স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, এবং ব্যক্তিগত বদ্ধমূল বিদ্বেষবুদ্ধির বিড়ম্বনা সত্ত্বেও,—উদারতার উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিলে, কোনওক্রমেই স্বদেশীয় সাহিত্যের সহায়তা করিতে পারিবেন না,—ইহা, সানুনয়ে বলিতেছি।" সানুনয়ে এত কথা বলার পরেও কিন্তু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকাতেই হিন্দু-ব্রাহ্মর 'ধর্ম-যুদ্ধ' ভালোই জমেছিল। "অচলায়তনে"র সমালোচনা-প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র লিখেছেন—"অচলায়তনে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে বাণ বর্ষণ করিতেন। আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র প্রধান প্রতিপাদ্য—হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ণ, হিন্দুর মন্ত্র ব্যর্থ বাগাড়ম্বর, হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান বিদ্রূপের উদ্দীপক। কূপমণ্ডুকের মক্‌মকে সুবিস্তৃত অচলায়তন মুখরিত

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ক হউন, আমরা আনন্দলাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিবেন না।" এ সমালোচনা প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা নয়। এ একজন আক্রান্ত হিন্দুর একজন আক্রমণকারী ব্রাহ্ম-র প্রতি প্রতি-আক্রমণ। অচলায়তন নাটক হিসাবে সার্থক কি অসার্থক সে আলোচনা এখানে করা হয় নি—সুরেশচন্দ্রের 'হিন্দু-মন' তা করতে দেয় নি। সাহিত্য-সমালোচকের যা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সেই নিঃস্পৃহতা সুরেশচন্দ্রের ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার ওপরে তিনি উঠতে পারেন নি। এমন কি পরমতসহিষ্ণু মন নিয়ে তিনি লেখকের বক্তব্য উপভোগ করতে বা যুক্তিসহ তার আলোচনা করতে অগ্রণী হন নি। ফলে সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর অসহিষ্ণু মনের উত্তপ্ত প্রকাশ ঘটেছে সদা-সর্বদা এবং সমালোচনার পরিবর্তে সুরেশচন্দ্র, সাধনা, প্রদীপ, নব্যভারত, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বিবাদ করেছেন বলা চলে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নিজেই এক সংখ্যা-সাহিত্যে লিখেছিলেন, "সংযম সমালোচকের একটি প্রধান গুণ।" দুঃখের বিষয় এই গুণটির অভাব তাঁর সমালোচনাতেই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। অপরের বক্রোক্তি, কটূক্তি বা প্রতিবাদ তিনি কখনোই সহ্য করেন নি।

সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যরুচি আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচিতেও বিস্তর পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য তাঁদের রচনাকেও চিহ্নিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শই সুরেশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের শেষ কথা নয়—সাহিত্যের শেষ কথা হিত-কথা হবে। সমাজের পক্ষে তা কল্যাণকর হওয়া চাই। সাহিত্যবোধ হিসেবে তিনি কতকগুলি গোঁড়ামি বা Dogmaকে পালন করেছিলেন, যা পরে তাঁর সমালোচক-বৃত্তির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষার উপর আশ্চর্য দখল এবং রচনার ত্রুটি নির্ণয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজের সাহিত্য-বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধ বশতঃ পক্ষপাতহীন যুক্তিবাদী সমালোচক হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। সাহিত্যের বাঁধাধরা ছকে দাগা বুলোনোর বিরক্তিকর প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেন নি। তিনি দুঃসাহসিক পথিক। তাঁর চলার ছন্দে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, বলাকার পক্ষধ্বনিতে অসীমের নিত্যক্রন্দন 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে' ধ্বনিত হয়েছে, মূক অতীত মুখর হয়েছে, রূপ থেকে অরূপলোকে যাতায়াতের বাণী-বিতান সংগীতে, সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে। সত্যই তাঁর "গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্ধ্বদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি; যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।" শুধু চন্দ্রনাথ বসুরই সেদিন "এমন শক্তি" ছিল না তা নয়, ছিল না অনেকেরই, ছিল না সুরেশচন্দ্র সমাজপতিরও। কত জায়গায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের শক্তির যথার্থ পরিমাণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছেন সে ইতিহাস লেখা হয়ে রয়েছে মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়—রবীন্দ্র সমালোচনায়। সুরেশচন্দ্রের মন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের রঙে ছোপানো—তার বাইরে তাঁর চিন্তাকে তিনি এগোতে দেন নি—অথচ বুঝতে পারছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন,—তাঁর এতদিনকার সুরক্ষিত সাহিত্য-বিশ্বাসকে তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে দিতে চাইলেন না। দায়িত্ব নিলেন "সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষার," পণ করলেন "রবিয়ানা" যেমন করেই হোক বন্ধ করার। সেই হিসাবেই

'কাব্যে নীতি' কথা শোনালেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাহিত্যের "স্যানিটারী ইনসপেক্টর" —যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার" দায়িত্ব নিলেন, অমরেন্দ্র রায় "রবিয়ানা" বন্ধ করার দুরূহতম দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন। এমনি করে একটি রবীন্দ্র-বিরোধী শিবির তিনি প্রবল উদ্যমে গড়ে তুলেছিলেন—যার সূত্রপাত হয়েছিল কিছু ক্ষোভ, কিছু মতবিরোধ, কিছু অসহিষ্ণুতাকে কেন্দ্র করে সেই ১২৯৮ সাল থেকেই।

বিরোধের কারণ

সুতরাং সেই পূর্ব ইতিহাস আলোচনারও প্রয়োজন আছে কারণ—রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় **সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিরোধী** ভূমিকার কথাই রবীন্দ্র-অনুরাগী মহলে পরিচিত ও স্বীকৃত। কিন্তু সমাজপতি মহাশয়ের সমগ্র আলোচনার সংগে পরিচয় থাকলে এ কথা সত্য মনে হবে না। সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ-প্রসূত রবীন্দ্র বিরোধিতার মূল্যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যতখানি আছেন কবি বা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ততখানি নেই। নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়েরীতে স্পষ্টতই বসু মহাশয় আক্ষেপ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে রবিবাসরীয় সাহিত্য সভায় উপস্থিত হতেন, সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতেন তবু তিনি যেন তাঁদের আপনজন হতে পারতেন না। বেশ একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন তাঁর আচরণে। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"রবি বাবুর একটা ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যে বেশ তৎপর, কিন্তু আত্মীয়তার দিকে বড় সহজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। আমার সহিত কয়েকবার দেখাশুনা ও কথাবার্তাও অনেক হইয়াছে, তথাপি আমার নিজের খবর, বিষয় ব্যবসায়, ঘনকল্পার কথা অবগত হইবার একটু বাসনাও তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় না!...... (সুরেশ)-চন্দ্রের সহিত আলাপ ত বড় অল্প নহে ; কিন্তু রবিবাবুর কেমন স্বভাব, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াও, তিনি কেমন আছেন, অথবা তাঁহার ঘরের অন্য কোনও সংবাদ জানিবার জন্য একটা প্রশ্নও করিলেন না। আশ্চর্য প্রকৃতি। তিনি যেন কেবল বসন্তের বাতাসের মত শূন্যে ভাসিয়া কুসুমের শুধু দেহসৌরভটুকু লইয়া যাইতে চান, তাহার প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মধুর সহিত পরিচিত হইতে নিতান্তই নারাজ। কবির পক্ষে ইহা বড় সুখ্যাতির কথা নহে।" (ডায়েরী—১৫ই আশ্বিন ১৩০১) " সত্যসত্যই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বে, বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ মানুষই ছিলেন। সাধারণের সংগে মেলামেশা বজায় রাখলেও তাদের স্তরে নেমে আসতে পারতেন না। তাই মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংগে মানুষ সুরেশচন্দ্রের প্রভেদ ছিল পর্বতপ্রমাণ। ফলে 'মুখড়' স্বভাবের, কলহপ্রিয় স্বভাবের সুরেশচন্দ্রের সংগে রবীন্দ্রনাথেব অন্তরঙ্গতা অসম্ভব ছিল। নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়েরী থেকে সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের বেশ একটি ধারণা হয়। তিনি ছিলেন উগ্র খাম-খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। বন্ধু জোটাতে যত পটু ছিলেন, বন্ধুত্ব বজায় রাখতে তত পটু ছিলেন না, কারণে অকারণে মানুষের মনে ব্যথা দিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি করতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"সু-চন্দ্র অনেক সময় অকারণে অনেকের মনে ক্লেশ প্রদান করেন। এবং লোকের সহিত অনুচিত

স্বাধীনতার পরিচয় দেন। ইহা নিতান্তই দূষণীয়। যাহাতে যাহার কষ্ট হয়, নিতান্ত অপ্রয়োজনে তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অভদ্রজনোচিত। তবে সকল সময়ে আমাদের সু যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এরূপ করেন, তাহা নহে। তিনি কখনও কখনও আপনার বক্তৃতা ও বাক্যস্রোতের বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই লোকের মনে আঘাত দিয়া ফেলেন।"—সাহিত্যসেবকের ডায়েরী, ২২শে আশ্বিন,১৩০১। সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি চিত্র পাই ২রা কার্তিক, ১৩০১ এর ডায়েরীতে। সেখানে নিত্যকৃষ্ণ বাবু লিখেছেন—"সু-চন্দ্রের একটা দুর্বলতা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হয়। তিনি নিজে যখন কাহারও উপর অযথা, এমন কি, অশ্রাব্য মন্তব্য সকল প্রকাশ করেন, তাহারা যে সদভিপ্রায় প্রসূত, ইহা ব্যক্ত করিতে ছাড়েন না ; কিন্তু তাঁহার সমক্ষে অপর কেহ কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করিলেও, তিনি উহাকে বিদ্বেষ ও হিংসা প্রণোদিত না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না।" এই মানুষ-সুরেশ-চন্দ্রের পরিচয় তাঁর সমালোচনায় পরিষ্কার খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ত শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যেরই সমালোচনা করেন নি সেকালের প্রসিদ্ধ লেখকদের সকলেরই সমালোচনা করেছেন তিনি—ভালো কাউকে বলেন নি—একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র এবং সাহিত্য পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন লেখক ছাড়া। তা ছাড়া অধিকাংশ লেখকই তাঁর তীক্ষ্ন বাক্যবাণে বিদ্ধ ও জর্জরিত। তাই অবাক হতে হয় যখন দেখি প্রশংসা, শ্রদ্ধা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের, মহত্বের ঋণশোধ করার মানসিক প্রবণতা তাঁরও ছিল। সে কথা পরে আলোচ্য আপাততঃ রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা কেমন করে এল সে প্রসঙ্গগুলি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় বর্ষের (১২৯৯) সাহিত্যের ৭ম সংখ্যায় (কার্তিক) সুরেশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'একটি পত্র' প্রকাশিত হয়। পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সমালোচনা সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাতে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন—"আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দ্বারা কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে ; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

শুদ্ধ আমাদের বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবলই তাহাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাব-টুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্বের পরিবর্তে ভাবপ্রকাশ করা।" (পরিশিষ্ট ৭ দ্রষ্টব্য)

আত্মরক্ষা করবার জন্য অন্যকে আক্রমণ করা অথবা কোমর বেঁধে তর্ক করে কাব্য উপভোগের আয়োজন করা প্রভৃতি উক্তির মধ্যে সুরেশচন্দ্রের প্রতি বা ঐ শ্রেণীর সমা-লোচকদের প্রতি কোনও কটাক্ষ থাকুক বা না থাকুক এ কথা সত্য যে সেই ১২৯৯ সালেই সমালোচক সুরেশচন্দ্রের আক্রমণের রীতি পদ্ধতিটুকু রবীন্দ্রনাথের অগোচর

ছিল না। লেখক ও পাঠক উভয়ের মধ্যে সহৃদয়তার ভাব না থাকলে সৃষ্টি তার সম্পূর্ণ নির্ভর খুঁজে পায় না। সম্ভবতঃ সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ 'সহৃদয়েষু' দিয়েই সখ্য স্থাপনের উপক্রমণিকাটুকু সুন্দরভাবে সুরু করেছিলেন কিন্তু প্রত্যাশিত ফল পান নি। কারণ ঐ সময়েই "লয়তত্ত্ব" নিয়ে চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মতবিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' কবিতা ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তর্কবৈচিত্র্যকে' কেন্দ্র করে অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে আবার একটি পত্র দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু "সুরেশচন্দ্রকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক মনে করে রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন তাই তাঁর শাস্তিবিধান করে 'মান্যবরেষু' সুরেশচন্দ্র পত্রটির ফুটনোটে কড়া জবাব দিয়েছিলেন। (পরিশিষ্ট ৮ ও ৯ দ্রষ্টব্য)

১২৯৮-১৩০০ সালের মধ্যে সুরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মনে এমনি করে মনোমালিন্য ও বিরোধ দানা বেঁধেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ যে অতিতরুণ সুরেশচন্দ্র এবং 'সাহিত্য' পত্রিকাগোষ্ঠীকে ভয় করতেন তার প্রমাণ তাঁর দ্বিতীয় পত্রখানি। এখানে 'হিং টিং ছট' যে চন্দ্রনাথ বসুকে কটাক্ষ করে লেখা তা কবি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সেদিন কেন আজও একথা কেউ অস্বীকার করেন না। প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে লিখেছেন—"ইহা যে চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত তাহা একখানি পত্রযোগে কবি অস্বীকার করেন। কিন্তু পরেও আমরা দেখিয়াছি যে একটা বেফাঁস উক্তি বা মন্তব্য করিয়া কবি পরে প্রবল পক্ষেব দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই তাহা বলা যায় না।" একটি জীবন্ত মানুষের জীবনে এটুকু ছলনা তো থাকবেই, আড়ালে "রাজার মাকে ডাইনী" বলার স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই আছে আবার সামনে তা না বলার বুদ্ধিটুকুও মানুষের সহজাত।

এ নিয়ে যত আন্দোলন আর আলোড়ন সেদিনকার সাহিত্য সমাজে ঘটে থাকুক না কেন মহৎ মানুষ চন্দ্রনাথ বসুর মনে কিন্তু কোনও কলুষ স্পর্শ করে নি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহ বা আস্থা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। সাহিত্য-সমাজ ঘটিত বিষয়ে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে কোনদিনই উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্কটুকু বিঘ্নিত হয় নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত গুণগ্রাহী চন্দ্রনাথ বসু 'ক্ষণিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর একটি পত্রে আপন হৃদয়াবেগ উজাড় করে লিখেছিলেন—"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।" সমগ্র পত্রটি পাঠান্তে সেদিন 'হিং টিং ছট' এর কবির কী যে ভাবান্তর হয়েছিল কে জানে? সুরেশচন্দ্র সমাজপতির আশে পাশে এই ধরণের জ্ঞানী ও যথার্থ গুণগ্রাহী মানুষ যাঁরা ছিলেন তাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোণার তরী গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সোণার তরী প্রকাশকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও সমাজপতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক আরও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীসুকুমার সেনের পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-বাস শেষ হবার আগেই তার সাহিত্য বন্ধুদের মধ্যে একটু মানসিক বিভেদ দেখা দিয়ে-

ছিল। দু একজন কবিবন্ধু ধীরে ধীরে ঈর্ষালু হয়ে পড়লেন। ঈর্ষার আগুনে যিনি বাতাস দিয়ে ছিলেন তিনিও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। ইনি হলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমাজপতির সাহিত্য, পত্রিকা বার হবার বছর দেড়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' বার করলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ করতে না পেরে সমাজপতি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষোভের কিছু প্রতিবিধান হবে ভেবে রবীন্দ্রনাথ সমাজপতিকে সোনার-তরী প্রকাশের ভার দিলেন আর তাঁর প্রেসে আরও কয়েকখানা বই ছাপালেন। কিন্তু সমাজপতি এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁকে প্রকাশক রাখতে পারলেন না। Publicity stunt হিসেবে সমাজপতি সোনার-তরী প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই যখন অধিকাংশ বই অবিক্রীত রয়েছে তখন, শুধু নামপত্রটি বদলিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ছেপে দিলেন। তাই সমাজপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ঘুচল।"

সমাজপতির সংগে রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার আরও একটি অবকাশ তৈরী হয়েছিল ১৩০১ সালে কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। ঘটনাটি নিত্যকৃষ্ণবাবুর ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত হোল।

"১৯শে আশ্বিন। প্রিয়বাবুর মুখে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায় শুনিয়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের সহিত "সাধনার" সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। "সাধনা"র আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু "সাহিত্য" এখন নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মিলন কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায় না।......এই সম্মিলনের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্রবাবুর এইরূপ উৎসাহ যে বরাবর বর্তমান থাকিবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। তা ছাড়া, ভালই হউক আর মন্দই হউক **সম্পাদক** মহাশয় সমালোচন সম্বন্ধে যে স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছেন **রবীন্দ্রবাবুর** নিকট তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ ইহাতে শত্রুবৃদ্ধি হয় দেখিয়া, রবীন্দ্রবাবু সাধনায় সমালোচনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে যদি তিনি সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন, তখন "সাহিত্যে"র পৃথকভাবে পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।"

২৩শে আশ্বিনের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন—"সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধু অক্ষয়বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি "সাহিত্য" ও "সাধনা"র সম্মিলনের কথা উত্থাপন করিলেন। অনেকের মত নাই শুনিয়া তিনিও মত দিতে পারিলেন না। আপত্তি প্রায় সকলেরই একরকমের কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, এ দিকে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সম্মিলনটা বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য। তবে একটু আশার কথা এই যে, সু-চন্দ্রই সম্পাদক রহিলেন, রবিবাবু কেবল লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এইভাবে প্রচারিত "সাহিত্য-সাধনা"র সম্পাদক মহাশয় যে "সাহিত্য"-সম্পাদকের ন্যায় মতের ও ক্ষমতার স্বাধীনতা দেখাইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। রবীন্দ্রবাবুও সমালোচনার শাসন হইতে মুক্ত হইলেন।"

২৮শে আশ্বিনের ডায়েরীতে পাই—"সাহিত্য ও সাধনার সম্মিলন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইল না দেখিতেছি। সু-চন্দ্র আজ রবিবাবুকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ছয় মাস তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না। আমাদের

বলিলেন, ছয় মাস কেন, ও প্রস্তাব আর কখনই বোধ হয় সফল হইবে না। এত পরামর্শ, লোক-জানাজানি করিয়া শেষে সব ভাসাইয়া দেওয়াটা আমার মতে ভাল না হইলেও, সম্মেলন না হওয়াতে যে আমি আনন্দিত, তাহা আর না বলিলেও চলে। আর একখানা "ঠাকুরবাড়ীর কাগজ" বাড়াইয়া কোনও ফল নাই।"

সুতরাং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আর মিটল না—কেবল নূতন খাতে প্রবাহিত হল। সাহিত্য ও সাধনা পত্রিকায় সম্মিলনের ব্যাপারটির ১৩০১-এর আশ্বিনে উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি ঘটেছিল। এর পর রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনা বা বাদ-প্রতিবাদ মূলক চিঠিপত্রাদি সাহিত্যে আর প্রকাশিত হয় নি। এমনি করে সে যুগের বিখ্যাত মাসিকের সম্পাদক সেযুগের যুগন্ধর কবির সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সাহিত্যে লেখা প্রকাশ করতে পারা সেদিনের লেখক যেমন সৌভাগ্য মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশ করতে পারাও সম্পাদকরা সৌভাগ্য মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখক হিসাবে না পাওয়ার ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করার কৌশল হিসাবে মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্র-সমালোচনা compulsory বা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ বাঙ্গলা সাহিত্যে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথই শিরোনাম। মাসে মাসে রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনার জন্য পাঠক সমাজও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। ফলে পাঠক সমাজে রবীন্দ্র অনুরাগী ও রবীন্দ্র-বিরাগী দুই ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এদের সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"যাহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্য যুবক; ইঁহারা সকলেই প্রায় এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা।" এই দ্বিতীয় দলে বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবকদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন মতামত ছিল যুবক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রভাতকুমার লিখেছেন—"যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে. তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজী প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে---এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইঁহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর।" ১৩০৩ সালে এই প্রবন্ধের রচনাকালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও বয়সে যুবক ছিলেন এবং প্রভাতকুমারের তা বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ-সমাজপতির বিরোধ ঘটিত সমস্ত কথাই তিনি জানতেন। 'তর্কবৈচিত্রে'র বাদপ্রতিবাদের পর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রিকায় আর কিছুই লেখেন নি—প্রভাত কুমারের একটি চিঠিতে দেখি "সাহিত্য' পত্রিকায় না লেখার জন্য তিনিও রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন। পত্রখানি নিম্নরূপ।

"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি একটু কাজের জন্য সাহিত্য অফিসে গিয়েছিলাম। আমার একখানি পুস্তক একশত কপি Private circulation এর জন্য ছাপাইতে কত লাগিবে, তাহাই জানিতে গিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা

করিলাম—“মহাশয়, আর রবীন্দ্রবাবু আপনার সাহিত্যে লেখেন না কেন?” তর্ক-বৈচিত্র্য, আপনার পত্র ও সাহিত্য সম্পাদকের ফুটনোট, এ সব যেন জানিই না, এইরূপ ভাণ করিলাম। সুরেশবাবু বলিলেন—“কি জানেন, রবীন্দ্রবাবু একে ত' আপনার সাধনা লইয়াই ব্যস্ত। আর আমিও সাহস করিয়া তাঁহার নিকট চাহি নাই। কারণ, যদি না দেন, তবে মনে হইবে সেই ‘ঝগড়ার' জন্য (ঠিক এই কথাটা-ঝগড়া-ব্যবহার করিয়াছিলেন) দিলেন না। যাহা হউক, তিনি সে সব কথা মনেও করেন না—খুব উদার লোক—সেদিন দেখা হইয়াছিল—এই একখানা পত্রও লিখিয়াছেন, এখনও জবাব দেওয়াও হয় নাই”—এই বলিয়া পত্রখানা ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পাইলেন না। যাহা হউক, আপনি যেন আর সাহিত্যে লিখিবেন না, কখনও না।”

সুতরাং সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সখ্য ও প্রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। দু পক্ষই উস্কানি দেওয়ার মত মানুষের অভাব ঘটেনি। ফলে একাদিক্রমে ২৭শ; ২৮ শ বছর ব্যাপী একটি পত্রিকা ও তার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নেতৃত্বকে ধিক্কার দিয়েই বেঁচে ছিল। অবশ্য 'তর্কবৈচিত্র্য' নিয়ে তর্কযুদ্ধের পর এঁরা পরস্পর সম্মুখ সমরে আর অবতীর্ণ হন নি। তবে সাধনা, সবুজপত্র ও প্রবাসীতে রবীন্দ্রভক্ত বৃন্দ এবং সাহিত্যে রবীন্দ্র বিরোধীগণ সাহিত্য, ধর্ম, সাহিত্যে নীতি, সাহিত্যে চাবুক, সাহিত্যে শ্লীলতা, বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘকাল বাদ প্রতিবাদ চালিয়েছিলেন প্রবল পরাক্রমে।

সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্র বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন পরম নিষ্ঠায়। রবীন্দ্র-অনুরাগীদের রবীন্দ্র সমালোচনাগুলির তীব্র প্রতিপক্ষতা করেছেন।[৮] তার অনেক উদাহরণ পাঠক মূল সংকলনটিতে পাবেন। প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণমূলক রচনাদিও সুরেশচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন। একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩০৬ এ প্রকাশিত শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ‘প্রণয়ের পরিণাম' গল্পে যে “বড় ঘরের ছোট ছেলে, বিশেষ অল্প বয়সে মাতৃহীন” যুবকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে নিন্দা ও উপহাস করা হয়েছিল যাতে বয়সনির্বিশেষে রবীন্দ্র অনুরাগী সকল শ্রেণীর মানুষ দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তরুণ প্রভাতকুমার তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৭৫) শ্রীপুলিনবিহারী সেন লিখেছেন—“সাহিত্য” পত্রে একটি গল্পে যখন রবীন্দ্রনাথ নিন্দিত হন, তখন রবীন্দ্র-নাথের প্রবীণ ও তরুণ অনুরাগী সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন; কিন্তু প্রভাতকুমার সহজে ক্ষান্ত হন নি, তার উত্তরে ‘প্রদীপে' তীব্র ভাষায় গল্প-লেখককে আক্রমণ করে যে কবিতা লিখেছিলেন, প্রদীপের সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত রবীন্দ্রানুরাগীকেও তার প্রকাশ বন্ধ করবার নির্দেশ দিতে হয়েছিল' এই নির্দেশ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়নি, ফলে এই কবিতার তাপ সেদিন বঙ্গসাহিত্য-সংসারে সুদূর-প্রসারী হয়েছিল।” প্রদীপে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত কবিতাটি এবং তৎপ্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য এই গ্রন্থের ৩৩-৩৪। পৃষ্ঠায় সঙ্কলিত হয়েছে। রবীন্দ্র অনুরাগীরা এমনিভাবে তাঁর প্রতি অসম্মানের অবিচারের জবাব দিয়েছেন বার বার। কখনও বা কবির অনুরোধে, কখনও বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বন্ধুকৃত্য করেছেন প্রিয়-

নাথ সেন, প্রভাতকুমার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সুধীজন।

ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্বেষ প্রচারে যে সুরেশচন্দ্র এত উৎসাহিত ছিলেন তারও মূলকারণ তাঁর অতি শুচিবায়ুগ্রস্ত হিঁদুয়ানী। তাঁর বিশ্বাস ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের আশ্রয় যারা ছেড়েছে তারা কোনোভাবেই স্থিতি লাভ করতে পারেনি, পারে না।* তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কটূক্তির কারণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্রাহ্মদের মধ্যেও ছিল নানা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নানা মতবাদের বিবাদ এবং ব্রাহ্মদের উপদেশ আঘাত অগ্রাহ্য করেই হিন্দুধর্ম রীতিমতো প্রবল প্রতাপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে নি, গগন ঠাকুরের "একাদশীর উপবাস"-এর মত হিন্দু হৃদয়হীনতার নিদারুণ চিত্র সত্ত্বেও সে আচার হিন্দুসমাজে প্রত্যাহৃত হয় নি। এর একমাত্র কারণ দেশের মর্মমূলে হিন্দুধর্ম এমনভাবেই তার সমস্ত আচার অনাচার সমেত প্রবিষ্ট হয়েছিল যে তাকে কোনো উপ-ধর্মের পক্ষেই উৎপাটন করা সম্ভব ছিল না। হিন্দু-ধর্মের শক্তি সম্বন্ধে সমাজপতির মনে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না, সংশয় ছিল না। তিনি জানতেন হিন্দু ধর্মকে নানাভাবে সংস্কারের জন্য শিক্ষিত মানুষের সেদিনের উদ্যোগপর্ব ছিল নিতান্তই বাড়াবাড়ি এবং হুজুগপ্রিয়তা এবং তা তিনি সমর্থন করেন নি। হিন্দুধর্ম নিয়ে সেদিন সমাজে যে কোলাহল কলরব শোনা গিয়েছিল তার চিহ্ন সাহিত্যেও মুদ্রিত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"বাঙ্গালা নাটক নবেলের বাঁধি উদ্দেশ্য দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, হিন্দু-সমাজ সংস্কার; দ্বিতীয়; হিন্দুয়ানির পুনঃ প্রচার। কিছুকালপূর্বে সাহিত্যে সমাজ সংস্কারের স্রোত অতিশয় খর বহিয়াছিল। সে এমন যে, দুই চারি খানি নবেল ব্যতীত; নাটক নবেল মাত্রেই স্রোত গড়াইয়া চলিয়াছিল। তখন যে পুস্তকে সমাজ সংস্কারের বুক্নি, হিন্দু সমাজের গ্লানি; স্ত্রী-অবরোধের কাঁদুনী; এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার তাল-ঠুকুনি না থাকিত, সে পুস্তক, পুস্তক বলিয়াই প্রায় গণ্য হইত না; তাদৃশ পুস্তক জন্মিতই না, তাহার আর গণ্য অগণ্য কি? তৎকালে যে দুই চারিখানি উৎকৃষ্ট নবেল অন্য উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির প্রকৃত রহস্যের চিত্রাঙ্কন কল্পে লিখিত হইয়াছিল তাহা আজও টিকিয়া আছে; সম্ভবতঃ চিরকালই টিকিয়া থাকিবে। কিন্তু সেই "সংস্কার"—সংস্পৃষ্ট অসংখ্য নাটক নবেল এখন কোথায়? এখন আবার আর এক রকম অপ্রকৃত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; এখন হিঁদুয়ানীর হুজুক্;—এই হুজুকে হিন্দু সমাজের সর্বগ্রাসী সংস্কারের কোলাহল কিলিকিলি কৃষ্ণ পাইয়াছে; এখন কসাই-কালীর উপাখ্যানেও কৃষ্ণকীর্তন। এখন আর বাঙ্গালীবাবু বীর-রসে মজিয়া, ভারত-উদ্ধারের উদ্ভট গীতি গাহিয়া অষ্টপ্রহর গলা সাধেন না। এখন যমুনা-লহরী প্রায় জলে মিশিয়াছে। ভারত সংগীত শিকার উপর। এখন গোয়াল-উজাড়-কারীরাও গৌরাঙ্গের চিহ্নিত চেলা। তালে-বেতালে, কালে অকালে; কেবল "হরিবোল"

* পিপ্পলকা পেড় গল্পে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিঁদুয়ানীর মাহাত্ম্যই প্রচারের চেষ্টা করেছেন।

চলিতেছে। এখন বিরহেও বেদান্ত দর্শন; সখী সংবাদেও সাংখ্য পাতঞ্জল। তারকব্রহ্ম নাম, জয়দেবের ছড়া আর যোগী ঠাকুরদের বীণার ঝংকার নাটক নবেলের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে; প্রায় প্রতি পত্রে বিদ্যমান। নাটক নবেলে ইহা নাহিলে, হিন্দুয়ানি যেন হবিষ্যান্নের অভাবে অভিসম্পাত করিয়া অতি শীঘ্রই বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে। এখনকার গ্রন্থকার মাত্রই গোলে হরিবোল দিয়া গীতা আওড়ান ও শাস্ত্রীয় শব্দের অর্থ না জানিয়া পদে পদে তাহার অপব্যবহার করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এ দৃশ্যও বীভৎস, বিরক্তিকর ও বিদ্রূপজনক।"

সুতরাং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রবীন্দ্র সাহিত্যেও যেখানে ধর্মকথা ও তত্ত্বকথার বাড়াবাড়ি দেখেছেন সেখানে সাহিত্য হিসেবে তাকে নিকৃষ্ট সাহিত্য বলেছেন। সাহিত্যে ধর্মপ্রচারকের বা উপদেষ্টার ভূমিকা যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে সাহিত্য হিসেবে যে তা অনেকখানি মূল্য হারায় সুরেশচন্দ্রের এ মত সম্বন্ধে কারো বিবাদ নেই তবে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে এ মত কতদূর প্রযোজ্য সুরেশচন্দ্র নিজেও কোথাও বিশদভাবে তা আলোচনা করেন নি। সামান্য দু এক কথায় কোথাও বলেছেন— "রবীন্দ্রবাবু আজকাল ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার উপদেশগুলি মানববুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে।" কোথাও বা বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের 'আত্মবোধ' তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সুপথ্য হইতে পারে; আমরা নমস্কার করিলাম।" কোথাও বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নূতন গানে" কবিত্ব আছে। তত্ত্ব অল্প। তাই কাব্য ফুটিয়াছে।' প্রবন্ধে গানে বা কবিতায় যেখানেই ধর্মকথা বা তত্ত্বকথার আধিক্য সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য সেখানেই প্রখর বা শাণিত হয়েছে। তিনি দুঃখ করেছেন—"জগতে ফুল শুকায়; ফল পচে; তেমনই কবিত্ব ও ঝুনো 'তত্ত্ব' হইয়া উঠে। আহা! যদি পারিজাতের মত চিরকাল টাট্‌কা থাকিত।" সাহিত্যে তত্ত্বকথার আধিক্য যেমন তাঁর ভালো লাগেনি তেমনি হিন্দু-ধর্মের প্রতি কটাক্ষ তিনি সহ্য করেন নি—তিনি প্রবাসীর সমালোচনায় একবার স্পষ্টই বলেছিলেন—"প্রবাসীর হিন্দুর ভাবনা; হিন্দু সমাজ সংস্কারের আগ্রহ; হিন্দুদের উদ্ধার করিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ দেখিয়া" তাঁর মনে হয়েছে—"মার চেয়ে যে বেথুনী: তাহাকে আমাদের দেশে ডাইনী বলে।" তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন— "হিন্দুর ভাবনা হিন্দুকে ভাবিতে দিলেই ভাল হয় না?" সেই ভাবনাই তিনি ভেবেছিলেন আজীবন—রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা কালেও যে সে ভাবনা ভাবতে ভোলেন নি সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে এবং তার প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থে পাঠক অনেক পাবেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের রূপরেখা ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় অনেক মনোহারিণী হয়ে উঠেছিল। সমাজপতি এ পরিবর্তন একেবারেই সহ্য করতে পারেন নি। চল্‌তি ভাষায় বাঙ্গলা রচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর মতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্বনাশ করা। তাই বারে বারেই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'originality' কে ব্যঙ্গ করেছেন, বাংলাভাষা 'বেওয়ারিশ ময়দা'য় পরিণত হয়েছে বলে আক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গুরু-চণ্ডালি দোষ নিয়ে তিনি তীব্র বিদ্রূপ করেছেন 'চোখের বালির' আলোচনায় এবং অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর এ ত্রুটি স্বীকার করেছেন সুন্দর ভাবে— "আমার ভাষা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত আছি। আমি প্রচলিত ভাষা এবং পুঁথির ভাষার

মধ্যে পংক্তি ভেদ রক্ষা করি নি।" তিনি তাঁর দোষ ত্রুটি নানা প্রবন্ধে যেমনভাবেই স্বীকার করুন না কেন সুরেশচন্দ্র সে দিকে দৃক্‌পাত করেন নি—তিনি তাঁর সাহিত্যের মঞ্চ থেকে নিয়মিত ঝাঁজালো বক্তৃতা করেছেন, ছোট খাট ত্রুটি নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষাই ক্রমশঃ দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিল। প্রশ্নপত্রে 'ছিন্নপত্রে'র ভাষা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে "সাধুভাষায় পরিণত কর" বলা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের মন চলিত ভাষার প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারেন নি। চলিত ভাষায় এমনই একটি আন্তরিকতার সৌরভ পাওয়া গেল, কথা বলায় কণ্ঠস্বরের জোরটুকু পর্যন্ত এমন ভাবে প্রকাশ পেল যে সে ভাষার সজীবতা ও লাবণ্যকে আর উপেক্ষা করা গেল না। সেদিন এ ভাষার পক্ষে সবচেয়ে বড় কৌঁসুলী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) যিনি অকুতোভয়ে "সমাজপতিওয়ালা"দের সংগে সবুজপত্রের আদালতে লড়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন চলিত ভাষার প্রবল বিরুদ্ধে। তাঁরও মত ছিল এতে সবরকম মনোভাব অনায়াসে প্রকাশের সুযোগ থাকাতে ভাব নীচতাদুষ্ট হবে। তিনি ১৩১৫-র পৌষ মাসের সাহিত্যে "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় এই যে অভদ্রোচিত ভাব এত প্রবল হইতেছে ইহা আমাদের ভয় ভাবনার কারণ সন্দেহ নাই। নীচতাদুষ্ট রচনা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হওয়া আবশ্যক। এখন অনেকেই চলিত বা colloquial বাঙ্গালার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহা দোষের কথা নহে। ভাষা colloquial না হইলে সাহিত্য মূর্খের আয়ত্ত হয় না, সুতরাং সমস্ত লোকের সমান হিতকর হয় না। কিন্তু colloquial বাঙ্গালা লিখিতে লিখিতে Slang বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে আসিয়াছেও তাই।" স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে এঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু একটা 'সত্য' এঁদের কথাতেও ছিল। অর্থাৎ ভাষায় কিছু কিছু অশ্লীলতার উপদ্রব সুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা বাতুলতা মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন ভাষাকে সুন্দর করতে মানুষের সমস্ত ভাব প্রকাশকেও সুন্দর করতে—লিখেছিলেন—"বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা রেখে যাব সুমধুর।" তা তিনি রেখেও গিয়েছেন—প্রতিপক্ষের সমস্ত আশঙ্কা অমূলক করে দিয়ে 'বাক্‌পতি' রবীন্দ্রনাথ দু-চারিটা নয় সুমধুর কথার সমুদ্র রেখে গেছেন। তাতে বিন্দু মাত্র পঙ্কিলতা নেই অভব্যতা নেই। ভাবীকালকে তা প্রতিদিনের কথাকে সুন্দর করে বলতে শিখিয়েছে। তাছাড়া সাধুভাষায় অভদ্রোচিত ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও তো কিছু কম নয় তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তো সাহিত্য পত্রিকাতেই বর্তমান কিন্তু ভাষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভাষা সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের মত নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটির আলোচনায় রূঢ়ভাষী সুরেশচন্দ্র কিন্তু যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের বলবার ধরণটি তাঁর বক্তব্যগুলির মূল্য কমিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে কখনো বা ভাষার ত্রুটি, কখনো বা ভাবের অস্পষ্টতা; কখনো বা রচনার অতিদীর্ঘতা ও পুনরাবৃত্তি, কখনো বা ধর্মউপদেশের বাড়াবাড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শাণিত ফলার মত তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রবীন্দ্রনাথকে সব সময়েই হয়তো শঙ্কিত তটস্থ করে রাখত যার জন্যে প্রভাতকুমার একবার তাঁর পত্রে জানতে চেয়েছিলেন "সাহিত্য জগতের নতুন সংবাদ কি? সম্পাদকীয় যন্ত্র(ণা)টা ভাল চলছে ত?"

'ভয়ঙ্কর ভক্ত' সমাজপতি

রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত ছিলেন 'রাবণ' সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভয়ঙ্কর ভক্ত ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের ভয়ংকরতার প্রমাণ এ পর্যন্ত নানাভাবে, নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপস্থিত করেছি এবার তাঁর ভক্তির প্রমাণ নেওয়ার সময় এসেছে। এবার দেখব ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নয় যথার্থ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কোনো রবীন্দ্রানুরাগীর চেয়েই কম ছিল না। তিনি অক্ষম রবীন্দ্র-অনুকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন-কঠিন বিদ্রূপ করেছেন—"কি কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ছাপা হইয়াছিল? বঙ্গের সমস্ত বালখিল্য এক তারের খবরে তপস্বী হইয়া উঠিল।" দীনেশ সেন সম্বন্ধে বলেছেন—"রবীন্দ্রবাবুর কবিত্ব কাঁচপোকার কবলে পড়িয়া দীনেশবাবুর রচনারূপ আরশোলাটি প্রায় রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠ্যাং ও শোঁয়ানুলি এখনও চেনা যাইতেছে।" "যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।"—কথাটি নেহাৎ মিথ্যা নয়। এমন কথা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধেও। রবীন্দ্র অনুকারীদের কেউ যে তাঁর ধারে কাছে পেঁছায় না তাই তিনি বারে বারে বলেছেন।

একইভাবে তিনি অক্ষম রবীন্দ্র-সমালোচককেও তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়াছেন। সে ধিক্কার যে কী প্রচন্ড তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে মূল গ্রন্থের ৪৬-৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় অমৃতলাল গুপ্তের এবং ৫৪-৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায়। প্রথম ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য "অমৃতবাবু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপমান করিয়াছেন," দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর প্রার্থনা—"ভগবান রবীন্দ্রনাথ নব যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব;—তুমি তাঁহাকে এই চারুসম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জলা খোসামুদী ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।" এ প্রার্থনা তিনি বহু রবীন্দ্রসমালোচকের ক্ষেত্রে বহুবার করেছেন। এমন কি অমরেন্দ্রনাথ রায় যিনি "রবিয়ানা" গ্রন্থ প্রণেতা—যিনি সাহিত্যগোষ্ঠীভুক্ত লেখক তাঁরও "কাব্যে গন্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনার শেষে সমাজপতি লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নি, একদিন কোনও নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে জর্জরিত করিবে। ইহাকে বলে যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথকে জর্জরিত করার অস্ত্রও তো রবীন্দ্রনাথেরই! তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কার? ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষে এমনই জ্বলেছেন সুরেশচন্দ্র যে, হয়তো তিনি নিজেও বোঝেন নি তাঁর মন রবীন্দ্রনাথকে কতখানি ভালোবাসতে চেয়ে-ছিল, ভক্তি করতে চেয়েছিল। বুঝতে পারেন নি যে-ফুল তাঁর পছন্দ নয় তারই সৌরভে তাঁর মন মুগ্ধ। বারে বারে সে মুগ্ধতা কঠিন আক্রমণের প্রাক্কালেও ধরা পড়েছে। কঠিন আক্রমণের সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভাশালী লেখক, বঙ্গ-বাণীর বরপুত্র, ভারতবর্ষের রাজকবি, উপমার রাজা প্রভৃতি নামে বরণ করেছেন। এ সব ক্ষেত্রে মনে হয়েছে "অর্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শরসন্ধান করেছিলেন"—সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও তাঁর মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবল দেখেছি) সে সৌজন্য বোধ বজায় রেখেছিলেন।

কিন্তু হাওয়া উল্টোদিকে বইল রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল-প্রাইজ' পাওয়ার পর।

এবার গান, প্রবন্ধ, কবিতা সব কিছু নিয়েই। ১৩১৪—১৫ সাল থেকেই তাঁর আক্রমণ আরো তীব্র হোল—অনেক জায়গায় এল হেঁয়ালীর, প্রহেলিকার, তত্ত্বের বাড়াবাড়ির, শব্দের অপ-প্রয়োগের অভিযোগ, সেই ভূরি ভূরি অভিযোগের মধ্যেও তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলির সৌন্দর্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা একান্তই দুর্লভ মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সমালোচনার স্পর্ধা যাঁরা করেন তাঁদের ভাষার দৈন্য অসহনীয় মনে হয়েছে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষার দৈন্য, ভাবের দৈন্য, রচনায় কণ্টকল্পনার প্রাচুর্য আবিষ্কার করেছেন—সেখানেও তিনি দুঃখ পেয়েছেন—তাঁর মনে হয়েছে "এ যেন তাঁহার পথ নয়।" রবীন্দ্রনাথকে আঘাত দিয়েছেন, সমালোচনার নামে বেতালা কথাবার্তা বলেছেন, কিন্তু একবারও অস্বীকার করেন নি যে তিনি প্রতিভাবান কবি, তিনি ভাবী বাংলার ভবিষ্যৎ, তিনি ভারতবর্ষের রাজকবি। বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা করেছেন—বলেছেন 'দেশভক্ত সাধক', বলেছেন 'মানবতার পুরোহিত'—বলেছেন তাঁর রচনা ভাষান্তরিত হলে প্রতীচীও শিক্ষা পেতে পারে। তিনি চেয়েছেন তাঁর "সোনার লেখনী অক্ষয় হউক"—কোথাও বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে নিজের সমস্ত অতীত সমালোচনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বলেছেন—"প্রতিভা ভাবের যোগ্য ভাষাই বাছিয়া বাহির করে, তাহার একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের সৃষ্টি বুঝি অসম্ভব।" নিয়ম-পাগল সমাজপতি অবশেষে হার স্বীকার করে ধন্য হয়েছেন—একটি গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন—"অত্যন্ত সহজ ভাবে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন।" রূঢ় সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে বলেছিলেন—

"যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।"

তার উত্তরে বলেছিলেন 'এত স্তুতি স্তব ভক্তি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন—"তবু ভরিল না চিত্ত?" বাঙ্গালী যে 'রাজা ও রাণী'র রাণীর মত ক্রমাগতই বলিতেছে,—'একান্ত তোমারই আমি'—অনেক কটু কথার আবরণে তলায় সমাজপতির অন্তরের এই মিঠে কথাটুকু একটু কাণ পাতলে শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে' রচনা দিতেন না—সে অভাব সমাজপতি অন্যভাবে ঘুচিয়েছেন। "সাহিত্য" পত্রিকা যেন রবীন্দ্র-নামের নামাবলীতে জড়ানো। প্রশংসার ক্ষেত্রেও তাঁর রচনা থেকে কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আবার নিন্দার ক্ষেত্রেও তাঁর রচনার উদ্ধৃতি। কত যে সম্পূর্ণ কবিতা, কথিকা, প্রবন্ধাংশের উদ্ধৃতি! নাই বা ছাপালেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা সাহিত্য পত্রিকায়, উদ্ধার চিহ্নের আলিঙ্গনেই উদ্ধার পেয়েছেন সমাজপতি! এও তো সেই মরা মরা বলতে বলতে রাম নামের উচ্চারণ শেখার দেশীয় ইতিহাস; অথবা সাধনায় যাকে উল্টা সাধন বলেছে তাই! শুধুই কী তবে বিরোধ প্রবণতা নিয়ে সমাজপতি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র অধ্যয়ন করেছেন, রবীন্দ্র-চর্চা করেছেন, রবীন্দ্র রচনার পুনঃপ্রচার করেছেন উদ্ধারচিহ্নের মধ্যে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে? সাহিত্যের পাঠককে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যেটুকু যা রবীন্দ্র-সাহিত্যে জানাবার মত, শোনাবার মত, দেবার মত, ভাবাবার মত তা তিনি সংগ্রহ

করে সযত্নে পোঁছে দিয়েছেন 'সাহিত্য' পাঠকের ঘরে ঘরে।* রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেক ত্রুটি তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে দেখিয়ে দিতেন। দেখিয়ে দিতেন প্রিয়নাথ সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—কিন্তু কই? তাঁদের বন্ধুত্বে তো ভাঙন ধরেনি। তাঁরা তো রবীন্দ্রবিরোধী বলে চিহ্নিত হন নি। তার কারণ তাঁদের মত সহৃদয়তা, মনের উদারতা সুরেশচন্দ্রের ছিল না। আশ্চর্য দ্বৈত চরিত্রের মানুষ সুরেশচন্দ্র। তাঁর প্রকৃতির ভালো মন্দ যেন দুটি এক বয়সের ভাইবোনের মত রবীন্দ্র রচনার ভালোমন্দ নিয়ে বকাবকি, তর্কবিতর্ক করতে করতে বড় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে।" সুরেশচন্দ্রকেও কি তিনি বড় করে দেন নি? একদম শেষ পর্যায়ের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেন আগের ঝাঁজ হারিয়ে সহজ সরল হয়েছে। ১৩২৬ এর মহালয়ায় বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত এবং সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত 'আগমনী' বার্ষিকীর জন্য রবীন্দ্রনাথ 'মাতৃবন্দনা' নামে কয়টি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। সেই কবে ১২৯৯ এর আষাঢ় সংখ্যা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সোণার বাঁধন' কবিতা। তারপর দীর্ঘ ২৫ বৎসরের বিতর্ক বহুল মত ও পথের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবার সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত আগমনীতে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবন্দনা প্রকাশিত হল। কল্পনা করতে ভালো লাগছে যে মহান মানুষ বাঙলার যত ভাইবোনের হাতে রাখী পরিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সুরেশচন্দ্রকেও তিনি সেই 'সোণার বাঁধনের' নিভৃত আকর্ষণে আপন করে তুলেছিলেন। কল্পনা করতে ভালো লাগে এতদিন পরে আমরাও সুরেশচন্দ্রের শুধু মন্দ নয় ভালো দিকটাও দেখতে চাইব, দেখতে চাইব কেমন করে নিঃশব্দে তিনি রবীন্দ্র রচনার অনুপম কুসুমগুলি আহরণ করে সাহিত্যের মন্দিরে একটি অনবদ্য মাল্য রচনা করে গেছেন।

সুরেশচন্দ্রের নূতন মূল্যায়ণ

সমাজপতির সমালোচনার নূতন মূল্যায়ণের আজ প্রয়োজন আছে। কারণ সমাজপতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বসূরীগণ আমাদের মনে যে ধারণা গড়ে দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্রের রচনাগুলি সংকলন কালে দেখেছি তা ঠিক নয়। কত সুন্দর উক্তি, প্রবাদের মত কত দুর্লভ বচন! ওরা হারিয়ে গেলে সুরেশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে আমরা অপরাধী হব। কারণ সুরেশচন্দ্রের অনেক উক্তির সার্থকতা আজ নোতুন করে খুঁজে পাচ্ছি, রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত, তাঁর কবিতার অনুপম সৌন্দর্য বাদ দিয়ে কেবল সকল কবিতা থেকে আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করার বুদ্ধিভ্রংশতা সম্বন্ধে তাঁর বিদ্রূপ, মাঝে মাঝে ভাষার অপূর্ব পল্লবিত কারুশিল্পের মধ্যে ভাব আচ্ছন্ন হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগগুলি, কখনও কখনও কবিতার অতি দীর্ঘতা, সাময়িক পত্রের জন্য অতিরিক্ত, অনবরত লেখার অন্যায্যতা প্রভৃতি দিকগুলি বর্তমান কালের পাঠকদের নূতন ভাবে আকর্ষণ করবে। আবার অন্যদিকে তাঁদের ভালো লাগবে 'ভ্রষ্টলগ্নের'

* এমন কি তাঁর নিজের গল্প "প্রাইভেট টিউটরে"ও রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেছেন। নিজের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

অতি সুন্দর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র প্রসঙ্গে অপরূপ কয়টি পংক্তি 'স্বাধিকার-প্রমত্তঃ' এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলির আলোচনা-ও।

প্রায় এক শতাব্দীর এপার থেকে আমরা সে যুগের রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে দলাদলির চলচ্ছবি দেখছি যেন। আজ আমাদের কাছে এমন অনেক কিছু স্পষ্ট হচ্ছে যা সে যুগের সমকালীনদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। একদল স্পষ্টতঃ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমস্ত দোষ ত্রুটি সমেত ভালোবেসেছিলেন—অনেকটা অন্ধ ভালোবাসা। আর সুরেশচন্দ্রের ভালোবাসায় কোন অন্ধতা ছিল না। তিনি চাইতেন বিস্ময়কর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে যেন ত্রুটির কলঙ্ক স্পর্শ না করে। সাধারণের পক্ষে যে ত্রুটি শোভা পায় রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি তা প্রত্যাশা করেন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের 'কাঞ্চী' রাজের মতই যেন বলতে চেয়েছেন—"কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দী খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।" বলা বাহুল্য কাঞ্চীরাজ শত্রু ভাবের সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আজকের পাঠক সুরেশচন্দ্রের সমালোচনাতেও সেই রকম সাধনা ও সিদ্ধিলাভের ইতিহাস খুঁজে পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া

এই দলাদলির ব্যাপারে বিশেষ করে তাঁকে নিয়েই যখন মাথা-ফাটাফাটি তখন রবীন্দ্রনাথ খুবই দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে নানাভাবে এ ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তীর অভিভাষণে সেই চিরদিনের দাগার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। আমাদের বলে গেছেন—তিনি যখন ময়ূরের মত আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য করে খুশী নিষ্ঠুর শিকারীর বিষমাখা বাণগুলি তূণ থেকে তখন কেমন করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসত! তিনি চেয়েছিলেন প্রীতি আর সহানুভূতি। বলেছিলেন—"মানুষের অনুরাগসম্পদ সৃষ্টি করাই যদি সাহিত্যের কাজ হয় তবে তার বিচারে সহানুভূতি ও প্রীতিরই প্রয়োজন।" কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতি বড় সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবর্জিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা" না হয়েছে। তাঁর শেষের কথাগুলিতে বুকাননের আক্রমণাত্মক ভূমিকার কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের অনেকের আজও এমন ধারণা আছে যে কোয়ার্টার্লি'র অতিরিক্ত তীব্র সমালোচনাই কীট্‌সের অকাল মৃত্যুর কারণ। "রচনাকে সমগ্রভাবে দেখে শ্রদ্ধা" অনুভব করার বাসনা আমাদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই জাগিয়েছেন। তাঁর "প্রাচীন সাহিত্য" আজও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তাঁরই পথ ধরে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অতি তরুণ "অজিত চক্রবর্তী।" তিনি বলেছিলেন "বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সংগে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়ে দেয়। অপূর্ণতা-অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—সেই জন্য

কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো। কবির বা সাহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালোমন্দকে মাপিতে হইবে, তা বই ভালো এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে দুই টুকরা করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।" আমাদের দেশে রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে অজিত চক্রবর্তীই সর্বপ্রথম সমালোচনার এই নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শেক্সপীরীয় সমালোচনাতেও এই ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেক্সপীরীয় সমালোচনা কবিকে ভালোমন্দের দ্বারা চিহ্নিত করেছে—Weighing of goods and bads. সমগ্রভাবে কবির মনোগঠন, কবির নাট্যভাবনা ও শিল্পরীতির ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি-এমন কি মানবচরিত্রের যে নব নব রূপায়ণের ধারা শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে প্রবাহিত হয়েছে তাও পোপ-জনসনের চোখে ভালো করে পড়েনি। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ল্যাম্ব, কোলরীজ, হ্যাজলীট এক অন্যতর সত্যদৃষ্টি নিয়ে শেক্সপীরীয় সমালোচনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন—তাঁরা দেখলেন ভালো মন্দের খুচরো বিচারে কবির অন্তরের কবিকে ধরা যাবে না কোনদিনই। তাঁরা তখন কবির মাধুর্য খুঁজতে লাগলেন তাঁর মানবচরিত্র গঠনের কৌশলে ও গভীরতায়; তাঁর অপূর্ব উচ্ছ্বসিত কাব্যে আর একটি সামগ্রিক গঠনে। এই সমগ্রকে একটি organic growth হিসাবে দেখার দৃষ্টি না খুললে খুচরো ভালো মন্দেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কবি মনের যে একটা গড়ন আছে, একটা বৃদ্ধি আছে, একটা পরিণতির দিকে চলার তাগিদ আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না থাকলে প্রত্যেকটি রচনাকেই শেষ ও চরম বলে মনে করার ভুল এড়ানো যাবে না। সুরেশচন্দ্র সমালোচক হিসাবে কবি ও কাব্যের সেই বিস্তৃত পটভূমিকাটিকে চোখের সামনে রাখতে পারেন নি। তাই তাঁর সমালোচনা রবীন্দ্রমন ও ভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করে না। এই ভুলের জন্যই সুরেশচন্দ্র এত অপ্রিয় এত অখ্যাত সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচকদের সমালোচনায় দুঃখ পেয়েছিলেন খুবই—"এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত; এমন অকরুণ; এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মত আর কোনো সাহিত্যিককে সইতে হয়নি।" এই কথাগুলিই তার প্রমাণ। এই মতভেদ নিয়ে মানুষে মানুষে যে বিরোধ ও বিবাদের সৃষ্টি তা তাঁর কোনদিনই ভালো লাগে নি। প্রথম জীবনে উত্তেজিত হয়েছেন, বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন, পত্রিকার দলাদলি নিয়ে 'সম্পাদক' গল্প লিখেছেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সব তর্ক-যুদ্ধ থেকে একেবারে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এমন কি পত্রিকায় সমালোচনা করতেও তিনি চাইতেন না। শরৎচন্দ্র একবার তাঁর কাছে প্রস্তাব করেন—বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা প্রবর্তনের। নানা কারণে কবি সমর্থন করেন নি প্রস্তাবটির। তার একটি হেতু এই ছিল যে—"যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরো বলেছিলেন যে তোমরা যদি এ কাজ করো, কখনো ভুলোনা যে অক্ষমতা আর অপরাধ এক বস্তু নয়।" সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছেন যখন দেখেছেন সুরেশচন্দ্রের উস্কানিতে দ্বিজেন্দ্রলালের মত তাঁর অনুরাগীজনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।*

* "যাঁদের দেখেছি গ্রন্থে" দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকার উল্লেখ করে হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে হঠাৎ তাঁর অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের উপর ক্রুদ্ধ

পরবর্তীকালে সুরেশচন্দ্রের উত্তর সাধক সজনীকান্ত দাসের আক্রমণেও কবি যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। অনেককাল পরে ধূর্জটিপ্রসাদকে একটি পত্রে লিখেছিলেন --"ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ।

বুদ্ধিগত বোঝাবুঝির তফাত নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা।" ঘর ভাঙার, বন্ধু শত্রু হওয়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকেই কথাগুলি বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে দুঃখ পেলেও আক্রমণকারীদের প্রতি কটুকাটব্য বা অশোভন আচরণ করেন নি। ফলে বিরুদ্ধবাদীদের মনের ক্ষুদ্রতা তাঁর ক্ষমাসুন্দর মহত্ত্বের আলোয় বড় প্রখর হয়ে ধরা পড়েছে। তাঁরই একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণ করি—"মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।" সুরেশচন্দ্রের মত সমালোচকেরা তাঁদের অনেক কটুকথা বলার বাহাদুরী দেখালেও রবীন্দ্রনাথের মনকে তা অশোভন উত্তেজনায় উত্তেজিত করতে পারে নি। তিনি চিরকালই 'আরো আঘাত সইবে আমার' বলার মতই শক্তিধর ছিলেন। তাই সুরেশসমাজপতিদের তাড়নায় অনেক প্রতিভার প্রদীপ চিরকালের মত নিভে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যকর্মে যাঁরা নিত্যতার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়েছিলেন ঝড়ের রাতেও তাঁরা বেঁচে থাকবেন ধ্রুবতারা হয়ে। তাঁরাই আমাদের বলতে শিখিয়েছেন "মেঘ ক্ষণিকের চির দিবসের সূর্য" সেই চিরদিবসের সূর্যের প্রতি প্রণাম জানিয়ে এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করি।

নন্দরাণী চৌধুরী

হয়ে 'প্রবাসী ও সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁকে তীব্র ও অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করে তখনকার সাহিত্যসমাজে প্রবল এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, অনেকের কাছে সেটা রহস্যের মতই হয়ে আছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মূলে ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জনকয়েক বন্ধুর প্ররোচনা। কারণ আমি ওঁদের স্বকর্ণে উস্কানি দিতে শুনেছি।"

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ
সাহিত্য ও সুরেশ সমাজপতি

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩০০
সাধনা চৈত্র ১২৯৯

"ইংরাজী বনাম বাঙ্গালা" লেখকের মত যে ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা পরিপুষ্ট হইতেছে, এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাষা উক্ত উপায়ে উন্নতি লাভ করিবে, কারণ ইংরাজি ভাষা ও ভাব শিক্ষা করিয়া যে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করে, তাহার সেই শিক্ষা অপরকে দিবার ইচ্ছা বলবতী হয় ও স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত সাধারণ্যে কোন শিক্ষা প্রচারিত হইবার অন্য উপায় নেই। স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারিত রূপে প্রচারিত হইলে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে।

"ডায়ারি" বেশ লেখা হইতেছে; কল্পনা ও চিন্তার মিশ্রণ সুন্দর হইয়াছে।

"সভাভঙ্গ" কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না, বিশেষ রবীন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় সুকবির নিকট আমরা উৎকৃষ্ট কাব্যের আশা করি।

পূর্বের এক সংখ্যা সাধনায় "শিক্ষার হের ফের" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত অনারেবল জাস্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ-মোহন বসু মহাশয় মতামত প্রকাশ করিয়া লেখককে পত্র লেখেন। এই তিন-খানি পত্র লক্ষ্য করিয়া বর্তমান সংখ্যায় "প্রসঙ্গকথা" লিখিত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ইংরাজীর যেমন সমাদর, বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ সমাদর হওয়া উচিত, লেখকের এই মত। এ বিষয়ে সকলেরই একমত হইবার কথা, কিন্তু যখন এই প্রস্তাব একবার সিণ্ডিকেটে উপস্থিত করা হয়, তখন সভ্যগণ ইহার অনুমোদন করেন নাই। এই কারণে "প্রসঙ্গ কথা" লেখক অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। আক্ষেপের কথা বটে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অবস্থা ও কালের অননুযায়ী শিক্ষাবিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। এইমাত্র বিবেচনা করা উচিত যে বঙ্কিমবাবু, আনন্দমোহনবাবু, গুরুদাসবাবু তিনজনই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত। বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপকৃত ও অলংকৃত করিয়াছেন প্রধানতঃ ইংরাজী শিক্ষার গুণে। ইহাও স্মরণ করিতে হয় যে, যখন প্রথম উপাধির সৃষ্টি হয়, তখন সংস্কৃতের

চলন ছিল না। বোধ করি যখন বঙ্কিমবাবু বি-এ পরীক্ষা দেন তখন ইংরাজী ও বাঙ্গালাই প্রচলিত ছিল, কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা ছিল না। ক্রমশঃ কলেজ শ্রেণীতে বাঙ্গালা উঠাইয়া দিয়া সংস্কৃতের প্রচলন হয়। বাঙ্গালা ভাষা তখন অত্যন্ত ক্ষীণপ্রাণ। সংস্কৃত বাঙ্গালার মাতৃভাষা, ইংরাজী বাঙ্গালার ধাত্রীভাষা এবং সেই ধাত্রীর কথা শুনিয়াই আজি আমরা স্বদেশীয় ভাষার জন্য হাহুতাশ করিতেছি। আর কিছু দিনে রাজকীয় বিদ্যালয়ে আবার ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রচলিত হইবে। বোম্বাইয়ে সংস্কৃতের পরিবর্তে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাট ভাষা প্রচলিত হয়, এরূপ প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু সিন্ডিকেটে সে কথা অগ্রাহ্য হয়। কিছুদিনে সেখানেও আপত্তি থাকিবে না, এমন আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইংরাজীকে ঠেলিয়া বাঙ্গালার মুখ্য ভাষা হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে ইংরাজীই প্রধান ভাষা থাকিবে। ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ জাতির উপর নির্ভর করে। আর্যের সময় সংস্কৃত, মুসলমানের সময় উর্দু প্রবল ছিল, ইংরাজের রাজ্যে ইংরাজীরই প্রতিপত্তি থাকিবে। সাহিত্য জাতীয় বল, জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় মহত্ত্বের উচ্ছ্বাস মাত্র। যে জাতি স্বাধীন নয়, সে জাতির ভাষা বা সাহিত্যও কখনও অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মাতার স্তনদুগ্ধে, ধাত্রীর লালন পালনে, বঙ্গভাষা পুষ্ট। আত্মশাসনে, আত্মসংযমে কবে সক্ষম হইবে কে বলিতে পারে।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
সাধনা বৈশাখ

"সম্পাদক" ছোটগল্প, লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পটি সামান্য, কিন্তু ব্যঙ্গের বড় বাড়াবাড়ি। কোন ব্যক্তির অল্পবয়সে পত্নীবিয়োগ হয়। একমাত্র অল্পবয়স্কা কন্যা প্রভা পিতার অভিভাবক হইয়া উঠিল। পিতা চাকরী করিতে না পারিয়া বই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "আমি স্থির জানিতাম সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলেনা সে নিশ্চয়ই ভালো লিখিবে।" কথাটা শুনিতে কেমন কেমন হইল না? অবশেষে জাহিরগ্রামের কাগজের বেতনভোগী সম্পাদকতা জুটিয়া গেল। কিছুদিন খুব জোরে কাগজ লেখা হইল। কিছুদিন পরে আহিরগ্রামেও একখানি কাগজ বাহির হইল। "সে কাগজখানায় এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে ছাপার অক্ষরগুলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত।" জাহিরগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক বিপদে পড়িলেন। তাঁহার লেখার আর তেমন সুখ্যাতি হয় না। অবশেষে আহিরগ্রাম পত্রিকা তাঁহাকে লইয়া

পড়িল। কি জবাব দিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় প্রভা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। প্রভার জ্বর হইয়াছে। তখন সম্পাদক কন্যার প্রতি বড় মনোযোগ করিলেন না, কি জবাব লিখিবেন সেই চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছু-ক্ষণ পরে দেখিলেন প্রভার জ্বর হইয়াছে। তখন "জাহিরগ্রাম এবং আহির-গ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।" হার মানিয়া অন্ততঃ জবাব না লিখিয়া যে সময় সময় সুখ হয়, এ কথা লেখকের মুখে কিছু নতুন শোনায়!

"সমুদ্রের প্রতি" কবিতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত। কবিতারম্ভ অতি সুন্দর। সমুদ্রকে আদি জননী এবং বসুন্ধরাকে তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্পিত করিয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেনঃ—

"তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি।"

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩০০
সাধনা আষাঢ়

"অসম্ভব গল্প" একটি উপকথা; ইহার উপক্রমণিকাটুকু অতি সুন্দর, বাল্য স্মৃতির মধুর সৌরভে আমোদিত হইয়া আছে। সমগ্র গল্পটির বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। এবারকার সাধনার আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

(সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত)

ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য রচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়; তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রবাবু বহুদিন এমন কবিতা লেখেন নাই, "প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ" নিরীহ ও নিরপরাধ পাঠকদের ঘাড়ে না চাপাইয়া তিনি 'সোনার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার 'সোনার' লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।

৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩০০
সাধনা শ্রাবণ

সাধনার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প—'শাস্তি'। লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।

৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩০০
নব্যভারত ভাদ্র

(শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু 'চতুর্দশপদী কবিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন। সেই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যে'র মন্তব্য এই ঃ—)

লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনেট সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমাদের মতে রবীন্দ্রবাবুর সনেটগুলি আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন, "কিন্তু যিনি মানবের সুখ দুঃখের সংগীত গাঁথিয়া 'অমর আলয়' রচনা করিতে চান, যুবতীর 'স্তনের ছায়ায়' শয়ন করিয়া কেবল 'অঞ্চলের বাতাস' সেবন করিলে তাঁহার চলিবে না। "স্তনের ছায়া" কোটেশন দেখিয়া আমাদের রবীন্দ্রবাবুর 'হৃদয়-আসন' শীর্ষক উচ্চদরের সনেটটির কথা মনে পড়িতেছে। যিনি এই উৎকৃষ্ট সনেটটির ভিতর প্রবেশ করিয়া, ভাবগ্রহণ না করিতে পারেন—'তাঁহার পক্ষে পাঁচালী ব্যবস্থা।' নিত্যবাবু নিজে কবিতা লেখেন—তাঁহার ভাবুকতা ও সহৃদয়তার অভাব নিতান্তই শোচনীয়। "হৃদয়-আসন"কে তিনি "কমল বিলাসী" কবিদের বিলাসপ্রিয়তার পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কবি বিলাসের পঙ্কিল ভূমি ছাড়িয়া, তাঁহার কবিতাকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়াছেন। সেখানে বিলাস নাই,—কাম নাই,—এবং নিত্যকৃষ্ণবাবুর মত সমজদারেরও অভাব। তাহারা প্রবর্তক নহে, নিবর্তক। এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে গেলে যেরূপ সাবধানতা অবহিত অধ্যয়ন ও বিচারশক্তির আবশ্যক, এক্ষেত্রে নিত্যকৃষ্ণবাবু তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। "স্তনের ছায়া" দেখিয়াই ডরাইয়া না উঠিয়া সাবধানে তলাইয়া দেখিলে নিত্যবাবু বুঝিতে পারিতেন যে, 'কামগন্ধ নাহি তায়।' কবিতা হৃদয়ে বুঝিবার সামগ্রী; বুঝাইবার নহে, সুতরাং আমরা নিরস্ত হইলাম।

৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩০০

সাধনা আশ্বিন-কার্তিক

"সমাপ্তি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প। আমরা বহুদিন পরে মাননীয় রবীন্দ্রবাবুর একটি গল্পের প্রশংসা করিবার অবকাশ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতির, চঞ্চল স্বভাব মৃন্ময়ী, তাঁহার পাড়াগেঁয়ে ইয়ং বেঙ্গল অপূর্ব অল্পের ভিতর বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গল্পভাগও মনোরম। কিন্তু স্বামীর প্রতি চিরবিরূপ মৃন্ময়ী কেমন করিয়া সহসা পতি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল,—গল্পে তাহার তথ্য পাওয়া যায় না। লেখক বলিতেছেন, "গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধ খণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন, সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল, এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।" কিন্তু গল্পে এ কৈফিয়ৎ পাইয়া মন সন্তুষ্ট হয় না। লেখককে প্রতিপদে 'কেন কেন' করিয়া বিরক্ত করিতে পাঠকের স্বাভাবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে—এবং নিপুণ ঔপন্যাসিক, প্রথমে কৌশলে পাঠকের এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া পরে ঘটনার বৈচিত্র্য ও কারণ সংস্থান করিয়া, সেই কৌতূহল-মিশ্রিত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন। রবীন্দ্রবাবু যদি কারণ ও ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া, মৃন্ময়ীর হৃদয়ের এই পরিবর্তন দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার গল্প সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। মৃন্ময়ীর হৃদয়ের পরিবর্তন লেখক সহসা স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন,—গল্পকৌশলে তাহা ব্যক্ত করেন নাই, এইজন্য "সমাপ্তি"র মাঝখানটা কেমন খাপছাড়া ও অতৃপ্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। লেখকের পাড়াগাঁর বর্ণনা,— রচনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, এবং মনস্তত্ত্বের সহজ বিশ্লেষণ এই গল্পটিকে আরও মনোরম ও প্রশংসনীয় করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ইংরেজ ও ভারতবাসী" চিন্তাপূর্ণ, সহৃদয়তার পরিচায়ক উচ্চদরের প্রবন্ধ। লেখক অসামান্য দক্ষতা ও সহানুভূতির সহিত ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। ইহাতে স্বজাতিপ্রেমের সৌরভ আছে, কিন্তু পরজাতি-বিদ্বেষের কণ্টক নাই; স্বজাতির দুঃখে ও অপমানে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে, কিন্তু দুর্বলতার পরিচায়ক কাঁদুনি নাই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সুখ" অতি সুন্দর মধুর কবিতা।

৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
পৌষ ১৩০০
সাধনা অগ্রহায়ণ

"সমস্যা পূরণ" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প। গল্পটি আমাদের ভালো লাগিল না। রবীন্দ্রবাবুর অন্যান্য গল্পে একটা না একটা আকর্ষণ থাকে,—ইহাতে তাহার কিছুই দেখা গেল না। 'ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন।' পুত্র বিপিনবিহারী বাপের দান খয়রাত বন্ধ করিলেন এবং প্রজাদের নিরিখ বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রজাদের সহিত বিবাদ ও মকদ্দমার সূত্রপাত হইল। "অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না। মকদ্দমা মামলা সবেগে চলিল,—এবং যেমন হইয়া থাকে, অছিমদ্দি বিশ্বাস ক্রমে সর্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে, তখন আপিল আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।" কিন্তু এইসময়ে "সময় বুঝিয়া অছিমদ্দির মহাজন ডিক্রী জারী করিল। অছিমদ্দির যথাসর্বস্ব নীলাম হইবার দিন স্থির হইল। সেদিন সোমবার হাটের দিন।" অছিমদ্দি হাট করিতে গেল এবং সহসা জমিদার-পুত্র বিপিনবাবুকে তথায় দেখিতে পাইয়া "কাটারী তুলিয়া বাঘের মত গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল।" বিপিনবাবু সুযোগ পাইয়া তাহাকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিলেন। বিচারের দিন, "যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কি একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া 'আবশ্যক আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।" বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—"কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন।" বৃদ্ধ সেইখানেই দাঁড়াইয়া বলিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ, তাহা ফিরাইয়া দিবে।" পুত্র ত শুনিয়া আশ্চর্য, তারপর জেদ ধরিলেন, "উহাদের পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?" কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, 'সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি হইবে বাপু?' বিপিন ছাড়িলেন না—"আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লোকের কাছে কি বলিব?" কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক

(বোধ?) কর ত বলিয়ো, অছিমদ্দি তোমার ভাই আমার পুত্র।" বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?" কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—'হাঁ বাপু!' এইখানেই গল্পের শেষ;—কিন্তু তাহার পরও রবীন্দ্রবাবু আর গোটাকতক প্যারাগ্রাফ লেজুড় জুড়িয়া দিয়াছেন। গল্পের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বাহুল্যমাত্র। এক্ষণে কথা এই যে এ গল্প লেখা কেন? সংস্কৃত ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে।" এ গল্পের প্রয়োজন কি? যবন পুত্রের জন্মদাতা স্বয়ং কৃষ্ণগোপাল যে কথাটা বিজন বটতলায় ডাকিয়া 'কম্পিত অংগুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে' 'কম্পিত স্বরে' চুপি চুপি বলিলেন এবং 'আবশ্যক হইলে' লোকের কাছে বলিতে বলিয়াছিলেন, সে কথাটা রবীন্দ্রবাবু স্থির অংগুলিতে লেখনী ধরিয়া অকম্পিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার এমন কি আবশ্যকতা অনুভব করিলেন? ইহাতে সাহিত্যের এমন কি শ্রীবৃদ্ধি, কান্তি, পুষ্টি, সাধিত হইল? বলা বাহুল্য যে বর্তমান গল্পের বিষয় রবীন্দ্রবাবুর মত লেখকের লেখনীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

"তুলনায় সমালোচনা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। কবিতাটির ভাষা অত্যন্ত মধুর, ছন্দের ঝংকারও চমৎকার; মোটের উপর মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না।

৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩০০

সাধনা পৌষ

প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কর্তব্যনীতি" নামক একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে।

"বিনি পয়সার ভোজ" রবীন্দ্রবাবুর আর একটি রচনা, এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, আদ্যন্ত উজ্জ্বল ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ ও বিলক্ষণ আমোদজনক হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। স্থানাভাব না হইলে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি প্রবন্ধ "ইংরাজের আতঙ্ক।" প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও আলোচনার উপযুক্ত। বর্তমান সময়ে ইংরেজ ও ভারতবাসীর ভিতর যে সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের মনে যে বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, এবং তাঁহারা যেরূপে ভারতকে ভয় দেখাইয়া জবরদস্ত শাসনে নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়া, নিজেরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে চান তাহা লেখক অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"নিরুদ্দেশ যাত্রা" রবীন্দ্রবাবুর একটি কবিতা। কবিতাটি অতি চমৎকার, রবীন্দ্রনাথবাবুর পক্ষেই এরূপ কবিতাসৃষ্টি সম্ভবে। ভাব, ভাষা, ছন্দ ইহার সকলই সুন্দর। যে ভাষার ভান্ডারে এইরূপ কবিতারত্ন সঞ্চিত হইতেছে, সে ভাষার দৈন্য চিরদিন থাকিবে না, আমরা অনায়াসে এ আশা করিতে পারি।

৪র্থ বর্ষ ১১ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩০০

সাধনা মাঘ

"বিদায় অভিশাপ" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা, দুইটি মাত্র চরিত্র ও বিদায়ের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রথায় রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক ও নায়িকা। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য পড়িয়া অমারা তৃপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া দৃপ্ত হইয়াছি। বিস্তৃত সমালোচনার এ স্থান নহে,—দোষ ও গুণের সবিশেষ উল্লেখও এত অল্প পরিসর স্থানে অসম্ভব। রবীন্দ্রবাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা অনেক উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলা কল্পিত, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এককেটি বর্ণনা ও চিত্র যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ শক্তিও প্রশংসনীয় এবং উপভোগের যোগ্য। রবীন্দ্রবাবু গীতিকবিতায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তিনি চরিত্রসৃষ্টি করিয়া এখনও সফল হইতে পারেন নাই। আশা করি রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যজগতের চরিত্র হইতে আমরা শিক্ষা ও সুখ লাভ করিব।

ভারতী পৌষ

আর একটি গান শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কে যাবি পারে।"

৪র্থ বর্ষ ১২ সংখ্যা

চৈত্র ১৩০০

সাধনা ফাল্গুন

"প্রেমের অভিষেক" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩০১

সাধনা চৈত্র

এবারকার "সাধনা"র সর্বপ্রধান ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজসিংহের" সমালোচনা। লেখক প্রবন্ধটিকে সমালোচনা বলিতে সম্মত নন ; সমালোচনার ধরণে ইহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু উপন্যাসের এমন উপন্যাসবৎ সুমিষ্ট সমালোচনা আমরা ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। "রাজসিংহের" অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশল সহকাবে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা কেবল তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভব।

"এবার ফিরাও মোরে।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ মনোরম কবিতা। কবি বলিতেছেন,—

"শুধু জানি
সে বিশ্ব প্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান ;...
হয়ত ঘুচিবে দুঃখ নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা!"

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

সাধনা বৈশাখ

এবারকাব সাধনায় সর্বপ্রধান প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব "বঙ্কিমচন্দ্র।" বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্য সেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মূর্তির উজ্জ্বল নিখুঁৎ চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।

"নববর্ষে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা—কিন্তু ইহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই।

নব্যভারত বৈশাখ

নব্যভারত সম্পাদক "ত্রয়োদশ শতাব্দী" প্রবন্ধে দাশু রায় পর্যন্ত অনেক নাম করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান যুগের গৌরব, গীতি কবিদের শিরোমণি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করেন নাই। ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি? নবযুগের বাংলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা বাদ দেন,—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"তাঁহার জন্য দাশুরায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা," —বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার একবিন্দুও নাই।

৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০১

সাধনা জ্যৈষ্ঠ

এবারকার সাধনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা "মৃত্যুর পরে"। এই সুন্দর ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কবিতার নিগূঢ় রহস্যরস কেবল অনুভবগম্য।

"শোকসভা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর, যখন তাঁহার স্মরণার্থ সভার উদ্যোগ হয়, তখন অনেকে উদ্যোগকারীদের বাধা দিয়াছিলেন। শোকসভার উপযোগিতা কি রবীন্দ্রবাবু বর্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে তাহা দেখাইয়াছেন এবং অতি সমীচীনরূপে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির নিরাস করিয়াছেন।

৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩০১

সাধনা আষাঢ়

"বিহারীলাল" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিত্ব সমালোচনা। এই প্রবন্ধটি এবারকার সাধনার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩০১

সাধনা শ্রাবণ

"রাজা ও প্রজা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ সন্দর্ভ।

"সাহিত্যের গৌরব" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়িবার ও ভাবিবার উপযুক্ত।

"বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ। একজন সুইডেন দেশীয় ভদ্রলোক হিন্দুর একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন, এবং তজ্জন্য আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকাতায় দেশীয়দের মধ্যে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেন, তাঁহার শব সমাধিস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তদনুসারে মৃতকে নিমতলার শ্মশানে দাহ করা হইয়াছিল। পবিত্র হিন্দুর শ্মশানে পতিত ম্লেচ্ছের দাহ হইতে দেখিয়া হিন্দু চূড়ামণি সম্পাদকেরা হিন্দুধর্মের "সর্বনাশ" হইল

বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। রবীন্দ্রবাবু বর্তমান প্রবন্ধে তাই উদার হিন্দুধর্মের এই সংকীর্ণ অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত একটা সংযত সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় পূর্ণ; রচনা প্রণালী সজীব ও সুন্দর, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং সহজেই পাঠকের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সন্ততি ধারা আমরা, এ উভয়ের মধ্যে কাহারা হিন্দু? তাঁহারা না আমরা? হিন্দুত্ব মনুষ্যত্বে, না, লোকাচারের কাপুরুষ শাসনে?

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৩০১

সাধনা ভাদ্র

"অপমানের প্রতিকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ।"

"বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দার্শনিক প্রবন্ধ—অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযুক্ত।

"অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। ইতিপূর্বে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রবাবুর "বিনি পয়সার ভোজের" ধরণে লিখিত, কিন্তু রচনাটি সেরূপ সফল হয় নাই।

৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩০১

সাধনা আশ্বিন-কার্তিক

এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাধনার" সম্পাদকতা পরিত্যাগ ও যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্যভার ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না, যে যে পরিমাণ জনাদর প্রাপ্ত হইলে বহু ব্যয়সাধ্য "সাধনা" স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত, তাহা সাধনার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয়ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।" সাহিত্য হিসাবে "সাধনা" সফল হইয়াছে; বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চার অত্যন্ত দুরবস্থা না হইলে, "বহু ব্যয়সাধ্য" "সাধনা"র আকার প্রকার পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইত না। সুধীন্দ্রবাবু তিন বৎসর দক্ষতার সহিত "সাধনা"র সম্পাদকতা করিয়া বিদায় লইলেন,—আমরা তাঁহার যত্নে এ তিন বৎসর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি। তিনি "সাধনা"র সফলতায় অপ্রত্যয় বটে,

কিন্তু আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তাঁহার "সাধনা" সিদ্ধ হইয়াছে।

এবারকার "সাধনার" সর্বপ্রথমে "মেঘ ও রৌদ্র" নামক একটি গল্প। গল্পটির সহজ করুণ উপসংহার ভাগ পড়িয়া চোখের পাতা আপনি ভিজিয়া আসে।

"অন্তর্যামী" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা। "মেয়েলি ছড়া" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায় পঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রচয়িতা "সাধনায়" তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা নিতান্ত অন্যায় ও অসংগত মনে করি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,—আমরা গতমাসের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।* "মেয়েলি ছড়া,"—ছেলে ভুলাইবার জন্য বঙ্গ গৃহলক্ষ্মীদের মুখে যে সব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট ছড়া শুনা যায়, তাহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা। সমালোচনাটি রবীন্দ্রবাবুর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ। ভাবগুলি ক্ষুদ্র পার্বতীয় প্রবাহিনীর ন্যায় ভাষার কঠিন উপলখণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি রচনার ঝঙ্কারে পরিণত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সমালোচনার কিছু বাহুল্য আছে। এই সকল ছড়ায় যে কোনও বিশেষ দার্শনিক বা নৈতিক তত্ত্ব নিহিত নাই, সেকথা না বলিলেও চলিত। এই ছড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্নরাজ্য হইতে সংগৃহীত, ইহা সহজ বুদ্ধি মাত্রেরই বোধগম্য। ছেলেদের কথার ন্যায় ভাঙা-চোরা ও উদ্দেশ্যরহিত কবিতায় যে আর্য সমাজের কোন প্রাচীন সত্য সংমিশ্রিত আছে, ইহা ভাবিবার লোক এই নীরস বাঙগালীর মধ্যেও বোধ করি নিতান্ত বিরল। আমরা সর্বান্তঃকরণে রবীন্দ্রবাবুর একটি কথার অনুমোদন করি। ছেলেদের কাছে আমাদের দেশের মা সরস্বতী নিতান্ত ভয়ের বস্তু; তাঁহার অত্যাচারে ও আবদারে বালকেরা নিতান্ত শীর্ণ। পড়াশুনার মধ্যে যে একটা আমোদ আছে কূটবুদ্ধি নৈয়ায়িক ও তাহা বালকদের বুঝাইয়া দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। অতএব বর্তমান অবস্থায় কেহ যদি বালকদিগের জন্য আমোদজনক দু-একটি সরল গাথা বা দু-একটি স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী রচনা করেন, তিনি বঙ্গীয় বালক বালিকাদিগের পিতামাতার নিতান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। বঙ্গভাষায় "ফেয়ারীটেল"এর সৃষ্টি হইলে বালকদের মধ্যে অকাল পক্কতার স্রোত কথঞ্চিত পরিমাণে নিবারিত হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বর্গীয় প্রহসন" আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ" একটি উপকারী ও শিক্ষাপ্রদ রচনা।

*পরিশিষ্ট(৩) দ্রষ্টব্য।

৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩০১
পুরোহিত ২য় ভাগ
৩য় ৪র্থ সংখ্যা

এই সংখ্যায় প্রদীপের দুইটি ক্ষুদ্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দুটির একটিতেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই সমালোচনার শেষে সম্পাদক ফুটনোটে লিখিয়াছেন।—"অনেকের ধারণা অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকারী। একথার কি মূল আছে না আছে আমরা অবগত নহি। তবে রবীন্দ্রনাথের অস্ফুট দোষ (অস্ফুট দোষ ব্যাপারটা কি?—সম্পাদক) যত বেশী, অক্ষয়কুমারের তাহার ক্বচিৎ লেশমাত্র আছে। তাঁহার অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা অসংকোচে বলিতে পারি। জন্মভূমিতে এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রায় মতৈক্য আছে।" "সং"—স্বাক্ষরকারী মহাশয় সংকোচের ধার ধারেন না তাই এই অদ্ভুত ফুটনোটটি অসঙ্কোচে পত্রস্থ করিয়াছেন। প্রদীপ প্রণেতা এইটুকু পড়িয়া বলিবেন—"ভগবান আমাকে এমন বন্ধুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন।"

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
পৌষ ১৩০১
সাধনা অগ্রহায়ণ

এই সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "সাধনার" বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য হইয়াছে এমন বোধ হইল না। তবে দেখা যাইতেছে,—নূতন সম্পাদক সমালোচনার বিষয় অবহিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় দুইটি সমালোচনা প্রবন্ধ ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র "গ্রন্থ সমালোচনা" আছে। বর্তমান সম্পাদক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিশালী সুকবি; তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সৌন্দর্য দৃষ্টি, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাহিত্যে অনুরাগ ও বঙ্গ সাহিত্যে প্রভূত প্রতিষ্ঠা আছে। তিনি যদি কর্তব্যবোধে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অবাধে ও অসংকোচে সেই ব্রত পালন করেন, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হয়। তাঁহার সকল সমালোচনা সাধারণের মতানুগত ও প্রীতিপদ হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী লেখকের লেখনী সমালোচনায় নিযুক্ত থাকিলে যে প্রভূত উপকারের আশা আছে তাহা বোধ করি

কেহ অস্বীকার করিবেন না। নূতন সম্পাদক লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন।

এবারকার "সাধনার" সর্বপ্রথমে একটি কবিতা,—"সাধনা।" কবিতাটির ভাষা ও ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই লেখককে চিনিতে পারিবেন,—অতএব এ আত্মগোপন প্রথা অনাবশ্যক মনে করি। কবিতাটি ভালো হয় নাই,—লেখক যেন পুনর্বার তাঁহার শৈশব সঙ্গীত স্মরণ করিয়াছেন। মোটের উপর কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি।

"প্রায়শ্চিত্ত", একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পের প্রথমাংশ যেরূপ মনোহর, উপসংহার সেরূপ হয় নাই। তথাপি গল্পটি মিষ্ট ও পাঠযোগ্য হইয়াছে।

"সুবিচারের অধিকার" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। আশা করি প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। কেননা লেখক এই প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে।

"কাব্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, বিতর্ক আছে।

"ফুলজানি"ও "আর্যগাথা" দুইখানি গ্রন্থের দুইটি স্বতন্ত্র সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা এক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নহে।

স্বরলিপির গানটির বিষয়—'ভারত-জাগানো';—কিন্তু নব্য বঙ্গের কবিগণের উৎকট উচ্ছ্বাসের কল্যাণে ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অরুচি জন্মিয়াছে। বর্তমান গানেও রুচি পরিবর্তনের আশা দেখিলাম না।

পঞ্চম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩০১

সাধনা পৌষ

"বিচারক" একটি গল্প। এই গল্পটির রচনা প্রণালী ও বলিবার ভঙ্গী অতি চমৎকার। (ক্ষীরোদা একজন হতভাগিনী; বিধবা; যৌবনের প্রারম্ভে এক যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া গৃহত্যাগ করে। "অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গত যৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্ন জুটাইবার জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।")

একটি ছোট গল্প কেন—এই আখ্যানবস্তুকে লেখক একটি বড় উপন্যাসে

পরিণত করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র আকারে এই গল্পের সকল উদ্দেশ্য সমস্ত সৌন্দর্য, পূর্ণ বিকশিত হইবার অবকাশ পায় নাই,—ক্ষুদ্র গল্পের প্রয়োজনে ও আয়তনে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনাই ছিল না। যেখানে লেখক মোহিত মোহনের সঙ্গে একটি বিধবা কুলবালার বর্ণনা করিতেছেন—গল্পটির উপসংহার ভাগের সহিত এই স্থলটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; অথচ লেখক তাহা অবান্তর ভাবে নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। —কেবল নিজের কথায় তাহার একটা বিবরণ না দিয়া,—ঘটনাটিকে স্বতন্ত্র প্রাধান্য দিয়া ঘটনার কালে রাখিয়া, আর একটু বিশেষত্ব দিলে,—গল্পের পরবর্তী অংশ আরও উজ্জ্বল হইত মনে করি। লেখক পাপপুরী হইতে ক্ষীরোদাকে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে—কিন্তু পাপের আনুষঙ্গিক ঘৃণা জনক ব্যাপারগুলি বর্জন করিয়া তাহাকে এমন সাবধানে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়াছেন যে, ক্ষীরোদার দুঃখে হৃদয় গলে। তাহার ঘোরতর নিরাশা,—তাহার দারুণ অবসাদ, তাহার পাপের পরিণাম, পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে,—কিন্তু পাপ অনেক দূরে থাকে। এই গল্পে যে একটি সমুচিত সংযম ও সুরুচি প্রিয়তার নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণের যোগ্য। বাস্তবচিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিবার জন্য যাঁহারা ছাল ছাড়াইয়া পাপের অস্থি কঙ্কাল ও পূতিগন্ধময় প্রেত দেহের চিত্র দেখান—তাঁহারা বীভৎস রসের সঞ্চার করেন মাত্র। তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কণ্টক পড়ে, পরন্তু কুরুচির চিত্রে অভীষ্ট আদর্শ আবৃত হইয়া যায়। লেখক ক্ষীরোদার জীবনের বাস্তব ফটো তুলিয়াছেন,—কিন্তু তাহার ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাঠককে বিব্রত করেন নাই। যাঁহারা বাস্তব চিত্রাঙ্কনের ছলে দেশে কুরুচির বীজ বপন করেন—তাঁহারা "বিচারক" গল্পে বাস্তবের সংযত ও সুসংগত চিত্র রচনার দৃষ্টান্ত পাইবেন। পরিশেষে একটি কথা,—বর্তমান সময়ে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়নের সংখ্যা অতি অল্প,—এবং বাঙ্গালী পাঠকেরা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিতে প্রায় কখনো কুণ্ঠিত নহেন। এ অবস্থায় মোহিতমোহনকে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ন না করিলেই ভাল ছিল।

নূতন অবতার একটি রহস্য রচনা। এতখানি পরিশ্রমের উদ্দেশ্য যদি কেবল বিন্দুমাত্র হাস্যরসের অবতারণা মনে করা যায়, তাহা হইলে রচনাটি সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

'সঞ্জীবচন্দ্র' একটি সমালোচনা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সঞ্জীবনী সুধা' নামক পুস্তকখানির প্রথমে সঞ্জীবের প্রতিভার যে সমালোচনা করিয়াছেন 'সাধনার' লেখক বর্তমান প্রবন্ধে অনেকস্থলে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে মান্যবর চন্দ্রনাথবাবু কি বলেন দেখা যাউক। প্রবন্ধের মধ্যে এই অংশই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

৫ম বর্ষ ১১ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩০১
সাধনা মাঘ

'নিশীথে' একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যান কৌশল অকিঞ্চিৎকর; কেবল ভাষার সৌন্দর্যে ও বর্ণনীয় ঐশ্বর্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন ভাষা, এমন অলংকার নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু অর্ধেক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে "ডাক্তার! ডাক্তার!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই গল্পের সূত্রপাত করিলেন। ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া অত রাত্রে কেন যে তিনি নিজের কাহিনী কহিতে বসিলেন তাহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণাবাবু রাত্রি আড়াইটার পর যে ভাষায়, যেরূপ অলংকার দিয়া সাজাইয়া নিজের গল্প বলিতেছিলেন তাহাও স্বাভাবিক নহে। একজন লোক পূর্বকাহিনী বলিতে বলিতে, সুকবির কবিতার ভাষায় বহু পূর্ব দৃষ্ট প্রকৃতির প্রত্যেক ছবি, সূর্যাস্তের স্বর্ণছায়া, শুভ্র নির্মল চন্দ্রালোক হইতে অন্ধকার, শব্দ, সৌরভ, নিঃশ্বাস পর্যন্ত পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা করিতেছেন, ইহা ঠিক স্বভাব-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণাবাবু একজন সেণ্টিমেণ্টাল কবি হইলে বরং কতটা মানাইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাকে যাত্রাদলের একজন স্মরণশক্তিশালী অভিনেতা বলিয়া বোধ হয়। লেখক তাঁহাকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, সাধনা পাঠকের গল্পপিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি রাত্রি আড়াইটার সময় তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন মাত্র। লেখকের গল্পকৌশলের অভাবে এবং স্বভাবসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না থাকায় গল্পটির মুণ্ডপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনাভঙ্গী ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। আর এতখানি ভাষার ব্যয় কিসের জন্য? মানবজীবন রহস্যের কোন অংশের ছবি আঁকিবার জন্য লেখকের এত প্রয়াস তাহাও ত স্পষ্ট বোধগম্য হইল না।

"সন্ধ্যা" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতাটি অতি সুন্দর। (সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত)

লেখক, বসুন্ধরার যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। ইহাতে উদার সমবেদনা ও করুণার কি সরস উচ্ছ্বাস!

"সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ" আলোচনা করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। এই প্রবন্ধে লেখক চিন্তাশীলের ন্যায় তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছেন।

"আবদারের আইন" একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। কটন ডিউটি দেশের পক্ষে

অনিষ্টকর, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। প্রবন্ধটি সুবৃহৎ, কিন্তু অনতিক্রম্য যুক্তি-তর্কের বাহুল্য তাহার কারণ নহে। লেখক যদি অনাবশ্যক রসিকতা, পুনরুক্তি ও অযথা বিস্তৃতির পক্ষপাতী না হইতেন তাহা হইলে প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত। তাঁহার মত জানাই আমাদের পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু তদুপলক্ষে কতকটা রসিকতার আস্বাদ লইতে হয়ত সকলের ভাল লাগিবে না।

"কৃষ্ণচরিত্র" প্রবন্ধে লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের" সমালোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

৫ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা
চৈত্র ১৩০১
সাধনা ফাল্গুন

"আপদ" একটি ক্ষুদ্র গল্প; গল্পটির স্থানে স্থানে বর্ণনা বেশ মনোহর। ইহার উপাখ্যান ভাগ অতি অল্পমাত্র।

"কৃষ্ণচরিত্র" সমালোচনা এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। এই দুরূহ বিষয়ে কোন মত ব্যক্ত করিতে পারি আমাদের এমন ক্ষমতা নাই। বঙ্কিমবাবু এখন স্বর্গারূঢ়, তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কি এ-বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই? বঙ্কিমবাবুর জীবিতকালে এই তর্ক উত্থাপিত হইলে মীমাংসার অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে "কৃষ্ণচরিত্রের" সমালোচক বঙ্কিম-বাবুর মৃত্যুর পর এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন সুতরাং গ্রন্থকারের সহিত বিচার-বিতর্কে যে ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে।

"কৌতুকহাস্যের মাত্রা" বেশ হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ" একটি কবিতা। একটি উপনিষদের গল্প এই কবিতার বিষয়।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩০২
সাধনা চৈত্র ১৩০১

"দিদি" একটি ক্ষুদ্র গল্প। শশীকলা কালীপ্রসন্নের আদরের মেয়ে,—জয়গোপালের সহিত তাহার বিবাহ হয়। শশী ও জয়গোপাল ষোল বৎসর একাদিক্রমে একসঙ্গে জীবনযাপন করিতেছিল। কালীপ্রসন্নের শশী ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না,—কিন্তু নিতান্ত শেষ বয়সে তিনি এক পুত্র লাভ করিলেন। ছেলের নাম হইল নীলমণি। নীলমণির আবির্ভাবে শশী ও জয়গোপাল বড় প্রীত হইলেন না। কেননা, কালীপ্রসন্নের বিষয়-সম্পত্তির

উত্তরাধিকারীত্ব এখন আর তাঁহাদের রহিল না। জয়গোপাল নিশ্চিন্ত মনে একটা সামান্য চাকরী উপলক্ষ করিয়া ষোল বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিলেন,—এক্ষণে শ্বশুরের ভাবী উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব দেখিয়া তিনি চাকরী করিতে আসাম চলিয়া গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নীলমণি মাতৃহীন হইল। মা-মরা ছেলের প্রতিপালনের ভার অগত্যা দিদির উপর পড়িল। প্রথম এই ব্যাপারটা শশীর পক্ষে বড় প্রীতিকর হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে সর্বজয়ী স্নেহ শশীর রমণীহৃদয় জয় করিল,—ক্রমে ক্রমে মা-মরা ভাইটির প্রতি শশীর অত্যন্ত মায়া জন্মিল, এবং সে নীলমণিকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন করিতে লাগিল। নীলমণির বয়স যখন দুই বৎসর, তখন কালীপ্রসন্ন দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-কালে শশীকে সিকি বিষয় লিখিয়া দিয়া গেলেন,—অবশিষ্ট অবশ্য নীলমণির রহিল। জয়গোপাল দেশে ফিরিলেন, গৃহে অন্য কোনও অভিভাবক নাই, অগত্যা তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। জয়গোপাল নীলমণিকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না। শশী তাহা বুঝিতে পারিত, এবং ভাইটিকে সর্বদা সযত্নে বিহঙ্গমাতার মত আপনার স্নেহ-পক্ষ-পুটে লুকাইয়া রাখিত। একদিন শশী শুনিল যে গ্রামে জনরব, তাহার স্বামী নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নীলাম করিয়া নিজের পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে। প্রথমে সে এ জনরবে বিশ্বাস করে নাই,—জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই; তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন গোপনে খাজনা বাকী ফেলিয়া মহল হালিমপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতে পারি নাই।' শশী নালিশ করিতে বলিল,—কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতির ওজর করিয়া জয়গোপাল তাহা কাটাইয়া দিলেন। "স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য" কিন্তু কিছুতেই সে একথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। এমন সময় নীলমণির উৎকট পীড়া হইল। শশী ভালো ডাক্তার আনিতে বলিল। তাহার স্বামী কহিল,—সহরের ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইল। সেখানে নীলমণির চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। পরদিনেই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত,—ক্রোধে অগ্নিমূর্তি—কহিলেন, এখনই বাড়ী ফিরিয়া চল। শশীও স্পষ্ট বলিল, যদি কাটিয়া ফেল তবুও এখন আমি ফিরিব না। জয়গোপালও বলিয়া গেল যে, তবে এইখানেই থাক, আর আমার বাড়ীমুখো হইও না। শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া বলিল,—ঘর

তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর! জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা সে দেখা যাইবে। শশী গহনাপত্র বেচিয়া ভাইটিকে রোগমুক্ত করিল। এই সময় সে খবর পাইল যে, জয়গোপাল নীলমণির অবশিষ্ট বিষয়টুকুও যোগাড় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। শশী আর কি করিবে,—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণী-বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল। ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। তিনি শশীকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে চিঠি লিখিলেন। জয়গোপাল পত্রপাঠ আসিয়া শ্যালক সহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ী লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। শশী মরমে মরিয়া থাকে, এবং নীলমণি মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়ায়, এমন সময় একদিন গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। জয়গোপাল তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় চৌকিতে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতেছে, এমন সময় সহসা সেখানে নীলমণিকে লইয়া শশী উপস্থিত,—শশী সেখানে নীলমণির সমস্ত ইতিহাস আদ্যন্ত বলিয়া গেল। সম্মুখে জয়গোপাল বসিয়া সব শুনিল, মধ্যে শশীর কথায় বাধা দিতে গিয়া সাহেবের ধমকানিতে নীরব হইয়া রহিল। সাহেব নীলমণিকে নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। তাহার দিদি,—এই গল্পের নায়িকা জয়গোপালের ঘরে ফিরিল; আবার সেই চির-পরিচিত ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না, কারণ ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে রাত্রে শশী ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গল্পটি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণনায় উজ্জ্বল এবং ঘটনাবিন্যাসে মনোরম হইয়াছে। বিশেষতঃ শশীর চিত্তবৃত্তির প্রত্যেক পরিণতি লেখক এমন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহাতে করিয়া তাহার বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতিও সম্পূর্ণ চেতন ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির সূক্ষ্মতম স্বভাব সংগত বিশ্লেষণে লেখকের পর্যাপ্ত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রতিক্ষণে এই গল্পের নায়িকাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফেলিয়াছেন। এবং সেই অবস্থায় তাহার যেরূপ মানসিক বিপরিণাম সম্ভবে, দার্শনিকভাবে কিন্তু কবির ভাষায় তাহা বর্ণবদ্ধ করিয়াছেন। একদিকে চির-জীবনের সঙ্গী স্বামী, সমস্ত জীবনের অদ্বিতীয় সম্বল দাম্পত্য-প্রেম,—অন্যদিকে নিরাশ্রয় অনাথ অসহায় নিরুপায়, নিজের হাতে মানুষ করা মা-মরা ছোট ভাই—অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক সহজাত ভ্রাতৃস্নেহ, একদিকে লোভের স্বার্থের পরবঞ্চনা প্রবৃত্তি অন্যদিকে নিরুপায় অক্ষম শিশুর সর্বনাশ,—সর্বস্বান্ত,—এই দুই বিষম সমস্যার সন্ধিস্থলে, যেখানে শশীর চিত্তে তুমুল

ঝঞ্ঝা রহিয়াছে, এবং যেখানে পরিশেষে সে ন্যায়ের, ধর্মের, যথার্থ স্বার্থমুক্ত প্রেমের অর্থাৎ—স্বভাবের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে, তাহা বস্তুতঃই মনোহর. সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিচাতুরীর পর্যাপ্ত প্রমাণ। এ অংশে গল্পটি সর্বাঙ্গসুন্দর। মানব-চিত্তবৃত্তির এক অবস্থার একখানি নিখুঁত ছবি, এই গল্পে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লেখক ঘটনাবিন্যাসের সময় দেশ কাল পাত্রের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা করিয়া শশীকে যেভাবে সাহেবের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন, তাহা শশীর চরিত্রে খাপ খায় না। যদি শশীর চরিত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকিত তাহা হইলে আমরা ইহাকে অস্বাভাবিক মনে করিবার অবকাশ পাইতাম না। আশা করি এবং প্রার্থনা করি লেখক শেষরক্ষায় মনোযোগী হইবেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০২

সাধনা জ্যৈষ্ঠ

"ঠাকুর্দা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আর কোনও আকর্ষণ নাই থাক্, এই গল্পের কৈলাস চৌধুরী নামক 'নয়নজোড়ের জমিদার বংশের নির্বাপিত বাবুটি' বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩০২

সাধনা আষাঢ়

"প্রতিহিংসা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পের আত্মসম্মানদৃপ্ত অথচ মধুর স্নেহসিক্ত ইন্দ্রাণীর চরিত্রটি নূতন ধরণের, এবং এই ক্ষুদ্র গল্পের ফ্রেমের ভিতরে তাহার বেশ শোভাও হইয়াছে। "দুই বিঘা জমি" একটি নূতন ধরণের সুন্দর কবিতা। "অপূর্ব রামায়ণ" পাঞ্চভৌতিক সভার একটি অংশ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৩০২

সাধনা শ্রাবণ

প্রথমেই পাঞ্চভৌতিক সভায় "ভদ্রতার আদর্শ" প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা আছে। পরিচ্ছদের প্রকার ভেদের সঙ্গে ভদ্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ব্যোম বলিতেছেন যে, "ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন

গুটাইয়া বাগানের কাজ করে তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাত বংশীয়া প্রভু মহিলার লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোন কাজ নাই, কর্ম নাই, দীর্ঘদিন রাজপথ পার্শ্বে নিজের গৃহদ্বার প্রান্তে স্থূল বর্তুল উদর উদ্ঘাটিত করিয়া হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্বোধের মত তামাক টানি, তখন বিশ্ব জগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের, কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি।" হয়ত অনেকের মতে "ভদ্রতার" অন্য আদর্শও আছে—ফ্যাশনের বাহিরে তাহার রাজত্ব, —কেবল দেশ বিদেশের পরিচ্ছদ বিশেষেই সে ভদ্রতার বসতি নহে,—আবৃত বা নগ্ন, সর্ববিধ হৃদয়েই তাহা থাকিতে পারে! শোভনতার অভাবকে 'অভদ্রতা' বলিতে সকল সামাজিক সম্মত হইবেন কিনা, বলা যায় না। যে 'ইংরেজ মালী গায়ের কোর্তা খুলিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া কাজ করে তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাত বংশীয়া প্রভু মহিলার লজ্জা হয় না,'—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে, অসভ্য আফগানস্থানের মুসলমান রাজকুমার, সেই মালীর দেশে তাহার প্রভু মহিলার বা তদপেক্ষা অভিজাত বংশীয়াদের অনাবৃত বক্ষ দেখিযা বলরুমের একপার্শ্বে সংকুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয় পক্ষের কাহাকেও অভদ্র বলিতে গেলে, দুদলের প্রতিই অন্যায় করিতে হয়। পরিচ্ছদ ভিন্নও ভদ্রতার অন্য চিহ্ন ও অন্য আদর্শ আছে, তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া শ্রেণীভেদ না করিলেও দুনিয়া নিতান্ত অভদ্র হইয়া পড়িবে না—পাঞ্চভৌতিক সভার কোনও সভ্য ব্যোমকে এই বলিয়া অনায়াসে আশ্বস্ত করিতে পারিতেন!

"ক্ষুধিত পাষাণ" একটি অতি চমৎকার সুরচিত গল্প—একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। এই গল্পের রচনা প্রণালী যেমন সুন্দর, ইহার কল্পনা কৌশলও তেমনি মনোহর। বর্ণনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনিই কবিত্বপূর্ণ। গল্পটিতে পাঠকের আগ্রহ আদ্যন্ত জাগরিত থাকে,—এবং নিঃশেষে পাঠ করিয়াও কৌতূহল-পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এই গল্পের সেই মায়ামন্দির, সেই তরুণী ইরাণী, সেই অরালী পর্বতের শিখরে ঘন সন্ধ্যা প্রভৃতি কবির অতি সুন্দর সৃষ্টি—সত্যসত্যই যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩০২

সাধনা ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক

সাধনা।—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, "সাধনা" অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্য সংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া সাধনাকে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাঁহার পর "সাধনা" ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনার" বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয় বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে "সাধনা" বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে সাধনার মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবকাশ পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

এবারকার "সাধনার" প্রথমেই সম্পাদকের রচিত "বিদ্যাসাগর-চরিত"। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ সম্ভাবিত নহে। আমরা কেবল এজন্য লেখকের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যে দিন এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ সভায় প্রথম পঠিত হয়, সেইদিন সভাপতি শ্রীযুত জাস্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য রবীন্দ্রবাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জীবনচরিতের আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদার সহানুভূতি, তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, উন্নত বর্ণনাকৌশল ও পরিণত লিপিকুশলতার আবশ্যক,—রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে। তিনি বিস্তৃত জীবনচরিতের রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন মনে করি।

"অতিথি" একটি গল্প। লেখক ইহাতে একটি ধারাবাহিক পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্রশালার মধ্যে একটি সকলবন্ধনহীন সংসার বন্ধন ভীরু স্বাধীনতাপ্রিয় নির্বিবাদী সদাসপ্রতিভ বালক ও আর একটি পল্লী বালিকার মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"পাঞ্চভৌতিক সভায়" বৈজ্ঞানিক কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে।

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩০৩
ভারতী কার্তিক

"রামমোহন রায়" সন্দর্ভটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। ভারতী-সম্পাদিকারা তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন, বলা যায় না। প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত ভাষার লীলায় অলঙ্কৃত, কিন্তু স্থানে স্থানে এত সংস্কৃতবহুল ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে যে, কৃত্রিমতাপূর্ণ মনে হয়। প্রবন্ধ মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য অল্প; কিন্তু কবিবর

কবিজনসুলভ কৌশলে তাহাকেই অত্যন্ত ফেনাইয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত প্রবন্ধটি ক্ষণভঙ্গুর জলবুদ্বুদের মত আপাতসুন্দর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। "রামমোহন রায়" রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রতিভার যোগ্য হয় নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রবাবুর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিকে শব্দরঞ্জিত চিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চিত্র বিচিত্র পাথর কাটিয়া বসাইয়া যেমন ইটালীয় শিল্পী 'মোজেক' শিল্প নির্মাণ করে, রবীন্দ্রবাবু তেমনই বিচিত্র শব্দমালা. বাছিয়া সাজাইয়া এই 'শব্দচিত্রের' রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে. এরূপ সুগঠিত সুরঞ্জিত প্রতিমার প্রাণ নাই।

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
পৌষ ১৩০৩
ভারতী পৌষ

"স্বরলিপির" গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত. আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

("আমি চিনি গো চিনি তোমারে।" সম্পূর্ণ গানটি উদ্ধৃত)

৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
আষাঢ় ১৩০৪
ভারতী আষাঢ়

"স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে। গানটি সুনির্বাচিত সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টি মাত্র; ভাবের বিশেষত্ব. যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির নিকট আশা করা যায়,—ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

৮ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা
চৈত্র ১৩০৪
প্রদীপ মাঘ

"অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি" কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাটি কবিবর রবীন্দ্রনাথের যোগ্য হয় নাই।

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
ভারতী বৈশাখ

এই সংখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। বাইশ বৎসরের পর "ভারতী"কে বালিকা সাধনার

বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। "ভারতী"র সহসা এ কুব্জভাব কেন? "দুঃসময়" নামক দুর্বোধ কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্ব পরিচয় আদৌ নাই। শব্দের দিকে লেখকের যেমন দৃষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তির প্রতি তাঁহার তেমনি ঔদাসীন্য। শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসই যেন রচনাটির লক্ষ্য,—আর সিদ্ধহস্ত প্রবীণ কবির রচনায় 'ম্যানারিজম 'নিতান্তই অসহ্য। "দুরাশা" একটি ক্ষুদ্র গল্প—আখ্যানবস্তু মনোরম, বর্ণনাকৌশল ও শব্দবিন্যাস অতি সুন্দর। সকলেই জানেন, "কণ্ঠরোধ" নামক প্রবন্ধটি টাউন হলে সিডিশন বিলের প্রতিবাদ-সভায় পঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর এই রাজনৈতিক প্রবন্ধটির ভাষা "কাদম্বরী"কেও পরাজিত করিয়াছে। যুক্তি ও তর্কই রাজনৈতিক রচনার প্রাণ,—এবং তাহা সাধারণবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়াই বিধি। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর 'কণকিঙ্কিণীক্কণিত বাণীর শিঞ্জিতধ্বনি' চটপট করতালি লাভের অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গালোচনার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না! বক্তৃতার একটা বিশেষ ভাষা আছে, এবং থাকাও আবশ্যক: আমাদের রাজনৈতিক রচনার ভাষাও কি এইরূপ 'জীমূত মন্দ্র বিনিন্দিনী' না করিলে চলিবে না? যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের পারগামী তাঁহাদের জন্য ভাবি না: —কিন্তু যাহারা নহিলে সভা হয় না,—অতঃপর সেই সাধারণ কেরানীকুল ও ছাত্রবৃন্দ কি "প্রকৃতিবাদ" অভিধান বগলে করিয়া সভায় ছুটিবে?—তাহাদের যদি হাত জোড়া থাকে, তাহা হইলে কাহারা করতালি দিবে? মনে করিয়া দেখুন,—পার্লামেন্টের একটা বিলের আলোচনার সময় যদি কোনও সভ্য কবি সুইন্‌বার্ণের ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা কেমন শুনায়? আমাদের দেশে অনুকরণ বা হনুকরণ বৃত্তি বড় প্রবল,—তাই এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া "সাহিত্যের" এতটা স্থান নষ্ট করিলাম।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০৫

ভারতী জ্যৈষ্ঠ

"জুতা-আবিষ্কার" একটি অদ্ভুত ও উদ্ভট রচনা,—লেখকের বিদ্রূপরচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির চেষ্টা 'কমিক' বটে!

উৎসাহ বৈশাখ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সে আমার জননীরে" একটি সদ্ভাবপূর্ণ গান।

উৎসাহ জ্যৈষ্ঠ

প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান—"ভিখারী"।

কবিবর কি সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি অভিমান করিয়া হেঁয়ালি-উপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিচিত্র অমর সংগীতে বঙ্গভূমির কবিকুঞ্জ মুখরিত, তাঁহার সংগীত শিল্পের কি এই ক্রমবিকাশ? স্বাক্ষরের স্থলে রবীন্দ্রবাবুর নাম না থাকিলে, গানটি রবীন্দ্রবাবুর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না।

প্রদীপ বৈশাখ

"বিদায়" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান। গানটির ধুয়া—"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" "বাঁধন ছিঁড়িবার আগেও তদুপলক্ষে গান বাঁধিতে হয়—কবিজননী বঙ্গভূমির এমনই সরস বাতাস।

৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩০৫

ভারতী আষাঢ়

"ডিটেকটিভ" নামক ক্ষুদ্র গল্পটির আখ্যানবস্তু সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। বিষয় নির্বাচনে ও ঘটনার সমাবেশে নিপুণতার পরিচয় নাই। লেখকের লিপি-কুশলতার অভাবে বর্ণিত ঘটনাগুলি নিতান্ত অসম্ভব ও খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। গঠনকৌশল এমন দুর্বল যে, বর্ণিত ঘটনা পরম্পরার দুই তিনটি স্তর অতিক্রম করিলেই পাঠকের সম্মুখ হইতে গল্পটির রহস্য যবনিকা সহসা অপসৃত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে অকালে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বোধ হয়, লেখক নূতন ব্রতী। তিনি আখ্যানবস্তুর রহস্যরক্ষায় ও গল্প গঠনে বিফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। অল্প পরিসরের মধ্যে ডিটেকটিভের সন্দিগ্ধ প্রকৃতি দক্ষতা সহকারে চিত্রিত হইয়াছে। মন্মথর চরিত্রও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঘটনাবিন্যাসের দোষে তাহার আদ্যোপান্তে সংগতি নাই। যে অতি-সাবধান আত্মসংযত মন্মথ বুদ্ধি কৌশলে প্রতি পদে চতুর গোয়েন্দার অনুসন্ধান বিফল ও কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে, সেই মন্মথ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আপনার প্রণয়দেবতার সাক্ষাৎলাভের যে উপায় নির্ধারণ করিয়াছিল, তাহা গল্পটির উপসংহারের পক্ষে আবশ্যক হইলেও, মন্মথ-চরিত্রের সহিত আদৌ তাহার সামঞ্জস্য নাই। এই সকল ত্রুটির অতিক্রম করিতে পারিলে, লেখক ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবেন। "বর্ষামঙ্গল" একটি উৎকৃষ্ট মনোরম কবিতা। কবি সুনিপুণ

তুলিকায়, উজ্জ্বলকোমল বর্ণরাগে, প্রাবৃটলক্ষ্মীর "স্নিগ্ধসজল" ঘনশ্যামল শ্রী চিত্রফলকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে কত যুগ যুগান্তরের বিগত বর্ষার গাথা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে, সংস্কৃত কাব্য-কাহিনীর প্রাবৃট-ঘনচ্ছায়া সুখস্বপ্নের মত হৃদয় আচ্ছন্ন করে। আমরা কবিতাটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—(কবিতাটির অধিকাংশই উদ্ধৃত)

উৎসাহ আষাঢ়

"মাতার আহ্বান" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। রবীন্দ্রবাবু আজকাল স্বরচিত কবিতায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল ও কবিতা সার্থক হউক।

৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩০৫

প্রদীপ আষাঢ়

"চৈতালী সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের লিখিত আলোচ্য প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কৃত "চৈতালী সমালোচনা"র প্রতিবাদ। তৃতীয় প্যারায় লেখক বলিতেছেন, "সোনারতরী পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। রমণীবাবু অনায়াসে নিজের ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিতে পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? কিন্তু লেখক নিজে যে অধিকার সম্ভোগ করেন, অন্যকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে নিমেষের জন্যও সঙ্কুচিত নহেন। 'সোনার তরী' সম্বন্ধে লেখকের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন ; কিন্ত রবীন্দ্রবাবুর "হিং টিং ছট" নামক কবিতাটি পড়িয়া, "তর্ক-বৈচিত্র্যের" সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে যে ভাবের 'উদ্রেক' হইয়াছিল, তাহা রমণীবাবুর মতে "বিকৃত ব্যাখ্যা।" রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে রমণীবাবুর সহিত যাঁহাদের মতভেদ হয়, তাঁহারাই "উহার মর্মগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।" সাহিত্য জগতে এমন কোন বিধি নাই, যাহার বলে সকলকেই রমণীমোহন-নামক মল্লিনাথের কৃত ব্যাখ্যাই শিরোধার্য করিতে হইবে। রমণীবাবু "সাহিত্যে"র এই নগণ্য সম্পাদকের প্রতি অতি সুপ্রসন্ন। "সাহিত্য" সম্পাদক সম্বন্ধে লেখক দয়া করিয়া লিখিয়াছেন,—"সাহিত্য-সমাজপতি" বলিয়া যাঁহারা পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন সহজে এরূপ একটা কবিতার অর্থ বিভ্রাট ঘটাইতে পারেন, ইত্যাদি। লেখক কোন সূত্রে

অবগত হইলেন যে, এই দীনতম "সাহিত্য" সম্পাদক "সাহিত্য-সমাজপতি" বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিত ছাত্রকে, একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গালি দিবার জন্য মিথ্যা কথার ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রবাবুর কাব্য বা তাঁহার নিজের সমাজ, কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সাহিত্য-সম্পাদক একটি সরল কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। কমা দিয়াও গানটি পুনর্বার পড়িয়া দেখিলাম, এবং এখনও আমার বিশ্বাস "মম হৃদয় শয়ন মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে, মম অন্তরে থাকি থাকি" "কেবল কষ্টকল্পিত চর্বিতচর্বন নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।" যদিও রমণীবাবুর এই ধৃষ্টতার মত পরিমাণে তত অধিক নহে। লেখক রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনা হইতে বিবিধ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক আশা করেন, তাঁহার মত সকলেই রবীন্দ্রনাথের বিন্দু ও বিসর্গ পর্যন্ত অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। নিধুবাবু গাহিয়াছিলেন,—"তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে," এবং "যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে।" সমালোচক তেমন-ই রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা দিয়া তাঁহার পদ্য রচনা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত যে সর্ববাদীসম্মত না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে যে পৃথিবীতে অন্যান্য বিবিধ মত বিদ্যমান,—রবীন্দ্রবাবুর অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের বিরুদ্ধ মত যে অন্য সমালোচকের 'পর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ-বিষয়ে রমণীবাবু সম্পূর্ণ অন্ধ। তিনি হেমেন্দ্রপ্রসাদের আরোপিত দোষের নিরাসার্থ যুক্তির অবতারণা করেন নাই,—প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর অভিমত মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর অভিমত রমণীবাবুর পক্ষেই প্রমাণ ও পর্যাপ্ত হইতে পারে—অন্যের পক্ষে নহে। এই 'সহজ' সম্ভাবনা 'সরল' সত্যটুক রমণীবাবুর মস্তিষ্কে আদৌ উদিত হয় নাই, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। 'চৈতালী' সম্বন্ধে নিজের মত একান্তে রাখিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে, রমণীবাবুর কৃত প্রতিবাদের ভিত্তি নাই। তিনি বলিয়াছেন, "চৈতালীর রীতিমত সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত।" লেখকের এ-কথা সত্য। লেখক প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছনে,—"এ-দেশে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার সমুচিত আদর হয় নাই। * * নব্যবঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়।" লেখকের এই উক্তির মধ্যেও অনেকটা সত্য আছে। নহিলে 'চৈতালী'-সমালোচনার এমন যুক্তিসম্পর্কশূন্য ভক্তিমাত্র সম্বল প্রতিবাদ আমাদিগকে দেখিতে হইত না। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ

নামক সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিতেছি না। 'ভগবান! রবীন্দ্রনাথকে এমন ভক্তের কবল হইতে রক্ষা কর।'

৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩০৫
ভারতী শ্রাবণ

"সাময়িক সাহিত্যে." "সাহিত্যের" সমালোচনা স্থলে মাননীয় "ভারতী" সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছেন। ফাল্গুন-চৈত্রের "সহযোগী সাহিত্য" প্রসঙ্গক্রমে অস্মদ্দেশের লেখক ও সমালোচকের অহি-নকুলভাবের বিষয়ে সাধারণভাবে দুই-এক কথা বলা হইয়াছিল। "ভারতী"র সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার লক্ষ্য নহে। তথাপি তিনি "সহযোগী সাহিত্যে"র লেখককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিতে লজ্জিত হন নাই। 'টুপী' ব্যক্তিবিশেষের মাথায় "ফিট" হইয়া বসিলে টুপীওয়ালা বেচারা কি করিতে পারে? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার প্রতিবাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"মেছোহাটার ভাষা এত দূরে পেঁছে না." তাঁহার আক্রমণের নমুনা নূতন করিয়া না দিলেও চলে। আমরা কবিবরের এই 'চাপানে'র উতোর গাহিতে বস্তুতই অসমর্থ।

৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩০৫
ভারতী ভাদ্র

"অধ্যাপক" গল্পটি সুখপাঠ্য। আখ্যানবস্তু সামান্য। কিন্তু বর্ণনার বিচিত্র ভঙ্গী, অলংকারের সমৃদ্ধি, সুষমা ও ইন্দ্রজালময়ী 'কাব্যমায়া'র বিচিত্র বিকাশে এই সামান্য গল্পটিও মনোরম হইয়াছে। গল্পের মহীন্দ্র একজন অন্তঃসারশূন্য 'লিটারারী'—লেখক তাহার নিষ্ফল প্রয়াস, হাস্য-রসাত্মক অহমিকা প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া পাঠকের সহানুভূতি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু একটি গুণে আমরা মহীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছি। মহীন্দ্রের অধ্যাপক প্রতি মুহূর্তে শিষ্যের শূন্যগর্ভ সাহিত্যগর্ব খর্ব করিতেন এবং মহীন্দ্র তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যাপককে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলিত ;—সমালোচকের উক্তি তাহার মনঃপূত হইত না, এজন্য সে নিজেকে বড় এবং সমালোচকদের ছোট মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিত। কিন্তু মহীন্দ্র বোধ করি, কলেজের চতুঃসীমা অতি-

ক্রম করিয়া কখনও আমাদের বর্তমান সাহিত্যসমাজে পায়ের ধূলা দিবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে সমালোচকের বা তাহার চক্ষুঃশূল অধ্যাপকের অন্য লাঞ্ছনা করিয়াই নিরস্ত ছিল;—বিদ্বেষবশে বা নীচতার আতিশয্যে কেহ যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছে বা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও এই অল্পবুদ্ধি নকল কবির অন্তঃসারশূন্য বুদ্বুদবহুল চিত্তে একবারও উদিত হয় নাই। বিরুদ্ধ সমালোচনায় চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অপ্রীতি, বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—এবং সরল হৃদয়ে বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকের শিরে কোনও মতলবের আরোপ করে নাই,—ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাই। এবং মনে হয়, কালক্রমে তাহার সাহিত্যব্যাধির উপশম হইলে, এই হৃদয়ের গুণে মহীন্দ্র এক প্রকার নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেশের আসল সাহিত্যিকগণ যদি এই কবিসৃষ্ট নকল কবির সরলতার অনুকরণ করিতেন!

"ভাষা ও ছন্দ" একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ কবিতা,—তবু ভাষার কৃত্রিমতায় ও কষ্টকল্পিত ভাবের ভারে ইহার উৎকর্ষের অনেক হানি হইয়াছে।

৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

ভারতী আশ্বিন

"রাজটীকা" গল্পটি সুন্দর। ইহার আদ্যোপান্ত উজ্জ্বল বিদ্রূপরাগে রঞ্জিত। "মদনভস্মের পূর্বে" ও "মদনভস্মের পর" দুইটি খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পর যোগসূত্রে সম্বন্ধ। এই কবিতাযুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরম রমণীয়। বিশেষতঃ "মদনভস্মের পর" ইতিশীর্ষক কবিতাটির রচনাকৌশল ও শব্দচয়নচাতুরী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পী কবিতা-দেবীর মন্দিরগঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কিছু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধ করি অনতিক্রমনীয় কেন না, শব্দসঙ্গীত সৃষ্টির মোহে একান্ত মুগ্ধ হইলে অন্য দিকে কবির দৃষ্টি থাকে না।

৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৩০৫

ভারতী কার্তিক

"দেবতার গ্রাস" কবিতায় লিখিত একটি সুন্দর গল্প। ভাষার উচ্ছ্বলিত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে গল্পটি অবলীলাক্রমে উপসংহারের অভিমুখে অগ্রসর

হইয়াছে। ছন্দের কঠোর বন্ধনে কোথাও তাহার লীলাময়ী গতির রোধ হয় নাই। স্নেহ প্রেম সৌন্দর্যের সু-কোমল অরুণাভায় গল্পটির প্রারম্ভভাগ সু-রঞ্জিত,—কিন্তু এই স্নিগ্ধ আলোকের পর কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার। —সেখানে অন্ধ কুসংস্কার, তামসী স্বার্থপরতা ও অরুন্তুদ নিষ্ঠুরতার কি ভয়াবহ প্রতি-দ্বন্দিতা। তাহাতে সঙ্কুচিত শঙ্কিত মথিত হৃদয় শিহরিয়া চমকিয়া মুহ্য-মান হইয়া আসে, এবং সর্বশেষে এই বিচিত্র ছায়ালোক-সম্পাতরচিত চিত্রখানির মধ্যে সহসা করুণরসোচ্ছ্বাসপূত ব্রাহ্মণের পরার্থে আত্মদান কি মহনীয় কি বরণীয় কি স্পৃহনীয় বলিয়া মনে হয়। কবির নিষ্ঠুর কল্পনায় হৃদয় পিষ্ট হউক, কিন্তু তাঁহার কাব্যকৌশল প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩০৫

ভারতী অগ্রহায়ণ

"মণি-হারা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু বৈচিত্র্যবিহীন। কিন্তু রচনাগুণে গল্পটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। যে মাষ্টারের মুখে লেখক গল্পবস্তুর অবতারণা করিয়াছেন, সে চরিত্রটির সঙ্গে মূল গল্পসূত্রের সম্বন্ধ মাত্র নাই; সে ব্যক্তি গল্পের কথকমাত্র। বরং তাহাকে দুনিয়ার স্বয়ংসিদ্ধ বিরূপ সমালোচক বলা যায়। সংসার রঙ্গভূমির ভাবের দিকটা মাষ্টারের সম্পূর্ণ অগোচর, তাহার মতে সে ভাগটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, এবং নিতান্ত খেয়ালি লোকের ও মেয়েদের একচেটিয়া। নিতান্ত সোজাসুজি ব্যাপার ও তাহার সহজ মীমাংসা ভিন্ন আর কিছু এই বিরাগতিক্ত নীরস লোকটির বিচারে সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। চরিত্রটি যদিও সচরাচর বিরল নহে, তথাপি তাহার এই চিত্রখানি নূতন বলিয়া মনে হয়। তাহার টীকা-টিপ্পনী মন্তব্য, অযাচিত উপদেশ, বিবিধ সমস্যার উদ্ভট মীমাংসা অদ্ভুত বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয় না। গল্পের এই অবান্তর চরিত্রটির রেখাচিত্রে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও যথাযথ অঙ্কননিপুণতার প্রভূত পরিচয় আছে। ভাবপ্রবণ ফণিভূষণ ও তাহার পাষাণ-প্রতিমা পত্নী, দুই জনের চরিত্র পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পটি যেমন জমিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু মাষ্টারের তীব্র শ্লেষে, অদ্ভুত বিচারে সে অভাব বুঝিতে পারা যায় না। গল্পের ভাষা অনেক স্থলে লেখক টানিয়া বুনিয়াছেন,—শিরোবেষ্টন পুরঃসর নাসিকা-প্রদর্শন আজকাল গদ্যভাষার একটা আর্ট বলিয়া অনেকের সংস্কার, কিন্তু তাহাতে গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব কি না, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সে বিচারের এ স্থল নহে। কিন্তু লেখকের উপমাকৌশল অতি সুন্দর উপভোগের

উপযুক্ত।—শুধু সৌন্দর্যের বিকাশ নহে, তদ্দ্বারা স্বীয় বক্তব্য সহজে ও অনায়াসে সুপ্রকাশিত ও সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন।

৯ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩০৫

ভারতী পৌষ ও মাঘ

"দৃষ্টিদান" গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। গল্পটির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও কোমল তরুণতার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর মত করুণরসের স্নিগ্ধ পূতধারা বহিয়া যাইতেছে। সুদক্ষ কবি, কঠোর দার্শনিকের মত কঠিনভাবে নায়কের চিত্তবৃত্তির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আবার করুণাকোমল কবির ন্যায় সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে সেই ক্ষত-বিক্ষত নারীহৃদয় ভক্তিপ্রেমের সুকোমল কমলজলে আবৃত করিয়া দিয়াছেন।

১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩০৬

ভারতী ফাল্গুন ও চৈত্র

প্রথমেই আটচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নামক নাটকাকারে গ্রথিত একটি সুদীর্ঘ পদ্য। মানব-চরিত্রের যে দুর্বলতার চিত্র আঁকিবার জন্য লেখক এতবড় চিত্রপট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোধকরি, ইহা অপেক্ষা অল্প পরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইলে সমধিক সঙ্গত ও শোভন হইত। এই বিপুল পদ্যসমষ্টির কোনও বিশেষত্ব নাই, পক্ষান্তরে, অতিবিস্তৃতিদোষে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ও বিরক্তির সঞ্চার হয়।

"গ্রাম্যসাহিত্য" প্রবন্ধে পাবনা জেলায় প্রচলিত কতিপয় গ্রাম্য ছড়া সংগৃহীত ও তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে লেখক নিজের বিস্তর ও দুস্তর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখক আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন:—তাঁহার মতে সমাজে যে স্বাধীন প্রেম [অর্থাৎ প্রচলিত দাম্পত্য সম্বন্ধের বিরোধী মানসিক বিকার, সমাজ যাহাকে ব্যভিচার বলে,] "এক বাক্যে নিন্দিত", কাব্যে তাহারও স্থান হইতে পারে। 'এই সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্য হিসাবে ক্ষতি হয় না, নীতি হিসাবে হইবার কথা।' কাব্য কি নীতির বাহিরে? সমাজ কি কাব্যের ক্রীতদাস? সমাজের বন্ধন, শাসন শৃঙ্খলা কাব্যের তুলনায় কি নিতান্তই অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর? আর অবৈধ প্রেমের সমর্থনই কি কাব্যের চরম ও পরম লক্ষ্য? কিন্তু শান্তিঃ! আমরা

যদিও কাব্যের খাতিরে 'আস্ত' সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার পক্ষপাতী নহি, যদিও অতটা কাব্যরসে 'বঞ্চিত এ দাস গোবিন্দ', তথাপি আমরা এ কথা লইয়া তর্ক করিব না। সম্পাদক মহাশয় এই সংখ্যায় 'বিদায় কাল' নামক কবিতায় কামনা করিয়াছেন,—'* * ধৈর্য ধর, হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ।' বিদায়ের ক্ষণ সুন্দরতর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অতএব আমরা এই অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা পরিহার করিলাম।

'বিদায় কাল' ও 'বর্ষশেষ' দুইটি কবিতা, প্রথমটি সুন্দর কিন্তু 'বর্ষশেষ' অতি সুন্দর। এই সংখ্যা সম্পাদন করিয়া, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন। 'সম্পাদকের বিদায়-গ্রহণে' তিনি যথেষ্ট বিনয় সহকারে ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর মতে,—'আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত।'—যেখানে হালও বহিতেন, এবং দুধও দিতেন সেখান হইতে বাহিরে গিয়া তিনি যতটা বুঝিতে পারিতেছেন, যাহারা এখনও লিপ্ত আছে, তাহারা ততটা পারিবে, আশা করা যায় না। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি; তাঁহার এতটা কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা সকলে জানি, তিনি লিরিক কবি,—তাঁহার Lyrical effort এ তিনি 'ভারতী'র জন্য যাহা করিয়াছেন, এই বিদায়ের ক্ষণে, তাহাই একটি লিরিকের মত বোধ হইতেছে। বালক, সাধনা যে পথে গিয়াছে, 'ভারতী' যে সে পথের পথিক হয় নাই ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। (রবীন্দ্রবাবু উচ্চ প্রতিভার অধিকারী, তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন, মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার সাহিত্যশিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণ্য করি।)

১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০৬

ভারতী জ্যৈষ্ঠ

প্রথমে "অশেষ" ইতিশীর্ষক একটি মনোজ্ঞ কবিতা। কবি প্রারম্ভে বলিতেছেন,

"জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্য দিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,

পরপারে উত্তরিতে   পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান?"

এ আহ্বান 'মানসী'র।

প্রদীপ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়

এবারকার "প্রদীপের শেষ পৃষ্ঠায়" একটি প্রশ্ন মুদ্রিত হইয়াছে। প্রশ্নটি এক টুকরো কাগজে স্বতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রদীপের পৃষ্ঠায় সংলগ্ন। প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসা—"লক্ষ্মীণধরের বাড়ী কোথায়?" কিন্তু বন্ধুজনের অনুগ্রহে পরিশেষে জানিতে পারিলাম "প্রদীপের প্রশ্ন" একটা বুজরুকী। প্রশ্নের পশ্চাতে একটি অপরূপ কবিতা মুদ্রিত আছে, তাহার নাম "একটি কুক্কুরের প্রতি।" স্বাক্ষরের স্থলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নাম মুদ্রিত আছে। প্রথম দৃষ্টিতে "প্রশ্ন" ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত কবিতাটি সহজেই পড়া যায়,—

একটি কুক্কুরের প্রতি।

"চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ
কুকুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল?
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি ঊর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া
তবু ত রবির আলো ম্লান হোল নাহি,
নাহি হোল অন্ধকার জগতের হিয়া
হে কুক্কুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অত ঊর্ধ্বে পেঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পাতা ঢাকা ফুল, ঘোমটা দেওয়া মুখ প্রভৃতির প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি সহজে ও আগে আকৃষ্ট হয়, তাই প্রদীপ পাতলা কাগজে ছাপা প্রশ্নের আবরণ দিয়া কবিতাটির আকর্ষণীশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রদীপের ও কবিপুঙ্গব প্রভাতের এই অপূর্ব কীর্তি 'সাহিত্যে' উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটির 'রবি' ও 'ঘোষ' এই দুইটি শব্দে বেশ বুঝা যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচক কোনও

ঘোষ (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।) ইহার লক্ষ্য। এই ব্যক্তিগত গালাগালির বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়া আমরা 'সাহিত্য' কলঙ্কিত করিব না। সাহিত্যসমাজে 'গোসাহেবির' এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কুক্কুর চীৎকার করেন কিনা, তাহা আমাদের সাহিত্যিক 'চন্দ্র'গণই বলিতে পারেন এবং এই শ্রেণীর মোসাহেবগণ জীবতত্ত্বের কোন্ অধ্যায়ে নিবিষ্ট, তাহার মীমাংসার ভার শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ মোসাহেবি ও মেছুনির ভাষার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া শঙ্কা হয়, আবার কি কবির গান বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবে? ভগবান্ রবিবাবুকে এই 'ভক্তের' হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩০৬

প্রদীপ আশ্বিন - কার্তিক

প্রথমে "ভ্রষ্ট লগ্ন" নামক একটি সুরচিত ক্ষুদ্র কবিতা। কবি অতি সুকৌশলে কতিপয় ছত্রের মধ্যে কোন্ অজ্ঞাত উপকথা নন্দনের অধীশ্বরী লীলাময়ী তরুণীর তরুণ হৃদয়ের করুণ প্রেমকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে যতখানি পরিব্যক্ত, তদপেক্ষা অনেক অধিক অব্যক্ত কাহিনী কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়। কবির কলা-কৌশলে পাঠকের কল্পনা জাগিয়া উঠে, তখন সুপ্তোত্থিত কল্পনা কখনও আবেগে অধীর হইয়া সেই প্রেমময়ী লাজময়ী মায়াময়ী মানসী স্বপ্নরানীর আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চল হৃদয়ের তালে তালে নাচিতে থাকে, পরক্ষণে নায়িকার শরমে সঙ্কোচে মুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি নিমগ্ন—মৌন হইয়া যায়। যখন 'অরুণ ধূসর পথে রাজরথে তরুণ পথিক দেখা দিয়া' কাতরস্বরে ডাকিয়া যায়—'সে কোথায়, সে কোথায়?' তখন 'শরমে মরিয়া মানসী মূক হইয়া থাকে—বলিতে পারে না, নবীন পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি।' তারপর, যখন ফিরিয়া ফিরিয়া বার বার ডাকিয়া বাঞ্ছিত চলিয়া যায়, যখন চিরবিরহ কাতরা, 'শূন্যরাজপথপানে' চাহিয়া 'জানালার তলে ধূলায়' বসিয়া 'ত্রিযামা যামিনী' জাগিয়া একাকিনী গাহিতে থাকে,—'হতাশ পথিক, সে যে আমি।' ইহাই মানব-হৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী বিরহকাব্য,—জগতের নিষ্ঠুর সত্য। এই নিষ্ঠুর চিরসত্যের প্রতি তৃষিত মানবের কি প্রবল আকর্ষণ! কবি কাব্যকলার কুহকে যেন সেই চিরসত্যের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ঢাকিয়া দিয়াছেন; যেখানে করুণার অশ্রু মন্দাকিনী জগতের মরুক্ষেত্র সিক্ত সরস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি সেই পুণ্য বিরহ-তীর্থে সেই চির পুরাতন, চির নবীন চিরন্তন তৃষিতার মন্দির গড়িয়াছেন।

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

ভারতী কার্তিক

"পসারিণী" একটি সৌখীন কবিতা। ইহার ভাষার সৌন্দর্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির উদ্দেশ্য বা অভিধেয় কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৩০৬

ভারতী অগ্রহায়ণ

"উন্নতি লক্ষণ" একটি ব্যঙ্গ-কবিতা। ইহার শ্লেষ তীব্র হৃদয়স্পর্শী। সমাজ-শরীরের ক্ষতপূর্ণ অংশে লেখক যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা উগ্র বটে, কিন্তু আবশ্যক ও উপকারী।

"প্রকাশ" একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১০ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩০৬

প্রদীপ মাঘ

"পুস্তক সমালোচনা"য় 'পদ্মা' ও 'কণিকা', এই দুইখানি খণ্ডকাব্যের সমালোচনা আছে। অপরের কৃত গ্রন্থসমালোচনা সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই মৌনব্রত—কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া 'কণিকা'র সমালোচনা সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিতে হইতেছে। সিরাজ-উদ্দৌলার চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র 'কণিকা'র সমালোচনা উপলক্ষে সমালোচকদিগকে আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুরুচি ও শীলতার পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয়ববাবুর সেই সদাশয়তার পরিচয় দিবার বা তাঁহার 'উতোর' গাহিবার জন্য আমরা এই পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু লেখক বন্ধুরূপে 'কণিকা'র কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে যে মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার অপনয়নই আমাদের উদ্দেশ্য। অক্ষয়বাবু সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমালোচকগণের মুণ্ড-পাত করিবার জন্যই কবি 'কণিকা'র অনেকগুলি কবিতার রচনা করিয়াছেন। যদি সত্যই রবীন্দ্রবাবু সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া 'কণিকা'র মত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তহা হইলেও, সমালোচকগণের ক্ষোভের কারণ ঘটিত না। আমাদিগকেও কর্তব্যের অনুরোধে রবীন্দ্রবাবুর রচনা সম্বন্ধে ভালোমন্দ অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রতিকূল সমালোচনার বাক্যবাণে যদি অমর কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্নিগ্ধ সরস

শ্যামল করে, তবে সমালোচকগণের তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? উপকথার রাজকন্যা হাসিলে মাণিক পড়িত, কাঁদিলে মুক্তা ঝরিত। রবীন্দ্রবাবু উদার কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে অনেক 'মাণিক' দান করিয়াছেন; অসহিষ্ণুতা বা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া তিনি যদি 'কণিকা'র মত মুক্তা দিতেন, তাহাও আমরা পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম। কিন্তু সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক অক্ষয়বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, স্বয়ং রবীন্দ্র-বাবু অক্ষয়বাবুর কৃত 'কণিকা'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিয়া-ছেন, তাঁহার এরূপ কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিলো না। অক্ষয়বাবুর প্রচারিত 'কণিকা' রচনার গূঢ় উদ্দেশ্য বিনা প্রতিবাদে রবীন্দ্রবাবুর স্কন্ধে আরোপিত হইতে দিলে সাহিত্যে ধৃষ্টতা ও নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাই আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম। 'কণিকা'র জাতি-যূথী-মল্লিকাপুঞ্জ সঙ্কীর্ণতার নরকে ফুটিয়া হিংসা বিদ্বেষের পবনে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে, যে লেখক সমালোচকগণের প্রতি নিজের বিদ্বেষবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে সাধারণের নিকট ইহা প্রচার করিতে পারেন, তিনিও যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, ইহা বিস্ময়কর। এরূপ বিড়ম্বনা বাঙ্গালা দেশে সম্ভব।

১০ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র ১৩০৬

উৎসাহ আষাঢ় - মাঘ

"প্রার্থনাতীত দান" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুরচিত ক্ষুদ্র কবিতা।

১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩০৭

ভারতী আষাঢ়

"চিরকুমার সভা" চলিতেছে। "সব ভালো যার শেষ ভালো"—এখনও শেষ হয় নাই।

"নববরষা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কবিতা,—'

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে ক্লিন্ন কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি,
গরজে গগনে গগনে।"

অতি সুন্দর। কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতাদুষ্ট ও কেবল শব্দঝঙ্কারে মুখরিত। বিশেষতঃ হৃদয়-ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া হাস্য-রসের উদ্রেক হয়।

প্রদীপ আষাঢ়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "সদর ও অন্দর" গল্পটি মন্দ নয়।

১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩০৭

ভারতী শ্রাবণ

"উদ্ধার" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। রবীন্দ্র-বাবুর গৌরী 'অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতাই' বটে। তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার-কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্তই ক্ষুদ্র,—গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জর-পিঞ্জরে তিনটি প্রাণী,—তেজস্বিনী মিতভাষিণী গৌরী, সন্দেহবিষদগ্ধ ক্রুদ্ধ পরেশ ও সংযমভ্রষ্ট প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দ। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নহে। কবি কেবল 'রেখায়' গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাষমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোকসম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।

১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩০৭

প্রদীপ আশ্বিন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শুভদৃষ্টি" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি মন্দ নহে। পশু পক্ষীর প্রিয় সঙ্গিনী কালা ও বোবা মেয়েটি সহজেই করুণা ও সহানু-ভূতির উদ্রেক করে।

১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

ভারতী বৈশাখ

প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাগর সঙ্গমে" নামক কবিতা। বোধ করি কবিবরের নব-কল্পিত গীতিকাব্য 'নৈবেদ্যে'র দেবোদ্দিষ্ট উপকরণের অন্যতর,—আধ্যাত্মিক। নিতান্ত 'চিনির পুলি' নয়। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ভাবের মায়া কাটাইয়া নিপুণ শিল্পীর মত কবিতার প্রত্যেক চরণ অনবরত

'পালিশ' করিতেছেন। তাহার ফলে কবিতাগুলি 'চক্‌চকে' 'ঝক্‌ঝকে' হইতেছে বটে কিন্তু ভাব বেচারীর চক্ষে জল দেখিয়াও কি তাঁহার কবিহৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না?

'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রবাবুর একখানি নূতন উপন্যাস।

১২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০৮

ভারতী জ্যৈষ্ঠ

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পিপাসী" নামক একটি কবিতা। কৃত্রিমতার আতিশয্যে আহত হইয়া কবির "মানসী"র দ্বার হইতে ফিরিলাম—এত বাধাবৃতি অতিক্রম করিয়া কবিতায় গুপ্ত সুরক্ষিত স্বর্গীয় অমৃত পান করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্য আমরা, অসমর্থ। গরুড়ের সামর্থ নহিলে অমৃত-আহরণ সহজ নহে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চিরকুমার সভা" নামক গল্পটি ক্রমে নাটকে পরিণত হইয়া এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। গুটী পোকার মত গল্পটির প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছে। আবার শুনিতেছি, লেখক ইতিমধ্যেই কাঁচী ও কলম লইয়া 'চিরকুমার সভা'র শ্রী-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তবে, রচনাটি 'চিরকুমার সভা'র বর্তমান গুটী ভেদ করিয়া আগে প্রজাপতির রূপ পরিগ্রহ হউক তখন তাহার লাবণ্য উপভোগ করিব।

রবীন্দ্রবাবুর "নষ্টনীড়" ও "চোখের বালি" অনেকটা এক খাতে চলিতেছে। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড় সূক্ষ্ম। যাক্‌ সমাপ্তির পূর্বে বিসর্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও অধিকার নাই।

১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩০৮

ভারতী শ্রাবণ

নষ্টনীড় চলিতেছে,—একে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস, তাহাতে মাত্রা সূচিকা-ভরণের ন্যায়।

১৫শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩১১

ভারতী শ্রাবণ

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র "গান"। আমরা ভাব-

গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলক-ধাঁধার ব্যূহ ভেদ করিতে পারিবেন না।

"আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।"

বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে 'গ্রীক'।

"দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,"

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। "আনন্দের গভীর গন্ধ" বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত,—প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও 'নাসাগম্য' নহে। রবীন্দ্রবাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন,—এখনও যে তিনি যা তা ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবি-সুলভ কবিত্ব-কণ্ডূতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী, রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তা না বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩১২
বঙ্গদর্শন চৈত্র

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে বাঙ্গালা-ভাষাবিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিদেশী রাজার উপর একান্ত নির্ভর ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বনের সাহায্যে উন্নত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-বাবু ইতিপূর্বে সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যত্র বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রাদেশিক ভাষার অনেক ওকালতী করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রেজোলুউশন বজ্রে তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর বরপুত্র এখন ভাষার সার্বভৌমিকতার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। "সফলতার সদুপায়ে" রবীন্দ্রবাবু যেন 'থলে ঝাড়িয়া' অপূর্ব মুন্সীয়ানা, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, প্রগাঢ় রস ও তীব্র ধিক্কার ঢালিয়া দিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার পঠিত প্রবন্ধে এমনতর বৈদ্যুতী অনুভব করি নাই।

১৬শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩১২
বঙ্গদর্শন বৈশাখ

বঙ্গদর্শনের মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে সাড়ে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা সম্পাদক রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং অধিকার করিয়াছেন। বামন ঠাকুর তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্পাদক ঠাকুর "নৌকাডুবি" ও "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে" একখানি মাসিকের অর্ধেক ব্যাপ্ত করিয়াছেন।রবীন্দ্রবাবু "সম্ভাষণে" বলিতেছেন,—"বাংগালাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা. সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট নিবেদন এই যে এই আলোচনা ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণ-শক্তি ও মনন-শক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তাছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অংগ। বাঙ্গালাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতার ছাত্র সমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষদ সার্থকতা লাভ করিবেন।

* * বাঙ্গালা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাঙগালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণ যথার্থ বাঙগালার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।" * * ইত্যাদি রবীন্দ্রবাবুর এই সাধু প্রস্তাব "ইঁদুরের পরামর্শে" পরিণত না হইলেই আমরা সুখী হইব। এরূপ অনুষ্ঠানে, যিনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে সক্ষম, এমন একজন "নায়ক" আবশ্যক। দেশে ছাত্রের অভাব নাই, ছাত্র-মণ্ডলেও কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তির অসম্ভাব নাই। সেই তরুণ শক্তিকে কার্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য যে শক্তি ও নিপুণতা আবশ্যক, বঙ্গদেশে সচরাচর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যে নেতৃত্বে যে আদর্শে ছাত্র-সম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইবে,—নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হইবে, সে আদর্শ নির্জীব সভায় সম্ভবে না। সেজন্য মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চাই। পরিষদ সভা ডাকিতে পারেন, নেতা যোগাইতে পারিবেন কি? রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং অগ্রসর হইলে ভালো হয়।

১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩১২

বঙ্গদর্শন আষাঢ়

এই সংখ্যায় নৌকাডুবি সমাপ্ত হইল।..."শেষ খেয়া" কবিতাটির—

ঘরেই যারা যাবার তারা গিয়েছে চলে ঘরপানে,
পারেতে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নয় পারেও নয় যে জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।

ঠিক হেঁয়ালির মত মনে হয়।

১৬শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩১২

বঙ্গদর্শন শ্রাবণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেশীয় রাজ্য" নামক প্রবন্ধে ভারতীয় উৎকর্ষের আদর্শ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার প্রচারিত অনেক পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর ভাষার ব্যায়াম উপভোগের যোগ্য।

১৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩১২

বঙ্গদর্শন আশ্বিন

এবারকার বঙ্গদর্শনের প্রথমেই সম্পাদকের "সোনার বাংলা" নামক বঙ্গ-বিশ্রুত গানটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই গানটি মুদ্রিত ও লক্ষকণ্ঠে গীত হইয়াছে। এখনও বঙ্গের কুটীরে প্রাসাদে "সোনার বাংলা" প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ হিসাবে গানটি সার্থক। রবীন্দ্র-বাবু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অসংখ্য লিরিক ও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু "সোনার বাংলা"র মত আর কিছু এমন সার্থক হয় নাই, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়। একবার দেশের ঘোর দুর্দিনে ধীরাজ গাহিয়াছিলেন—

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লো ছারখার।"

আজ আবার বাঙ্গালীর মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই মাতৃভক্ত কবির বীণায় "সোনার বাংলা" ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। নীলকরের শ্যামচাঁদ আর গুর্খার গুঁতায় প্রভেদ আছে। 'শ্যামচাঁদ' ব্যক্তিগত অত্যাচারের নিদর্শন, প্রকৃতির কঠোর নিয়মে আজ শ্যামচাঁদ নাম শেষ,—নিরীহ প্রজার বুকের রক্তে যে নীলের চারা বাঙ্গালার ধানের ক্ষেতে গজাইয়া উঠিয়াছিল, জর্মনীর অতর্কিত বজ্রাঘাতে সে নীল গতাসু বলিলেও চলে। অমর কবি দীনবন্ধুর অবিনাশী নাটক "নীল-

দর্পণে" মানবের দানবতার ছবি রাখিয়া নীল ও নীলকর বাঙ্গালা হইতে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু হায়, বাঙ্গালীর সেই দুর্দিন আজ লক্ষগুণ প্রবল হইয়া বাঙ্গালা গ্রাসে সমুদ্যত। সেবার মুষ্টিমেয় ইংরেজের স্বার্থপরতায় বাঙ্গালার প্রজা প্রায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল;—কিন্তু এবার? বিশাল বৃটিশ-রাজের বিরাট বাণিজ্য,—সমগ্র রাজশক্তি ও লক্ষ লক্ষ বন্দুক ও বেয়নেট যাহার সহায়,—তাহার স্বার্থের প্রতিকূলে প্রজার স্বার্থ। তখন রাজাই বাঙ্গালার প্রজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ভাগ্যবিপর্যয়ে রাজশক্তি আমাদের প্রতিকূল। এখন স্বাবলম্বন আমাদের একমাত্র সহায়। তখনকার বাঙ্গালীর 'জান' ছিল,—আর এখন? হায় তোরাপ! হায় নবীনমাধব! তবে এখন নিরুপায় বাঙ্গালী। গাও বন্দে মাতরম! গাও "সোনার বাংলা"! মৃন্ময়ী জননীর শতরূপ ধ্যান কর,—বিচার বিতর্ক এখন থাক।

"অবস্থা ও ব্যবস্থা" সম্পাদকের রচিত একটি সুদীর্ঘ ব্যবস্থা। রবীন্দ্রবাবু এই সকল কথাই পুনঃ-পুনঃ বলিতেছেন। অবস্থাও বেশ বুঝিয়াছি, ব্যবস্থাও দেখিতেছি, কিন্তু অবস্থা ও ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য দেশের পোড়া কপালে ঘটিয়া উঠে কই? দুঃখের বিষয় আমাদের "সোনার বাংলা"য় উপদেষ্টার যেমন প্রাচুর্য, উপদেশ শুনিবার লোকের তেমনই অভাব। তাই উপদেশ শুনিতে শুনিতে বারংবার "সদ্ভাবশতকে"র সেই দুটি চরণ মনে পড়ে,—

"উপদেষ্টা কোথা বল আছে হে এমন,
আপনার উপদেশ যে করে গ্রহণ?"

১৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩১৩
বঙ্গদর্শন আষাঢ়

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিক্ষা-সমস্যা" মূল সমস্যার মত জটিল, অতি বিস্তৃত, সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। সাধারণের সহজে দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই বটে, কিন্তু 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সোনার পাথরবাটীর মিস্ত্রীরা সাবধানে অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন।

১৭শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩১৩
ভাণ্ডার শ্রাবণ-ভাদ্র

সর্বপ্রথমে সম্পাদক শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সব পেয়েছির দেশ" কবির দিবাস্বপ্ন। সত্যই আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩১৪

বঙ্গদর্শন চৈত্র

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাহিত্য পরিষদ" নামক প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্ন উপার্জন, জ্ঞানশিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার হাজার লোক মাটীর নীচেকার শিকড়ের মত প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য। * * * ম্যাট্‌সীনি, গারিবল্ডী, হ্যাম্পডেন, ক্রোমোয়েল হইয়া ওঠাই যে একমাত্র বড় কাজ, তাহা নহে, তাহার পূর্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমহাশয়, পাড়ার মুরুব্বী, চাষাভূষার সর্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে. তারপরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কি হিসাবে বড় কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না—এ সমস্ত গোড়াকার কাজ ইহার ছোট বড় নাই। দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্নতন্ন করিয়া জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই জানিবার চর্চাই ভালবাসার চর্চা। দেশের ছোট বড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া ওঠে। নহিলে দেশহিত সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড় বড় কথা বার্ক-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়। তাই দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সংগে সচেষ্টভাবে যোগ দেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক্ দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা. আর এক সিদ্ধির সফলতা।"

১৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

জাহ্নবী বৈশাখ

সর্বশেষে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশ' নামক একটি কবিতা।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'—

'আমার ভারতভূমি!
ডালা ভরি' লয়ে ষড় ঋতুদল
অঞ্চলে তব ঢালে ফুলফল,
নীরবে আশীষ করে হিমাচল
তব মস্তক চুমি।
তব কোলে বাস মম।
ধন্য সে কোল ঋষির পরশে
দেবতা-পূজার পুষ্প বরষে,
গঙ্গাধারার পুলক হরষে,
সে কোল পুণ্যতম।
সিন্ধু তোমার পায়ের ধূলায়
নিত্য তাহার ললাট বুলায়
চরণে মলয় চামর দুলায়,—
আমার জননী তুমি
হে মোর ভারতভূমি!
দেব মানবের আনন্দধাম
যে কোলে জনম লভিয়াছে রাম,
যে কোলে ভীষ্ম লভিলা বিরাম
সেই কোলে নমোনমঃ,
সেই কোলে বাস মম।

কিন্তু 'হিমাচল ভারত-ভূমির মস্তক চুমিয়া আশিষ করিতেছে'—কল্পনাটি সুন্দর হইলেও একটু উদ্ভট-অসম্ভব। হিমালয় যেদিন ভারতভূমির মস্তক চুম্বন করিবে. সে শুভ মহাপ্রলয়ের দিন কবে আসিবে? তখন ভারতে 'স্বদেশী' থাকিবে না, গোয়েন্দাও থাকিবে না; 'জাহ্নবী' থাকিবে না, সাহিত্যও থাকিবে না; ক্রীতদাসের অধীনতা থাকিবে না, বিদেশীর যথেচ্ছাচার মায়ার শাসনও থাকিবে না। হায় দেবতা, ভারতভূমির সে শুভদিন কবে আসিবে, যেদিন চুম্বনলোলুপ হিমালয়-রূপ হামান-দিস্তায় ভারতভূমির সব গুঁড়া হইয়া যাইবে!—আমরা নির্বাণমুক্তি লাভ করিব! কিন্তু 'সিন্ধু তোমার পায়ের ধূলায়, নিত্য তাহার ললাট বুলায়, চরণে মলয়, চামর দুলায়,' অতি সুন্দর, মহাকবির উপযুক্ত।

বঙ্গদর্শন বৈশাখ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' বড় জটিল। লেখক

'সৌন্দর্যবোধ' ও 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধের ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্তমান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধেও তাঁহার বক্তব্য বিশদ হয় নাই।

১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩১৫

প্রবাসী চৈত্র

শ্রীযুত দেবকুমার রায়চৌধুরীর রচিত 'দেবদূত' নামক নাটক ও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'গোরা' নামক একখানি উপন্যাস 'প্রবাসীতে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ক্রমশঃ প্রকাশে নাটক একেবারে খুন হইয়া থাকে; উপন্যাসও জখম হইয়া যায়। অথচ কৌতূহলী পাঠকের জন্য লেখকগণকে আত্মবলি দিতে হয়।—'গোরা' তর্কের খনি,—গল্প খুব অল্প।

১৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

প্রবাসী বৈশাখ

প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' নামক-বিতর্কবাদ, বা উপন্যাস। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—'ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।' এবং এই ধর্মতন্ত্র ও অন্য বিবিধ তন্ত্রের উপদ্রবে 'গোরা' উপন্যাসের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। 'উদ্দেশ্যমূলক' উপন্যাস বর্তমান যুগের 'ফ্যাশন' বটে, কিন্তু 'গোরা'র উদ্দেশ্য এক নয়, বহু,—এবং কিছু গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে জগতের বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব হইয়াছে, পাঠকের মন নিতান্ত নাচারভাবে সেই লূতাতন্তুজালে জড়াইয়া যাইতেছে।

'ভেরা সেজোনোভা' অষ্টাদশবর্ষীয়া রুশ বালিকা,—বিপ্লব-বাদিনী। ভেরার জীবন বিচিত্র বটে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভেরা'র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের পক্ষে উপযোগী।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের শেষে স্বদেশী, বয়কট ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ পরামর্শ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পথ ও পাথেয় প্রভৃতি ইদানীন্তন প্রবন্ধসমূহেও সেই পরামর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রবাবু স্বদেশীর উদ্বোধন কালে যে শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন এখন সেই শাখাই ছেদন করিতেছেন! রবীন্দ্র-

বাবু লিখিয়াছেন,—'আশু প্রয়োজন সাধনের প্রলোভনে ধর্মভ্রষ্ট হওয়াই দুর্বলের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বিপদ। 'বয়কট' উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি।' রবীন্দ্রনাথের 'আমরা' ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছেন কি না,—রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'ই তাহা বলিতে পারে,—কিন্তু 'স্বদেশী' ও 'বয়কটের' নেতা ও ভক্তগণ 'ধর্মভ্রষ্ট' হইয়াছিলেন, বা হইয়াছেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ অকারণে দেশের নেতা ও দেশবাসীর 'মানহানি' করিয়া লঘু প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার পরে লিখিয়াছেন,—'বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় যাহাদের উপজীবিকা, এবং বিদেশী সামগ্রী ক্রয়ে যাহাদের প্রয়োজন বা অভিরুচি, তাহাদের প্রতি অন্যায় জবরদস্তি করা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।' 'ইহাতে' রবীন্দ্রনাথের 'সন্দেহমাত্র' না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের সন্দেহ আছে, আপত্তি আছে। 'বয়কট' উপলক্ষে কোথাও কখনও অন্যায় জবরদস্তি হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 'নিয়মের ব্যক্তিক্রম'। 'এদেশে জবরদস্তি' 'বয়কটে'র সহায় বা সাধন নহে। প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার উপর তাহা নির্ভর করে। রবীন্দ্রবাবু 'বয়কটে' জবরদস্তির আরোপ করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি—নূতন সত্য দেশবাসী গ্রহণ করিবে না। কবি-কল্পনা অতিরঞ্জনের সোহাগিনী প্রণয়িনী, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু সে যখন কাব্যকুঞ্জ হইতে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হইয়া বাস্তব জগতে অতিরঞ্জনের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে অগত্যা 'তথ্যে'র ও 'সত্যে'র অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় ও রচনায় 'বয়কট' প্রচার করিয়াছিলেন। যদি কোথাও 'বয়কট' উপলক্ষে 'জবরদস্তি' হইয়া থাকে, সেজন্য তিনিও সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সমান দায়ী। যাহা হউক,—আমরা তাঁহার উপদেশ 'নীর'টুকু পরিত্যাগ করিয়া 'ভেরা'র আত্মোৎসর্গের 'ক্ষীর'টুকু গ্রহণ করিলাম। পাঠক-হংসের পক্ষেও তাহাই একমাত্র কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের জন্য আমরা একটু শঙ্কিত হইয়াছি; এই সকল 'পরামর্শে'র অনুবাদ পড়িয়া গবর্মেণ্ট যদি সহসা তাঁহাকে 'রায়সাহেব' করিয়া দেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্ত 'ভক্ত ও কবি' প্রবন্ধে 'নির্জলা'-'রবি'-ভক্তি-সিক্ত বন্দনা রচনা করিয়াছেন। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর',—এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সত্যটি অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। লেখকের ভক্ত-হৃদয়ের বিশ্বাসে প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে, সেই জন্যই বোধ করি তিনি তর্কের ও যুক্তির সন্নিহিত হন নাই। নমুনা-স্বরূপ ভক্তির একটি উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিতেছি:—'রবীন্দ্রনাথ * * * নব প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকখানি কাব্যের ভূমিকা-স্বরূপ যে এক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা

অতুলনীয়। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার কোন্ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন? বলিয়াছেন ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বলীলার কাহিনীই তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্রবাবুর যে সকল হাস্য-কৌতুকের কবিতা আছে তিনি তাহাকেও ঈশ্বরের কৌতুককাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার 'কৌতুক' কাব্যের ভূমিকায় ঈশ্বরকে বলিতেছেন,—

'আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে
মাণিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয় পুলিনে!
আজ এই বেশে এসেছ আমারে

যে কবি আপনার সুখ দুঃখ শোক তাপ হাস্যামোদ সকল অবস্থা ও সকল ভাবের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন, এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে তাঁহার নানা ভাবের বর্ণনা করেন; তিনি যদি ভক্ত না হন ত ভক্ত কে'? বাস্তবিক এ প্রশ্নের উত্তর নাই! আমরা বলি, তিনি যদি ভক্ত না হন, ক্ষতি কি? কেন না, তাঁহার সমালোচক যে বিষম 'ভক্ত', সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান রবীন্দ্রনাথকে এই নিদারুণ 'ভক্তে'র সমালোচনা হইতে রক্ষা করুন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, এমন করিয়া কি তাঁহার লাঞ্ছনা করিতে আছে? 'কৌতুক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঈশ্বরে'র কৌতুকময়ী কল্পনা করিয়াছেন, অমৃতবাবু কোন ঈশ্বরের প্রেরণায় এই অমূল্য সত্যের আবিষ্কার করিলেন? সে ঈশ্বর কি রাসভ-লোকের অধীশ্বর? ইতিপূর্বে আর কোনও ঈশ্বর, কোনও খোদা, আল্লা, জিহোবা, 'গড', সাঁওতালদের চান্দোবোঙ্গা', কুকিদের 'পুথেন', এমন কি 'সুমৈশী'ও [পুথেন-পুত্র থিলার উপপত্নীজ পুত্র 'সুমৈশী' অশুভসমূহের দেবতা। —ইতি 'কুকি ও মিকি'র প্রবন্ধ;—'প্রবাসী'।] কৌতুকবেশে, মাণিক্যের হার পরি এলোকেশে, নয়নের কোণে আধ-হাসি হেসে, কোনও ভক্ত কবির এমন কি, কবীর, নানক, তুকারাম প্রভৃতির 'হৃদয় পুলিনে' অবতীর্ণ হন নাই! অমৃতবাবু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপমান করিয়াছেন, 'সমালোচনা'র অপমান করিয়াছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের অপমান করিয়াছেন; বাঙ্গালী পাঠকের অপমান করিয়াছেন; নিজের বুদ্ধির অপমান করিয়াছেন,—অবশ্য ভক্তির ভাঁড়ে জীর্ণ হইবার পর যদি সেই দুর্লভ সামগ্রীর কিছু অবশিষ্ট থাকে! 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাম,—ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।'। এখন দেখিতেছি, বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী,—ঈশ্বরের এলোচুল, কানে দুল, গলায় মাণিকের হার, নয়নের কোণে আধ-হাসির ক্ষুরধার;—পরিধানে কি ফরাসডাঙ্গার ভক্ত-ধাক্কা

পাছা-পেড়ে? পায়ে কি?—ঘুমুর, না মল? আমরা অমৃতবাবুকে 'ঈশ্বরে'র আর একখানি ছবি উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। অমৃত-বাবু বোধ হয় জানেন না, রসের সাগর দীনবন্ধুও কৌতুক-কবিতায় 'ঈশ্বরে'র ছবি আঁকিয়াছিলেন। যথা,—

'এলো-চুলে বেণে-বউ আলতা দিয়ে পায়,
নোলক নাকে, কলসী কাঁখে জল আনতে যায়!'

এই বেণে-বউ যে 'ঈশ্বর', সে বিষয়ে এক কুঁচও সন্দেহ হইতে পারে না; কেন না, তাহার চুল এলো। পায়ে আলতা, বোধ হয় বলির ভক্ত-ভেড়ার রক্ত মাড়াইয়া আসিয়াছেন! নাকে নোলক, অর্থাৎ 'প্রণব'! আর 'কাঁকে কলসী'—আহা কি মধুর? ইহা যে না বুঝিতে পারে, তাহার কণ্ঠি ছিঁড়ি! এখন অমৃতবাবু কি বলেন,—দীনবন্ধু মিত্র 'ভক্ত'-কবি কি না? প্রবাসী এই 'রাবিশ' মুদ্রিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। গোড়ায় 'গোরা', শেষে 'ভক্ত ও কবি'—বোধ করি 'পাষাণ ভাঙিগয়াছেন।' 'হরে দরে হাঁটু জল' হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না।

২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩১৬

দেবালয় ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা

প্রথম সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষ-মঙ্গল' নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। ইহা আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু রবি করে সমুজ্জ্বল নহে। 'যে মহা একের পানে বিশ্ব-পদ্ম উঠিছে বিকশি' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বোধ হয় বহুবার পড়িয়াছি। চর্বিতচর্বণে দন্ত বেদনা ভিন্ন অন্য কোনও লাভ নাই।

ভারতী বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিষ্ঠা' নামক প্রহেলিকার সমস্যা পূরণ সহজ বুদ্ধির সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মড়া-দাহের প্রাচুর্য দেখিয়া কষ্ট হয়, এই সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা তাহার পরেই চলিত ভাষায়—অপশব্দের বৃষ্টি! বাঙ্গালা ভাষা যে বেওয়ারিশ ময়দা, এবং কবিরা যে নিরঙ্কুশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নেই।

২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

ভারতী জ্যৈষ্ঠ

'পাওয়া ও হওয়া' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে, ভাবকে

বক্তব্যকে নির্দয়ভাবে পাক দিয়া, জড়াইয়া, মোচড়াইয়া যে জটিল প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। বিবাহ-সভায় যদি প্রশ্ন করা যায়, —'সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত' কি? তাহা হইলে বোধ হয় জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননকেও মৌনব্রত ধারণ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কতখানি ন্যায়ের ফাঁকি, কতখানি সত্য, কতখানি কবিত্ব, কতখানি কথার প্যাঁচ, কতখানি ঢেঁকির কচ্‌কচি মিশাইয়া রবীন্দ্রবাবু এই 'পাওয়া ও হওয়া'র জগাখিঁচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, —'একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়।' সে কথা সত্য। 'একটু চিন্তা' ব্রহ্ম হইলে আমরা তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে 'একটু চিন্তা' ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ না হইয়া বিষম প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে: অগত্যা আমাদের মত দুর্ভাগ্য পাঠকের 'বিপত্তৌ' মধুসূদনকে স্মরণ করিতে হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার উপদেশগুলি মানববুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে! যতদিন রবীন্দ্র-সূত্রের ভাষ্য প্রকাশিত না হয়, ততদিন পাঠকের পক্ষে 'গোলকধাঁধায় 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' অনিবার্য।

২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩১৬

প্রবাসী আষাঢ়

প্রথমে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা'। তাহার পর শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি রচিয়াছেন। মিশ্র খ্যামটায় রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

'আরো আরো প্রভু, যেমন খুসী আমায় মারো।' গানটি এমন উদ্ভট ও অক্ষমতার পরিচায়ক যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

২০শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩১৬

প্রবাসী শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের 'অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন।
তাঁহার একটি গানের প্রথম কলি এই,—

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে!'

শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া গোপন হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা 'গোপন বটে'। কিন্তু এ 'গোপন' চরণ কাহার? পরে আছে 'নীলাজ নীল আকাশ।' 'নীলাজ নীল' কি, বুঝিতে পারিলাম না।

২০শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩১৬
সুপ্রভাত ভাদ্র

'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথে'র প্রথমাংশ এখনও দেখি নাই। দ্বিতীয় অংশে দেখিতেছি,—রবীন্দ্রনাথ হুগোর 'নতার দেম' পড়েছেন, আর কিছু পড়েন নি। তিনি টলস্টয়ের 'অ্যানা কেরেনিনা' পড়েছেন। রবীন্দ্রবাবু বলেন,—টলস্টয় আমার কেমন repulsive অত্যন্ত বিরক্তিজনক বলে মনে হয়। বোধ হয় এর কারণ এই যে, আমার ও টলস্টয়ের উপন্যাস-রচনা-প্রণালীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে।' অত্যন্ত আশ্চর্য ও মৌলিক মন্তব্য বটে! রবীন্দ্রবাবু টলস্টয়ের 'আনা' ভিন্ন আর কোনও রচনা পড়িয়াছেন কি না, তাঁহার বসোয়েল জিতেন্দ্রলাল তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—'টলস্টয়ের বেশী কিছু পড়ি নাই।' তাহাই সম্ভব। বেশী পড়িলে ররীন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার সহিত টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই! টলস্টয় যে বিরাট, বিশাল মানবতার একনিষ্ঠ পুরোহিত, বাঙ্গালার অন্ধকূপে জিতেন্দ্রলাল তাহার সাদৃশ্য দেখিয়াছেন! ইহাকেই বলে, দৃষ্টি বিভ্রম! অন্ধের হস্তিদর্শনও বোধ করি এইরূপ। যাক্ রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে 'রাজার নন্দিনী প্যারী' তিনি 'যা বলেন, তা শোভা পায়।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রবাবু নিজেই তাঁহার উপন্যাসের রচনাপ্রণালীর পরিচয় দিলেন, তাঁহার 'রাজা ও রাণী'র রাণীর মত সাধারণকে আর বলিবার অবকাশ দিলেন না।—এই বার রবীন্দ্রবাবুর মোসাহেব-মহলে ইউরোপীয় সাহিত্যকে তুচ্ছ করিবার ঢেউ উঠিবে। সে মুরুব্বিয়ানার বেগ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য সংবরণ করিতে পারিবে কি?

২১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
প্রবাসী বৈশাখ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিরহ কাব্য' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কালিদাসের মেঘদূতের 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' করিয়াছেন। অথচ উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'ইহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাম দিতে চাই না।' বেশ। কিন্তু গোলাপকে যে নামেই ডাকুন, সে গোলাপই থাকিবে। তবে আপনি ইতিপূর্বে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বহু আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন ; আপনার এ আবদারটি আমরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু এখন কিছুদিন বিশ্রাম করিলে হয় না? গেরোবাজ পায়রার মত "আমাদের মন কেন ডানা মেলিয়া অপরিচিতের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে চায়,"—তাহা যখন কবি—আপনিই ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিতেছেন না, তখন আমরা—অকবি—তাহার কি উত্তর দিব? কিন্তু অনেকের মত এই যে, অতিশ্রান্ত মন, বোধ হয়, ডানা মেলিয়া বিশ্রামের আশায় দূরে—নির্জনে—অপরিচিত খোপে ধাবিত হইয়া থাকে।

২১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
আষাঢ় ১৩১৭
বঙ্গদর্শন বৈশাখ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিশীথে' নামক কবিতায় যে বিনিদ্র রজনীর বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা অত্যন্ত ভয়ংকর!—তখন বিশ্ব নিদ্রামগ্ন; অকস্মাৎ কে কবির বীণায় ঝঙ্কার দিল, এবং 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে!' নয়নে ঘুম = অর্থাৎ নয়নের ঘুম? 'ঘুম পরে থাকিলে নয়নের 'র' লুপ্ত হয়।—ইতি ইস্পাতরামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ।—তার পর কবি 'শয়ন ছেড়ে' উঠিয়া বসিলেন। 'আঁখি মেলি চেয়ে থাকি' তার দেখা পাইলেন না!—কবি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। এ রোগে আঁখি মেলিয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ঘুমের দেখা পাওয়া যায় না। ইহা Insomnia অর্থাৎ অনিদ্রারোগের কথা। আমরা পড়িয়াছি আর কাঁদিয়াছি। সাধারণ মানবের অনিদ্রারোগে অবসাদ ও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কোন লাভ নাই। কিন্তু কবির Insomnia বন্ধ্যা হইতে পারে না। তাই তাঁর 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পুরে,'—অথচ 'কোন বিপুল বাণী ব্যাকুল সুরে বাজিতে' লাগিল, তাহা কবি বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্যাপারটি গুরুতর 'কবিতা' হইয়া উঠিল! অনিদ্রার যন্ত্রণার উপর অনির্বচনীয় বেদনা। অগত্যা কবি বলিলেন, কোন বেদনায় বুঝিনারে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে!' আমরা অনিদ্রার বেদনা বুঝি,

কিন্তু 'হৃদয়ভরা অশ্রুভারের অন্বয় বা অর্থ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'অশ্রুভারে হৃদয় ভরে না।' 'হৃদয়ভরা অশ্রুভার' কি, তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। অথচ অশ্রু, হৃদয় ও ভরা, এই তিনের সংযোগে দিব্য করুণ-রস উথলিয়া উঠিল। যথা,—'অলাবু-বেণু-তন্ত্রাণাং সংযোগে মধুরধ্বনিঃ।' তখন কবি বেহাগ একতালায় গাহিয়া উঠিলেন,—'পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আমার কণ্ঠহার।' ভাবটা একটু পুরাতন বটে। ভাব কবিদের সেবকও বটে, অন্নও বটে। অতএব রবীন্দ্রের 'নিশীথে' বেহাগ একতালায় গীত হইতে থাকুক।

২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩১৭

ভারতী আষাঢ়

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 'ভারতী'র মন্দিরে 'দুর্লভ' নিবেদন করিয়াছেন। কবি যখন আধ্যাত্মিক হন, তখন ভাষায় কিরূপে প্যাঁচ লাগে, 'দুর্লভে' তাহার নমুনা আছে। রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—'অনন্তের মধ্যে' মাথা তুলবেন, না, সঞ্চরণ করবেন? যদি অনন্তের মধ্যে মাথা তোলেন, তাহা হইলে কোথায় সঞ্চরণ করবেন? রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। ঈথরে? রবীন্দ্রনাথ তপস্যা, গায়ত্রী প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তত্ত্ব ও কবিত্বের বর্ণসঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শেষে—ব্রহ্মলাভ করিল।

প্রবাসী আষাঢ়

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুহাহিত' আধ্যাত্মিক প্রহেলিকা। সূচনায় দেখিতেছি,—'উপনিষৎ' তাঁকে বলেছেন,—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি "গুপ্ত", তিনি "গভীর"। প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথ 'তাঁহাকে' আরও 'গুপ্ত'—আরও 'গভীর' করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য দুঃখিত হইবার কারণ নাই। ঋষিরাই ত বলিয়া গিয়াছেন,—'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' যে সকল তত্ত্ব গুহার অন্ধকারেই চিরকাল বিরাজ করিতেছে, তাহারা অনায়াসে ভাষার অন্ধকারেও বস-বাস করিতে পারিবে।

২১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩১৭

প্রবাসী শ্রাবণ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমান' নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই

অপমান করিয়াছেন। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃ-অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দের ঝঙ্কারে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্ত্রধ্বনি মনে পড়ে। কিন্তু 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা—

'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে',

সু-কল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'—নীড়ে অর্থাৎ পাখীর বাসায় জননী জাগিতেছে, এই খঞ্জ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।

২১শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩১৭
প্রবাসী ভাদ্র

প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা—ত্র্যহস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্মোপদেশ আছে, কবিত্ব নাই। শিক্ষা-নবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন, তাহা কে বলিবে? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নির্বাণ' লাভ করিল!

'রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক্ বস্ত্র লাগুক ধূলা বালি,

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক্ ঝরে।

রবীন্দ্রনাথও ইহা মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই,—'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্'! কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্মে সিক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। এতদিন ঘাম হইতে ঘামাচির সৃষ্টি হইতেছিল কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর 'কর্মযোগের ঘর্ম' কবিতায় পরিণত হইতেছে। রবীন্দ্র-বাবু যদি গদ্যে 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবি-কীর্তিকে এত ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয় না।

২১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩১৭

প্রবাসী কার্তিক

প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃশ্রাদ্ধ' নামক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন।' এক প্রবন্ধেই দার্শনিকতার ও মাতৃভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। 'মাতৃশ্রাদ্ধে' হেঁয়ালীছন্দে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মা অনন্ত পিতামাতার অবতার, অতএব 'মা তুমি আছ।' বক্তব্যবিষয়কে এত জটিল করিয়া তোলা যায়, তাহা আমরা জানিতাম না।

সুপ্রভাত কার্তিক

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাগরণ' নামক গানে বারো চরণে বারো বার 'জাগো' আছে। তাহার বদলে নাচো, কোঁদো, হাসো, কাঁদো, গাও, খাও প্রভৃতি বসাইয়া দিলেও অর্থের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য 'জাগো' যে শ্রেণীর অর্থ ব্যক্ত করিতেছে, সেই শ্রেণীর অর্থ!

দেবালয় কার্তিক

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামক স্তবে দেবালয়ের চাতাল হইতে চূড়া পর্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। 'চারু' প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন,—'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।' বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার রায় উদক্ষার যান যবক্ষার যানের সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশ হাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সমালোচনায় এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। 'সমসাময়িক সমগ্র জগৎ' যতই উদ্ভট হউক, সেই জগতের সমগ্র সাহিত্যের এমনতর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিবার শক্তি এ মরজগতে সকলের নাই। আমরা ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিতেই পারি না! অতএব, বাঙ্গালীর এই গৌরবটুকু অম্লানবদনে পরিপাক করিবার চেষ্টা করিব। আর 'বিশ্বসাহিত্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ' মনীষী শীল ও ডাক্তার রায় চারু সমালোচককেও সমসাময়িক সমগ্র জগতের 'একমাত্র সমালোচক' বলিয়া স্বীকার করিবেন, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই!—রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলেই 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা

আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে পীড়ন করিয়া আধ্যাত্মিক রস নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। 'পসারিণী' কবিতার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই শ্রেণীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিশ্লেষণী শক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। চারু সমালোচক লিখিয়াছেন,—'বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল। অন্তরের প্রশান্ত একই, বাহিরের বিচিত্র-রূপিণী' বিস্ময়কর নহে কি? এ দার্শনিকতা যে বরাবরের অপেক্ষাও অধিকতর স্থিতিস্থাপক তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? তর্কের অনুরোধে চারুর এই দার্শনিক mandateও না হয় শিরোধার্য করিলাম। তাহার পর, চারু সমালোচক লিখিয়াছেন,—'ইনি "পসারিণী" বেশে আমাদের নিকট গতায়তি (গতায়ত নহে! উহা ত মুটে মজুরে সকলেই লেখে!) করেন। পসারিণী "কোথা কোন বহুদূরে বিদেশের রাজপুরে" রতনের হাটে বিকিকিনি করিতে চলিয়াছে। আজ এই নিস্তব্ধ নির্জন দ্বিপ্রহরে—

"সম্মুখে দেখ ত চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
তপ্তবায়ু অগ্নিবাণ হানে।"

এখন আমি নিশ্চিন্ত নীরবে একাকী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি--

"হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল;
কূলে কূলে ভরা দীঘি, কাকচক্ষু জল।
থাক তব বিকিকিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

'তুমি রতনের হাটে যে পসরা লইয়া চলিয়াছ, তাহা আমার কাছে নামাইয়া আমায় একবার দেখাইয়া যাও। ওগো প্রত্যক্ষ, ওগো Immediate, তুমি পরোক্ষের Infinityর তত্ত্ব আমাকে বলিয়া যাও।' পাঠক। মূল ও ব্যাখ্যা দেখিয়া বলুন,--এই কবিতার এই ব্যাখ্যা কি উৎকট দার্শনিকতার ও উদ্ভট আধ্যাত্মিকতার উন্মত্ত-প্রলাপ নহে? 'নির্জন দুপ্রহরে' কবি যদি শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল দেখাইয়া কোন পসারিণীকে আহ্বান করেন, তাহা কি মনে হয় যে সসীম অসীমকে আহ্বান করিতেছে? এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়া কেহ যদি বলে,—তলস্পর্শ Infinite অর্থাৎ অতলস্পর্শকে আহ্বান করিতেছে, তাহা হইলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকে কি? সে ব্যাখ্যাও এত অসমঞ্জস, এত উদ্ভট হয় কি? 'পসারিণী অন্তরের এক' কেন না চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সে তাই। অতএব, নির্জন দুপুরে শাখা-ঢাকা বটতলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া গেল। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের পসারিণীর হাতে ঝাঁটা ছিল না,

তাই রক্ষা! নতুবা কি হইত, বলা যায় না! হে ভগবান্! রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব;—তুমি তাঁহাকে এই চারু-সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জলা খোসামুদী ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

২১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩১৭

প্রবাসী মাঘ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাগরণ' উৎকৃষ্ট রবিকূট। অন্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় এই রচনায় 'অন্ধের হস্তিদর্শনে'র আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইবেন।

২১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র ১৩১৭

বঙ্গদর্শন মাঘ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেদনা'য় দেখিতেছি,—

'যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু—নাহি ফোটে ফুল;'

কর্তাভজাদের 'আলোক-লতা'র গান ইহা অপেক্ষা সহজ। লতার হেঁয়ালি আমরা ভাঙ্গিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গান—'প্রকাশ' সহজ ও সুন্দর।

প্রবাসী ফাল্গুন

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথের 'আত্মবোধ' তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সুপথ্য হইতে পারে, আমরা নমস্কার করিলাম।

ভারতী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্মযোগ' বুঝিবার সৌভাগ্য ও সামর্থ আমাদের নাই। রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে কোন্ পাতালে লইয়া যাইতে চান, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না। 'যেখানেই জলাজঙ্গল-গর্তগাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলচে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে।' 'গর্ত-গাড়ী' কি? 'গাড়ী' শুনিয়াছি। 'গাড়ী' চড়িয়াছি। 'গর্তগাড়ী'র সহিত এই প্রথম পরিচয় হইল। ভাষার এই জগাখিচুড়ীর পরিণাম কি, তাহা যদি প্রতিভাশালী লেখকেরা একবার ভাবিয়া দেখিতেন!

২২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩১৮
বংগদর্শন বৈশাখ

শ্রীযুত সুরেশবর শর্মার "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় নূতন কথা এই যে, —রবীন্দ্রনাথ পূর্বে স্বর্ণবীণা লইয়া 'সুরবৃন্দে নয়নের নীরে' ভাসাইতেন। সুরেশবরও বোধ করি এই 'বৃন্দে'র অন্তর্গত ছিলেন, তাই জানিতে পারিয়াছেন: যাক, তারপর রবীন্দ্রনাথ একটু থামিয়া, আবার বীণা ধরিলেন, এবং তাহাতে 'ধরার ক্রন্দনধ্বনি' বাজিয়া উঠিল। কল্পনা কমনীয় বটে, কিন্তু সুরের এই এক ধারা অপগত ও অন্য ধারা উদ্গত হইবার সন-তারিখ বলিয়া দিলে আমরা মিলাইয়া দেখিতাম,—রবীন্দ্রবাবুর ইদানীন্তন যে কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা কাঁদিয়াছি, সেগুলি এই পর্যায়ের কি না।

প্রবাসী আষাঢ়

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মলোক হইতে "বাঙ্গালা ব্যাকরণের তির্যকরূপে" অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধটি অনুশীলন-যোগ্য। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রনাথ" পরম-কৌতুকে উপভোগ করিয়াছি। এই রবীন্দ্র-চরিতে সম্ভবতঃ inspired লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, কোন্ কাব্য লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কোথায় বাস করিতেন, কি দেখিতেন, এবং কি ভাবিতেন, তাহারও ফর্দ পাইয়াছেন। সুতরাং Authentic। ভক্তির দুধ মারিয়া যে 'খোয়া' বা 'ড্যালা' ক্ষীর হয়, তাহাকে আরও জমাট করিয়া, সেই উপাদানে ভক্ত অজিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা গড়িয়াছেন, এবং তাহার উপর এত ফুল বিল্বপত্র চাপাইয়াছেন যে, মর-জগৎ-চারী রবীন্দ্রনাথকে আদৌ দেখিবার যো নাই, তবে ধূপের গন্ধে, ঘণ্টার বাদ্যে একটা পূজার আভাষ পাওয়া যায়। অতিভক্তি ও অত্যুক্তি বোধ করি শ্যাম-দেশোদ্ভবা যমজ ভগ্নীদের মত এক সঙ্গে গ্রথিত। অন্ততঃ 'রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া তাহাই মনে হয়। রবীন্দ্র-ভক্তিতে বর্তমান লেখককে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না;—অতএব তাঁহার 'অ-জিত' অভিধান এতদিনে সার্থক হইল।—এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনা ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবন উচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল

না, বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি দুলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলাম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম—এই আমার মাটীর মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হ'তো * * তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটীতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে মনে পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহ-জীবনেও এই সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। মধ্যে কোনও বিতর্ককালে তিনি শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আপনাকে 'গাছে'র সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন। "বসুমতী"তে সে চিঠি ছাপা হইয়াছিল। মানুষ আপনাকে কত রকম ভাবিতে পারে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়! আমাদের দেশের একজন—গ্রাম সম্পর্কে খুড়ো—ভাবিতেন, তিনি কুইন ভিক্টোরিয়াকে বাইশ কি তেইশ কোটী টাকা হ্যাণ্ডনোটে ধার দিয়াছেন। কোথায় পড়িয়াছি, মনে নাই, একজন ভাবিত, তাহার আপাদ মস্তক কাঁচে গড়া। তা আবার 'বেলোয়ারী' নয়, ঠুনকো ফুঁকো কাঁচ। সে যাহাকে দেখিত, তাহাকেই বলিত, 'তফাৎ! তফাৎ! আমি ভেঙ্গে যাব।' ইহারা কবিতা লিখিত কিনা, সন্ধান লইলে হয় না? রবীন্দ্রনাথের 'সম্বর্ধনার' দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই বিবাহ-সভার 'হ্যাণ্ডবিলে'র মত স্তব-রচনার সূচনা হইয়াছে। এক 'প্রবাসী'র অঙ্গেই স্তব-পঞ্চক প্রকটিত দেখিতেছি। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে 'কবি-সম্রাট' উপাধি দিয়াছেন। যদি 'সাহিত্যিক'দিগকে খাজনা দিতে হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ! আশা করি, নূতন সম্রাট অওরঙ্গজেবের মত অপর পক্ষের উপর জিজিয়া কর ধার্য করিবেন না।

২২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩১৮

ভারতী শ্রাবণ

—'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সারাংশ। গদ্যে রচিত আধ্যাত্মিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এখন অগ্রে ক্রিয়া তার পর কর্তা নিবিষ্ট করিয়া ভাষার বৈচিত্র সাধন করিতেছেন। কবিবর বহু পূর্বেই বলিয়াছেন,—'আমার সকল কাজেই originality।' ইহাও তাই।

২২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩১৮

প্রবাসী আশ্বিন

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' নামক নাটকখানির আমরা সমালোচনা করিব না। যদি সম্ভব হয়, পরে তাহার পরিচয় দিব। ন-নাস্তি আটকো যস্মিন্, তাহাই যখন নাটক, তখন বঙ্গীয় মহাকবিদের কল্পনাকে মস্তিষ্কের ফাটকে আটক রাখিবার কোনও কারণ নাই।—কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি,—'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে বাণ বর্ষণ করিতেন। আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র প্রধান প্রতিপাদ্য—হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ণ, হিন্দুর মন্ত্র ব্যর্থ বাগাড়ম্বর, হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান বিদ্রূপের উদ্দীপক। কূপমণ্ডুকের মক্‌মকে সুবিস্তৃত 'অচলায়তন মুখরিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'মেটারলিঙ্ক' হউন, আমরা আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করিবেন না। 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম-জীবন-চরিত।" রবীন্দ্রনাথ এবার 'ভৃত্য রাজক তন্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাত আট বৎসর বয়সে সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবন-স্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতী আশ্বিন

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাসমণির ছেলে' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ইহার আখ্যানবস্তু ও বলিবার প্রণালী যেমন সহজ তেমনই সুন্দর। গল্পটি স্রোতের মত অবিরাম চলিয়াছে। কোথাও তাহাকে আয়াসের বাধা অতিক্রম করিয়া সংকুচিত হইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনারীতি অন্য পথের পথিক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'রাসমণির ছেলে'কে কবিত্বের অলংকারে ভূষিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। স্বভাবের সহজ সৌন্দর্যে তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন। 'রাসমণির ছেলে' বাঙ্গালীর মন হরণ করিয়াছে।

২২শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩১৮

সুপ্রভাত আশ্বিন

শ্রীযুত কাশীচন্দ্র ঘোষাল 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত' নামক প্রবন্ধে

লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত সামগানের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিতেছে।" অনেক 'সাম' মরিয়া থাকিবে। আর যেগুলি আছে তাহার সহিত সম্ভবতঃ ঘোষাল মহাশয়ের কোন কালে পরিচয় হয় নাই। কিন্তু লেখকের এই তুলনা আশা করি বর্তমান যুগের রবি-পন্থীদিগের সমালোচনা প্রতিভার প্রমাণস্বরূপ চিরজীবী হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করিবার শক্তি কাশীচন্দ্রের নাই তাই তিনি সে অভাব তেলে পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাও আবার অত্যন্ত চট্‌চটে দুর্গন্ধ রেড়ীর তেল। লেখক দিনকতক ব্রহ্মসঙ্গীত খানি ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' পাঠ করুন; উপকৃত হইবেন।

২২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
মাঘ ১৩১৮
প্রবাসী পৌষ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে অরূপের যুক্তিও অরূপ। হেঁয়ালীর দ্বারা সাকার উপাসনার খন্ডন করিয়াছেন। সম্রাটের অভি-ষেকের পূর্বে সে সব তত্ত্বের বিশেলযণ করিবার প্রবৃত্তি নাই।

২৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩১৯
প্রতিভা ফাল্গুন

শ্রীসুখরঞ্জন রায়ের 'কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি নামক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের বিরাট বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। কবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। সমা-লোচনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—'হাতের চেয়ে আম বড়' হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধের ভাষাটিও কঙ্করবৎ কঠিন, চর্বণের চেষ্টা করিলেই দাঁত ভাঙিগয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই,—"রমেশ দৃঢ়তাহীন শিথিল, বিরুদ্ধতাকে সে কঠোর প্রতিবাদে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে না,, তাহার নিকট মাথা নোয়াইয়া, আজ কাল করিয়া দৈবপ্রেরিত শুভ অবসরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।" 'বসিয়া থাকে' ক্রিয়ার কর্তা কে? রমেশ 'বিরুদ্ধতার নিকট মাথা নোয়াইয়া বসিয়া থাকে' কিরূপ বাঙ্গালা মহাশয়! "বস্তু-জাগতিক বিহারী বস্তু-জাগতিক রমেশ হইতে বড়, এ কথা নিশ্চিত।" কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে, ইংরাজীতে অনুবাদ না করিয়া এ সকল হেঁয়ালীর অর্থ বুঝিবার চেষ্টা পন্ডশ্রম মাত্র।

বাঙ্গালা ভাষারূপ লাওয়ারিস্ ময়দাকে পদদলিত করা আজকাল এই শ্রেণীর নবীন লেখকদিগের উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতী চৈত্র

শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার বিপুলতা দেখিয়া 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'র কথা মনে পড়ে, দ্রৌপদীর বসনের মত এ সমালোচনা—স্তব ও প্রহেলিকার জটিল জাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। কথার এমন প্রবাহ সচরাচর দেখা যায় না। লেখকের দুই একটি 'স্বতঃসিদ্ধ'—সিদ্ধান্ত অত্যন্ত চমৎকার। রবীন্দ্রনাথ "আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণব তন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেই জন্যে আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না।--স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশী শ্রদ্ধা করে।" অদ্ভুত নহে কি? প্রথম ত 'পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি।' বোধের হাসি নয়, কান্না নয়, হাত নয়, পা নয়,—দৃষ্টি। তবে তাহা চশমায় ছাঁকা কি না, অজিত দার্শনিক তাহার উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাত্মবোধ বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় 'অন্তর্নিগূঢ়' হইয়াছিল! এই 'অন্তর্নিগূঢ়ে'র জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি, সাহিত্য উদ্বাস্তু হইতে বসিয়াছে। 'অন্তর্নিগূঢ়ে'র অন্তরে প্রবেশ করি, এমন সূক্ষ্ম শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। তাহার উপর আবার 'বিশ্বানুপ্রবিষ্ট।' প্রহেলিকা বটে, তবে ভাঙ্গিবার উপায় নাই। এই সকল দাঁতভাঙ্গা শব্দের দ্বারা যে সকল দাড়াভাঙ্গা দার্শনিক কাঁকড়ার সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভবের হাটে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্গারে তাহারই অপচারের ন্যক্কারজনক গন্ধ। আবার অপরূপ সিদ্ধান্ত শুনুন,—এ দেশের লোক 'ভেককে বিশ্বাস করে'। অজিতের 'ভেক' যদি বোলপুরের শান্তিনিকেতনের কোটরবাসী কোলাব্যাঙ,—এমন কি ব্যাঙ্গাচীও হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু যে 'ভেক' দেখাইয়া বাঙ্গালা দেশে ভিখারীরা ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে, সে 'ভেক'কে কোনমতে বিশ্বাস করিব না। তবে কেহ কেহ ভেককে বিশ্বাস করে বটে ; নহিলে ভবের হাটে ভেকধারীরা ভিক্ষা পাইত না। কিন্তু এ বিশ্বাস সার্বভৌমিক নহে। 'বাস্তব'কে পদাঘাত করিয়া অলৌকিককে শ্রদ্ধা করিবার পরামর্শ দিয়া অজিত দার্শনিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নহিলে তাঁহাদের কাণাকড়ি সাহিত্যের হাটে চলিবে কেন? আশ্চর্য এই যে, এই সকল nonsenseও ছাপার অক্ষরে জাহির হয়।

প্রবাসী চৈত্র

কবিবর রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি" উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে ; সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে ; কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

২৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯
প্রতিভা চৈত্র

শ্রীসুখরঞ্জন রায়ের "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" পূর্ণতেজে চলিতেছে, যেন হাজার-মনে-সুঁদরীকাঠ-বোঝাই নৌকা। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা দৈনন্দিন সংসার-জীবনে অল্পবিস্তর গম্ভীর, তাহার কারণ আমরা অল্পবিস্তর সংসারের দাস, সংসারের পাকের মধ্যে জড়াইয়া আছি।" আমাদের সংসার-জীবনের অল্পবিস্তর গাম্ভীর্যের এতবড় গুরুতর কারণ আছে, তাহা জানিতে পারিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। "এবং চক্রবর্তীর হাস্যরসসম্পৃক্ত ভাষা বিজেতার ভাষা, যিনি সংসারের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার ভাষা।" পড়িয়া মনে হয়, চক্রবর্তীর ভাষা কিরূপ, তাহার সমালোচনা করিবার পূর্বে লেখকের বিবেচনা করা উচিত ছিল, তাঁহার ভাষাটা কিরূপ। "আনন্দের কাজ পরোক্ষে অন্তরের জাল জটিলতাকে শিথিল সরল করিয়া দিয়া অন্তর্নিহিত আনন্দধারার প্রকাশ প্রবাহের পথকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, অথবা, যাহা একই কথা, আনন্দের বার্তা পাঠাইয়া অন্তরেব আনন্দ নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দেওয়া"—প্রভৃতি শব্দসমষ্টি পাঠ করিয়া মনে হয়, লেখক ইংরাজীতে চিন্তা করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সমালোচনার স্পর্ধা করেন, তাঁহার এরূপ ভাষার দৈন্য উপেক্ষার বিষয় নহে। বাঙ্গালা ভাষাটা যে দিন দিন কুজ্‌ঝটিকাময়ী হইয়া উঠিতেছে।

ভারতমহিলা বৈশাখ

শ্রীকালীমোহন ঘোষ কবিবর রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নামক নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক কালীমোহনবাবুর 'শ্রী' বিরাগের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। সমালোচক অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়াছেন,—"এইরূপ আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ নাটক বাঙ্গালায় আর নাই।" কিন্তু এই দৈববাণী সকলে ঘাড় পাতিয়া লইবে কিনা সন্দেহ। "ঠাকুর্দাই গ্রন্থের মূল সুর" ও "মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়া গান জুড়িয়া নৃত্য করেন" প্রভৃতি অপরূপ বাঙ্গালা সমালোচনার অতীত। "মুক্তি ও বন্ধন"—জন্ম ও মৃত্যু তাঁর সেই আনন্দের সঙ্গীতকেই বাজাইয়া তুলিতেছে। 'সঙ্গীত'কে যিনি সমালোচনার জয়ঢাকে 'বাজাইয়া' তুলেন, তিনি সাধারণ সমালোচক নহেন। এই সমালোচক বাঙ্গালা ভাষাকে যে ভাবে 'তুলোধোনা' করিয়াছেন, ধুনুরীও সে ভাবে তুলো ধুনিতে পারে না।

২৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩১৯

বঙ্গদর্শন চৈত্র

"চরিত্রচিত্রে" শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ, তাঁহার কবিপ্রতিভা, তাঁহার অন্তর্মুখীনতা, তাঁহার মায়িক দৃষ্টি ও মায়াশক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশেলষণ করিয়াছেন। যে সকল বাঙ্গালী লেখক রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার সমস্ত রচনার মোসাহেবী করেন, এই প্রবন্ধ-পাঠে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব আশ্রিত-মাসিকে তাহার অবতারণা দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। তবে বিপিনবাবুর সহিত সকলে সকল বিষয়ে একমত হইবেন, সে আশা নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে বিপিনবাবুর মত পরিবর্তিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত-পরিবর্তন বিষয়িনী প্রতিভার সহিত বিপিনবাবুর প্রতিভার যে সাদৃশ্য আছে, বিপিনবাবু বোধ করি, বিনয়ের খাতিরেই তাহার উল্লেখ করেন নাই।

'কাব্যে গন্ধ' শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের রচনা। এই প্রবন্ধে লেখক নিপুণভাবে কবিবর রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনা পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটি নির্ভীক, সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ। আমরা সকলকে বিশেষতঃ কবিবরের অন্ধ স্তাবকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা পড়িতে আমরা বড়ই ভয় পাই। তাঁহার পাকান ঘোরান প্যাঁচওয়ালা ভাষা-ব্যূহ যদি বা কোন-প্রকারে ভেদ করিতে পারি, কিন্তু

তাঁহার মর্মকোষের গন্ধ, ঘনানন্দ প্রভৃতি কবিত্ব কুহেলিকা মনে এমন একটা বিষম বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে জন্য তাঁহার আধুনিক রচনাগুলি পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত কবিবরের 'জীবনস্মৃতি'র স্থল-বিশেষ আমাদের কাছে দুরধিগম্য যেন ভাষার গোলোক-ধাঁধাঁ ; এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভক্তগণ হয়ত একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন,— 'ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ!' গন্ধই বটে। বিনয়ের বেড়ায় ঘেরা আত্মম্ভরিতার এমন ঝাঁজাল তীব্র গন্ধ আর কোথাও আজ পর্যন্ত পাই নাই।—নিরপেক্ষ পাঠকেরা একথা অস্বীকার করিবেন না। তবে রবি-ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। কবিবরের অসামান্য প্রতিভার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে. তাঁহার মত 'নিতুই নব'। কবিবরের নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি কাব্য-নীতিতেও কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। লেখক কবিবরের রচিত আধুনিক ও অতীত কালের নানা প্রবন্ধের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন. —কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে কবিবরের যে মত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন. 'রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা 'প্রমাণ' করিয়া দিব। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যাহাদের পক্ষে বেদবাক্য বলিয়া ধারণা, তাঁহাদের সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে পারে।' কিন্তু ভাঙ্গিবে কি? যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিবার নয়। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, একদিন কোনও নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে জর্জরিত করিবে। ইহাকে বলে, 'যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!'

২৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩১৯
প্রবাসী ভাদ্র

"লীলা" রবীন্দ্রনাথের প্রহেলিকা। "এই যে তোমার আড়ালখানি দিলে তুমি ঢাকা।" এই "আড়াল-ঢাকা"র ঢাকা ত সাতদিন চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিলাম না।

"ইংলণ্ডে সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা"য় দেখিতেছি,—"ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি

ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোন দেশে নাই।”—আহ্লাদের কথা নয়? তবে দেশের লোকে এতদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই; কারণ, 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার'। আর, ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দের বগলেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র,—প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে! কোন্ কোন্ সুধী এই জগদ্ব্যাপী কবি-জরীপের সার্ভেয়ার ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা আমাদের ধন্য করিলেন, তাঁহারাও ধন্য!

২৩শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩১৯

ভারতী অগ্রহায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত' নামক প্রবন্ধের অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই অঘটন-ঘটনায় একটু বিস্মিত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর একচেটে ও মামুলী 'প্রাণশক্তি' প্রভৃতির 'সংগীতে' অভাব নাই বটে, তবুও ইহা বুঝা যায়। কবিবর এ দেশের শিক্ষায়তনসমূহে ও সমাজে কলাবিদ্যাকে স্থান দিতে বলিয়াছেন।

২৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

প্রবাসী বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বিনামূল্যে” নামক রূপকটি উপভোগ্য। প্রথম স্তবকটি না থাকিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

২৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩২১

প্রবাসী চৈত্র

“গানে” শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষোলটি গান ছাপা হইয়াছে। গানে রবির কিরণ নাই। আধ্যাত্মিকতা থাকিতে পারে, প্রতিভার গৌরব বা কবিতার সৌরভ নাই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “একটি মন্ত্র” তাঁহার এই-শ্রেণীর রচনার পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছে। সংক্ষিপ্ত মানবজীবনের পক্ষে এ সকল মন্ত্র চির-কালই বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। 'দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির' জন্য যাঁহাদের

নূতন দুঃখ-বরণে আপত্তি নাই, আমরা কবিবরকে ধন্যবাদ দিয়া, সসম্মানে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতেছি।

২৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ

কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন "তত্ত্ববোধিনী"র সম্পাদক। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥"

'চরণে' শ্লেষ আছে! এতগুলি চরণ সত্ত্বেও গানটি যে খোঁড়া হইয়াছে, তাহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে, সুরগুলি চরণ পাইবামাত্র তাহাদিগকে ব্রহ্মসঙ্গীতের ময়দানে ছাড়িয়া দিলেও কোন লাভ নাই। "তুমি এত আলো জ্বালিয়াছ এই গগনে"—ইত্যাদি গানটি আদৌ জগতের আলো না দেখিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ ভাবকে ঢাকিবার জন্য ভাষার ব্যবহার করিতেছেন। নূতন বটে, কিন্তু একটু সাংঘাতিক। রবীন্দ্রনাথের "মনুষ্যত্বের সাধনাও" এই শ্রেণীর। তবে শিষ্যবিদ্যা গুরুর অপেক্ষা গরীয়সী হইয়াছে, আশা করি, রবীন্দ্রনাথ সে জন্য দুঃখিত হইবেন না। তাঁহার এই রচনাটির কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যথা,—"মানুষ কেমন ক'রে ত্যাগ করচে, কেমন ক'রে মহত্ত্ব প্রকাশ কচ্চে, তাই দেখ—সেইখানে মানুষের যথার্থ স্বভাবের পরিচয় পাবে। সেইখানেই মানুষের সম্মান, মানুষের গৌরব। মানুষের যথার্থ সম্মান অভিমানকে বলিদান দিয়ে, অভিমানকে চরিতার্থ করে নয়।" এই উপদেশটুকু মনে রাখিলে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ সাহিত্যসেবী বাঙ্গালী—আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়রায় অবশ্য সন্দেশ খায় না; তবু বলি, "মানুষের যথার্থ সম্মান অভিমানকে বলিদান —(যদিচ শুধু বলি দিলেই যথেষ্ট হইত—দানের উপর দান অত্যুক্তির খয়রাৎ) দিয়ে"—সাধনার এই সারসত্যটুকু সর্বদা মনে রাখিলে উপদেষ্টাও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের মানুষ কেমন ক'রে আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করছে এবং 'নাকুয়ার বদলে খুরুয়া'র মত বিদেশের প্রসাদ লাভ করে অভিমানে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে, বস্তুতঃ তা দেখে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে কারও কোনও লাভ নাই। তার চেয়ে বরং এই সকল উপদেশের মহত্ত্বগুলি দেখে গেলে লাভ আছে।

২৫শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩২১

তত্ত্ববোধিনী জ্যৈষ্ঠ

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বর্ষশেষ" ও "নববর্ষ" পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। কিন্তু এ শ্রেণীর প্রবন্ধ যায় না। যখন বর্ষ যায়, তখন গদ্য-কাব্যি রাখিয়া যায়। যাহা সংসারের মামুলী নিয়ম তাহা শিরোধার্য করাই বিধি।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নূতন গানে" কবিত্ব আছে। তত্ত্ব অল্প। তাই কাব্য ফুটিয়াছে।

২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩২৩

ভারতী চৈত্র

প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দেনা পাওনা"—শালতামামীর গান; চৈত্রের উপযোগী বটে। এ ক্ষেত্রে মহাজন সার রবীন্দ্রনাথ, খাতক—দুর্ভাগ্য শ্রীমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। কবি বলিতেছেন,—

"পাখীরে দিয়েছে গান, গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তারো বেশী করি দান,
আমি গাই গান।"

খুব বদান্যতা, সন্দেহ কি? কিন্তু কবির অনুকরণে, বিধাতা যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, সে যদি তাহার অতিরিক্ত দান করিতে চাহে, তাহা হইলে দুনিয়ার অবস্থাটা সম্ভবতঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলিতেছেন,—

"বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা, কভু সোজা।"

কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবিবরের বাতাসের উপর হিংসা করিবার কোনও কারণ নাই। নিজের চলনটুকু যখন লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন তাহার কারণ-টুকুও তলাইয়া দেখিলে আর এতটা আক্ষেপের অবকাশ থাকিত না। আজ-কাল 'ঘরে বাইরে' তাঁহার কবিত্বের যেরূপ বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে—ঘরের লোক না হউক—বাহিরের অনেকেই বুঝিয়াছে, যিনি 'আলোকে আঁধারে

মিলাইয়া এ ধরণীরে' গড়িয়াছেন, তিনি সম্প্রতি কেবল 'একটি স্বাধীন বাতাসেরে' নয়—ঊনপঞ্চাশটি বায়ুকেই তাঁহার কবিত্বের ও সংস্কারের খিদমতে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই গানেই তাহার প্রমাণ আছে।

"আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও॥"

তোমাকে, আমাকে, তাহাকে, ইহাকে, উহাকে—সকলকে খয়রাৎ করিয়া, ফকীর হইয়া, জগৎ পাতা অবশেষে সার্ রবীন্দ্রনাথের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—'জয় রাধে কৃষ্ণ! দুটি ভিক্ষে পাই বাবা!' সাধকের এমন স্পর্ধা ভারতের তপোবনের অন্তর্গত বঙ্গ নামক শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদেই সম্ভব! এই বাঙ্গালার হালিসহরের জঙ্গলে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন বা চাহিয়াছিলেন,—

'আমায় দাও মা, তবিলদারী!'

যেমন সাধক, তেমনই প্রার্থনা! এই কয়েক বৎসরে বাঙ্গালী সাধনার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দিন-দুনিয়ার মালিক 'সিংহাসন হতে নেমে' নাইট্-দাতার দান লইয়া যাইতেছেন। আর তাই কি সোজা দান?—এক রাশি সবুজ পত্র! বাস্তবিক, এই বহুরূপী বিধাতার উপর রাগ হয়। এই শস্যশ্যামল দেশের সমস্ত সবুজ পাতায় পেট ভরিল না, হ্যাংলার মত, ক্যাংলার মত কতকগুলি অকালপক্ব কৃষ্ণের জীবের একমাত্র ভরসা—খোরাক সবুজ-পত্র ভিক্ষা করিতে আসেন! যাহা হউক, এতদিনে সার রবীন্দ্রনাথের হাত খুলিয়াছে।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পূর্ণের অভাব" বিষম সমস্যা বটে, কিন্তু চর্বিতচর্বণ।

২৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

সবুজপত্র বৈশাখ

'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের খাসমহল, তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোসখেয়ালের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজকাল প্রহেলিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন। যা লেখেন, তাই প্রায় হেঁয়ালী হইয়া যায়। সর্বত্রই এইরূপ, কিন্তু খাসমহলের হেঁয়ালী সকলের সেরা। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষের আশীর্বাদ' পড়িয়া মনে হয়, যেন বর্ধমানের গোলাপবাগের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়াছি!

'দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,

যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা!'

'পথ বাজিতেছে! ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাঁয়া বাজে, তবলা বাজে; কাড়া বাজে, নাকাড়া বাজে; মাদোল বাজে, দামামা বাজে; পথ বাজিবে না কেন? সানাই বাজে, বাঁশী বাজে; তুরী বাজে, ভেরী বাজে; সাপুড়ের তুবড়ী বাজে; রবীন্দ্রনাথের 'পথ' বাজিবে না কেন? বেহালা বাজে, ভাস্ বাজে; সেতার বাজে, সুরবাহার বাজে,—আজকাল হারমোনিয়াম বাজে, পিয়ানো বাজে; বাউল রবীন্দ্রের পথ,—জলপথ ও স্থলপথ ও ব্যোমপথ বাজিবে না কেন? দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পথও বেতালা বাজিয়াছে! কবি সুর বলিয়া দিয়াছেন,—তাহার নাম 'দীর্ঘতান!' কিন্তু তালটি খ্যামটা, না কাওয়ালী, না ঠুংরী, অথবা দশকুশী, তাহা প্রকাশ নাই। এই দীর্ঘতান সুরের বাজনা দীর্ঘকাল শ্রোতাদের কর্ণে মধু ঢালিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—পথ ত বাজিতে লাগিল, সুতরাং 'কোন্ বৈরাগীর একতারা পথ হারাইল'। অনেক উৎকট সমস্যা শোনা গিয়াছে, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অথর্ববেদেও ইতিপূর্বে দেখি নাই।—'চলার অঞ্চলে তোর ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি' যে বুঝিতে না পারিবে, তাহার কণ্ঠী কি অটুট থাকিবে?—'নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ!' অর্থাৎ কখনও নৌকার উপর গাড়ী, কখনও গাড়ীর উপর নৌকা। এতদিন চোখে অশ্রু ঝরিত, এখন অশ্রুর চোখ ফুটিল। রবীন্দ্রনাথ যে ছেলেবেলায় লিখিয়াছিলেন,—'জানই আমার সকল কাজে originality' তাহা সত্য। আশ্চর্য এই যে, প্রমথনাথের মত শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকও এই "আশীর্বাদ" শিরোধার্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্য, ভাষার দৈন্য, রচনায় কষ্ট-কল্পনার প্রাচুর্য দেখিয়া দুঃখ হয়। মনে হয়, এ যেন তাঁহার পথ নয়। 'সবুজ-পত্রে' দুইখানি পত্র আছে। একখানি রবীন্দ্রনাথের, একখানি বীরবলের। কেন সবুজপত্র মরিবে না, কেন হল্‌দে হইয়া ধরনীকে চুম্বন করিবে না, তাহারই কৈফিয়ৎ। অবশ্য তাহার সঙ্গে 'আমাদের যুবকেরা পর্যন্ত স্থবির হয়ে উঠেছে' বলিয়া আক্ষেপ আছে। তারা যদি শাস্ত্রের নৈবেদ্য ছাড়িয়া সবুজপত্র চিবাইয়া স্থবিরতা বর্জন করিতে পারে, করুক। কিন্তু, ঘরে বসিয়া আপনারা যাহাদের স্থবিরতার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহারা কি সত্যই স্থবির? মেসো-পটেমিয়ায়, ফ্রান্সে যাহারা জীবন লইয়া খেলিতে যাইতেছে, তাহারা কি জড়তার ক্রীতদাস? স্টেশনে দুইখানি ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। একখানি চলিল। নিশ্চল স্থবির ট্রেনের যাত্রী ভাবে, আমরা চলিতেছি, চলন্ত ট্রেনই দাঁড়াইয়া আছে! রবীন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা। তিনি 'স্বদেশী' হাটে গলদ্ঘর্ম ও জব্দ হইয়া, ঘরে ফিরিয়া, ভালোমানুষ হইয়া বসিয়া আছেন।

ভাবিতেছেন, তাঁহাদের অচল আয়তনই চলিতেছে, আর সচল আয়তন দাঁড়াইয়া আছে!

রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রীর পত্র' দর্শনের—তত্ত্বের—প্রহেলিকার 'দুই চোলাই-করা কড়া আরক'। সাধ হয়, পান কর। এ রবীন্দ্রনাথ কুক্কুটমিশ্র শর্মা। 'বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ'—'আঘ্রায় চ তর্কবাদান' বোধ হয় বলা চলে না—সামান্য ঘটনা হইতে বিরাট দর্শনকূটের সৃষ্টি করিতেছেন। আমাদের যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-যাত্রীর ডায়েরীতে কবিত্বের সুষমা ঢালিয়া দিতেন। এ দর্শন দেখিয়া আমাদের ভয় করে, মনে হয়, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' জগতে ফুল শুকায়, ফল পচে, তেমনই কবিত্বও ঝুনো 'তত্ত্ব' হইয়া উঠে। আহা! যদি পারিজাতের মত চিরকাল টাট্‌কা থাকিত!

২৬শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩২৩

সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রীর পত্রে' যেখানে কবি সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। যেখানে কবি দার্শনিক হইয়াছেন, সেইখানেই উৎকট সমস্যা। 'জাপান-যাত্রীর পত্র', যেন

'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ,
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ!'

রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই 'অদ্ভুতের' রাজ্যের প্রজা। তাঁহার জাহাজী সিদ্ধান্তগুলিও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। মুসলমান যাত্রীরা রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে কোনও কাজ ছিল না, জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করিবারও আর তাঁহার সুবিধা নাই। অগত্যা তিনি গুরুগম্ভীর গবেষণায় মন দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—'একটু মাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্নমুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তারা বাইরের সংসারটাকে মানে।' যারা 'দেখা হলেই' সেলাম করে, তারা যে 'বাইরের সংসারটাকে মানে'—এ অদ্ভুত তত্ত্বটি এতদিন জগতের কোনও দার্শনিক—বোলপুরের কোনও তপস্বীও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ভিতরের সংস্কারটার জন্য যাহারা বাহিরের ধড় ও মুণ্ডটাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়া ধমনীর রক্ত বাহির করিয়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিয়াছিল, শুধু 'সেলামের সাক্ষ্যে' এতদিন পরে তাহাদিগকে 'বাহিরের সংসারটা'কে মানিতে হইল! 'কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডীর মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডীর বাইরের লোকালয় নিতান্ত ফিকে।' ইহাও ধ্রুব সত্য।

সেই জন্য জগতের যত জাতি নিজের জাতির গণ্ডী কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের প্রাচীর দিতেছে, 'তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্য আদব-কায়দা মুসলমানের। আদব-কায়দা সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম।' এত অল্প পরিসরে এমনতর সিদ্ধান্তের বাদলা প্রায় দেখা যায় না! যদি 'মুসলমান জাতে বাঁধা নয়', তবে জগতে জাতে বাঁধা কে? এমন 'বাঁধা জাতে'র গৌরব জগতে আর কোন জাতি করিতে পারে? এ জাতি এমন বাঁধা যে, তিব্বতে ঢেঁকি পড়িলে আবিসিনিয়ায় মুসলমানের মাথা নড়ে। আদব-কায়দা সব জাতিরই থাকে। বাহিরের সঙ্গে অল্পবিস্তর ব্যবহার না করিয়া কোনও জাতিই এ দুনিয়ায় টিকিতে পারে না। একটি ছোট 'সেলামে'র মর্মর-শৈল হইতে দর্শনের কি সুন্দর নর্মদা-প্রপাত! কিন্তু এই দার্শনিক আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য—'মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরু-জনের গুরুত্বের মাত্রা কার কত দূর, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কি রকম হবে···—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্য জাত-বিচারের বাহিরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করচে।' হিতোপদেশের পশু-পক্ষীরাও যা জানে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তা জানেন না। ঋষিরা সেলাম করিতে শিখান নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে ভাবের উৎস হইতে সেলাম, কুর্নিশ, নমস্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, সে ভাবটার কিরূপে কোন পথে সাধনা করিতে হয়, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে। তাহাই ত হিন্দুর সর্বস্ব। আচ্ছা, তিব্বতে মুসলমান আছে, চীনে মুসলমান আছে, জাপানেও অনেক মুসলমান কবিবরের চোখে পড়িবে। তাহারা কি সেলাম করে? কাউ-টাউ চীনের ও নাক-ঘষাই ত তিব্বতীর আদব-কায়দা। তাহা হইলে, তাহারা 'বাহিরের সংসারটাকে মানে না'? চিন্তাসমুদ্রের এমন মন্থন প্রায় দেখা যায় না; এমন ফয়তামৃতও কখনও কোনও দেবাসুরের ভাগ্যে ঘটে নাই?

২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩২৩

সবুজপত্র আষাঢ়

সার রবীন্দ্রনাথ 'জাপান যাত্রীর পত্রে' লিখিয়াছেন, '—যে সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে' ছড়িয়ে পড়ে' যায়। ঠাট্টা করে

লেখা মনে করিবেন না।' মনের মুঠো, তার ফাঁক, সেই রন্ধ্রপথে কথার টুকরো-গুলোর বৃষ্টি! কি সহস্রছিদ্র কল্পনা। কি চালুনীবিনিন্দিনী উপমা! কিন্তু বাঙ্গালীর এমনই সৌভাগ্য যে, এত কথার টুক্‌রো মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গেল, কিন্তু মনের মুঠোর ফাঁকটি ঠিক্‌রে ঠিক সবুজ পাতর গাদায় এসে' পড়ল! অভিধানে লেখে—সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'সাক্ষি'। স্মরণ কর কবির প্রাচীন ইস্তাহার—'জানই আমার সকল কাজে originality! রচনার এক একটি দীপ্ত বেশ—'বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের কাছে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য শতদল ফোটে না।' অবশ্য সিদ্ধান্তটি রৈবিক। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পায়ের নীচেও ফোটে। 'নেই' বলিলে সাপের বিষ থাকে না বটে কিন্তু ইতিহাসের সত্য থাকে। কিন্তু কবিত্বের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের লড়াই বাধাইবার এ স্থান নহে। রবীন্দ্র-নাথের নিকট ঐতিহাসিক সত্যের আশাও অবশ্য কেহ করিবেন না। রবীন্দ্র-নাথের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, অত্যন্ত উপভোগ্য। 'সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন। এত-ক্ষণে একটা কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা এব্‌সট্রাক্‌শন, সে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা সহর, কিন্তু কোনো একটা সহরই নয়। এখন যা দেখচি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙ্গালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশান্‌ওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চটপট্‌ করে ইংরেজী কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে, —মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড করে' দেখ্‌চি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশান্‌বর্জিত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝতে পারি এ ত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করচে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক্‌ না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।' রবীন্দ্রনাথ এই পুরাতন মোহটুকুর জন্য আকুল, অথচ তাকেই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার জন্য তিনি আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন! কল্যাণী এত ভালো লাগে, অথচ তাহাদিগকে খাঁচার পাখী মনে করেন। নিজের বড় খাঁচাটি সহ্য হয়, টুনটুনির খাঁচা দেখিয়া অধীর হন! ইহা আমাদের বিচিত্র সমস্যা বলিয়াই মনে হয়। 'রমণীর লাবণ্যে তারা যেমন প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে

তেমনই তারা মহীয়সী।' মুক্তির শক্তিগৌরব তোমারও যেমন, তাদেরও তেমনই! কার বন্ধনের গেরো একটু শক্ত, কার একটু আল্‌গা, তাহা লইয়া জল্পনা কবির পক্ষেই শোভা পায়, সাধারণের পক্ষে তাহা সময়ের অপব্যবহার—পণ্ডশ্রম। মুক্তিগৌরব কাহাকে দিবে? কোথায় তাহার আধার, তুমি স্বয়ং আগে মুক্তি পাও, তার পর খয়রাৎ করিও। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' এ কথা তুমি ভুলিতে পার, আমাদের তাহা মনে আছে।

২৬শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩২৩
সবুজপত্র ভাদ্র

সার রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রীর পত্র' সুখপাঠ্য। বাণিজ্য দানব এ পথেও আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু নিপুণ তুলিকার রমণীয় রেখাচিত্রে পত্রখানি খচিত। চীনামজুরদের ছবি—'প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করচে যে, সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মত বেজে উঠচে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম্ না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর, তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল,—মানুষের শরীরে যে কি স্বর্গীয় শোভা, তা এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাই নি।'

১৬ই পৌষের পত্রে কবিবর লিখিয়াছেন,—'এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ

করে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলে ওঠা (?) খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোট, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরা সৌন্দর্যের যে রকম বর্ণনা করে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের, অথচ মোটের উপর দেখতে ভালো লাগে ; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা,, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাসবশতঃ ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগ্তে আরম্ভ করেচে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহ-যাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর! কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে কারণেই হোক,, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম-পরতা থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্যহানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইচে, এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগ্চে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাব্চি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মত একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার,, জীবন-চাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।'

২৬শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩২৩

সবুজপত্র আশ্বিন কার্তিক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপানের পত্র' বাস্তবিকই উপভোগ্য। এবার বৈচিত্র্যে, কৌতুকে ও মৌলিকতায় অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। প্রথমে একটু 'দার্শনিকতা' আছে তার পর কবিত্ব। একটা উল্লেখযোগ্য তথ্যও আছে।—'প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে

যখন গ্রাস করতে যাই, তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় আজকাল তাহাদের বৈচিত্র ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতেছেন। এই রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ দুই-একটি অতি সংক্ষিপ্ত জাপানী কবিতার নমুনা দিয়াছেন।—'পুরানো পুকুর, ব্যাঙের লাফ, জলের শব্দ।' একটি সম্পূর্ণ কবিতা। তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য, চরণে চরণে সাজানো।—বাঙ্গালায় এবার নিশ্চয়ই এইরূপ কবিতা দেখিতে পাইব।—'ঠাকুর দালান, কবির লাফ, বলের শব্দ।' কেমন কবিরা হইল? আর একটি কবিতা—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ,—'স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্চে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল,—মানুষের হৃদয় হচ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয় —এর মধ্যে ভাবেরও সংযম।' রবিবাবু যদি জাপান হইতে এই সংযম-যুগলের আমদানী করিতে পারেন! রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি পড়িয়া আমাদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে,—'শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক একদিন এক-একটি গান তৈরী করে, সকলকে শোনাতুম, তখন সকলের কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কলকাতায় এনে যখন বান্ধব-সভায় ধরেচি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেচে। তার মানেই কলকাতার বাড়িতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে।' কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'মানে' টুকু রবীন্দ্রনাথ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। কথামালার সেই গল্পটি মনে আছে ত? প্রাণভয়ে দৌড়ান ও আহারের চেষ্টায় দৌড়ান? বোলপুরের বেতনভোগী বন্ধুদের দৌড়ে ও কলি-কাতার বান্ধব সমাজের দৌড়ে একটু তফাৎ হইবে না? কিন্তু একটি কথা মনে হইতেছে, রবিবাবুর বান্ধবসমাজ কি জানেন না, 'মিত্রদ্রোহী ন মুণ্ডতি?' এই পত্রের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ—'এখানে মেয়েপুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাইনে। অন্যত্র মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনই করে এখানে স্ত্রী-পুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনও মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষ দৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনও এই নিয়ম চলিত আছে।' আর কেহ রবীন্দ্র-

নাথের 'বিবসনা' দেখিয়া কুণ্ঠিত হইবেন না! এক নিঃশ্বাসে এমন সাতকাণ্ড দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মৌলিক চিন্তার সৃষ্টি আর কখনও দেখিয়াছ কি? পৃথিবীতে মেয়ে-পুরুষেরা যে কারণে একসঙ্গে 'ন্যাংটো' হয়ে স্নান করে না সে কারণটা কি অস্বাভাবিক? ভারতবর্ষের রাজ-কবির মতে, সেটা 'লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা।' আমাদের মোহের আবরণ বেশী, তাই আমরা বিবসন ও বিবসনার অভিনয় করিতে পারি না। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন! শুকদেব গোস্বামীর মনে লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতাও ছিল না,, মোহের চুলায় যাক্,, একটু কৌপীনেরও আবরণ ছিল না! কবে সমস্ত বিশ্ব এই নব শুক-দেবের অনুসরণ করিবেন? মানবজাতির মধ্যে যাহারা এখনও বিবস্ত্র হয়ে বেড়ায়, কেবল স্নানের সময়ে নয়, জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত কোনওরূপ ঘেরা-টোপ পরে না, যাহাদিগের কবিকে আদৌ বলিতে হয় না—'ফেল গো! বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল।' কেন না, বসনের তথা অঞ্চলের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, সেই আদিম মানব-মানবীর 'নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে কোনো বাধা অনুভব করে না।' অতএব, প্রতিপন্ন হইল,—'এই প্রথার মধ্যে লেশমাত্র কলুষ নাই!' এমন যুক্তি, এমন উপপত্তি জগতে দুর্লভ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পঞ্জাবে এখনও স্ত্রী-পুরুষে একঘাটে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবার প্রথা আছে। তবু তাহাদের মধ্যে 'লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা' এখনও পঞ্চত্ব লাভ করে নাই। আশা করি, রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষে এই প্রথা প্রচলিত করি-বার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। যাহাতে দেশের অর্থাৎ মানুষের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধিও পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, আশা করি, দেশবাসীও সে পক্ষে অবহিত হইবেন! আবার সিদ্ধান্ত দেখুন,—'পৃথিবীতে যত সভ্যদেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব বড় জিনিস বলে মনে হয়।' দেহ সম্বন্ধে মোহমুক্তির একমাত্র প্রমাণ—জাপানের নর-নারী উলঙ্গ হইয়া একত্র এক স্নানাগারে এক টবে স্নান করে। রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইয়াছিলেন,, এইবার পরমহংস হইলেন! আবার সেই বইখানির কথা মনে হইতেছে,—ইজ জিনিয়াস ইনস্যানিটি—আর রবীন্দ্রনাথের জন্য বাঙ্গালীর উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। চিঠিখানির উপসংহারে আছে,—'যা' মনে হচ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মতলব।' কিন্তু এদেশে একটা উপদেশ আছে,—'শতং বদ, মা লিখ।' সেটা লঙ্ঘন করিতেছেন কে? 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট' হইয়া উঠিল যে। 'জানো আমার সকল কাজেই অরিজিনালিটি'—এই পত্রের দার্শনিকতায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিব না। প্রমথ ভায়া! বাঙ্গালীরা দাদাশ্বশুরকে নাচায়, তুমি শ্বশুরকে বেশ নাচাইতেছ!

২৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
মাঘ ১৩২৩
অর্ঘ্য পৌষ

জাপানী পত্রে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রাজনীতিক অভিমতের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক 'জাপান ম্যাগাজিন' হইতে তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। আমরা 'সাহিত্যে'র পাঠকদের জন্য সেই জাপানী মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম—

'In the pages of the Yomiuri Mr. Iwano addresses an open letter to the great Indian poet Sir Rabindra Nath Tagore, recently visiting Japan, in which he undertakes to express some frank opinions respecting the poet's criticism of Japan's worship of materialism. Quoting the old Japanese proverb, that "Good medicine is bitter to the mouth," Mr. Iwano goes on to assure the poet that Japanese are in no mood to take such advice as the poet has been offering them. The poet reminds him of one who has spent his life among hermits and the struggling portion of humanity. The poet's condemnation of material civilization seems to Mr. Iwano a misunderstanding of things spiritual. To the poet material civillzation appears to have complicated life over-much, an idea that possessed the old-fashioned samurai of Japan after the Meiji Restoration. The notion that oriental life should cherish panthe-ism, and believe everything has life, is too antiquated for a modern People like the Japanese. It is no wonder that India is not an independent nation, if most of the people there hold to ideas like Tagore. Japan can never accept a philosophy which lays more stress on the development of individualism than on the evolution of the state. The impossible idealism of the poems of Tagore is an obstacle to modern progress.

'In the Shinjin the famous congregational paster, Dr. Danjo's Ebina, also takes Tagore to task for his misunderstanding of Japan: To attempt to classify Japan with India, thinks Dr. Ebina, is a mistake, for Japan is to be classed only with countries as Britain, Germany and France; that is, with modern nations.

These nations imported Greek, Roman and Christian civilization which they modified to suit their national purposes, and thus have continued to flourish while the founders of former civilizations have passed away. Japan imported Indian, Chinese and other religions and civilizations, and she is now importing and assimilating western religions and civilizations, while European countries are, in turn, importing something of good from oriental civilizations. There is now a happy tendency among nations to coalesce. The thought that oriental civilization may revive to supplant all others is but the wildest of the day dreams. No national mind can suppose that the west will ever abandon its civilization for that of the orient. The poet evidently does not understand why such civilization as those of Assyria, Babylon, Greece and Rome have gone to ruin, while the nations that have hit upon a happy blending of the material and spiritual in life have prospered more and more. While Japan admires and reverses the poet for his great ability and noble character, she can never afford to be led by his attitude to modern science and civilization, lest she finds herself in the place of India. Japan has secured her position in the modern world by adopting a very opposite policy suggested by the Indian poet ;—

The Japan Magazine.
October, 1916

রবীন্দ্রনাথ গাল বাড়াইয়া শুধু নিজে চড় খান নাই; ভারতবর্ষকেও তাহার অংশ দিয়াছেন। 'নোবেল প্রাইজে'র সঙ্গে এটাও অবশ্য পরিপাক না করিলে চলিবে না।

২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩২৪
ভারতী চৈত্র

'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমরা উদ্ধৃত করিলাম।— রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথাচ্ছলে যে সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দমঠ

সম্বন্ধে রবিবাবুর সমালোচনা সংক্ষেপে এইঃ—

(১) "বঙ্কিমবাবু যেখানে individual-এর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।......আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ'গুলি যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolution-এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই! কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'-গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না?"

(২) "জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ীর সংযোগ দেখিতে পাই না।......কত অত্যাচার, কত বেদনা, কত নিষ্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না।" রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার এই শেষ অংশটুকুর উদাহরণ Turgenev-এর Fathers and Children বা On the eve প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমমূলক উপন্যাসে পাওয়া যায়। উহাদের সঙ্গে আনন্দমঠের যদি তুলনা করা যায়, তবেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, উপন্যাসে ব্যক্তির সমষ্টিগত রূপ নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যগত চেহারা ফুটাইয়া তোলাই দরকার। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠতা নয়, তাহার শ্রেষ্ঠতার অন্য কারণ। আনন্দমঠ সম্বন্ধে রবিবাবুর এই সমালোচনা বহুকাল পূর্বেকার—আনন্দমঠ যখন প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রনাথ-বাবুর সহিত পত্রব্যবহারে এই সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরেও তাঁহার এই মত অপরিবর্তিত রহিয়াছে কি না, বিপিন-বাবুর লেখা হইতে তাহা ঠিক জানা যাইতেছে না। কারণ, স্বদেশী-আন্দোলনে আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়াছে। এ তো উপন্যাস নয়, এ যে স্বদেশ-প্রেমের অপূর্ব ভাগবৎ! বিপ্লবচেষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভূমিকায় নিন্দা করিয়াছেন; সুতরাং আনন্দমঠ পড়িয়া বাঙ্গালীর মধ্যে যদি বিপ্লবচেষ্টা দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা স্বয়ং লেখক কর্তৃক নিন্দিত। আনন্দমঠের মধ্যে যে intensity, যে আবেগতন্ময়তা আছে, তাহা লিরিকের উপযুক্ত। নাটক যদি লিরিক্যাল হয়, তবে এ উপন্যাসকে লিরিক্যাল উপন্যাস বলায় কোনো হানি হয় নাই।"

২৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪
উপাসনা বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথ জাপানীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা ইউরোপের সভ্যতায় মজিও না।' 'আজ ইউরোপ ভাল করিয়াই প্রমাণ করিতেছে,—তাহাদের এত সাধের সভ্যতা পূর্ণমাত্রায় বিফল হইয়াছে।' কলিকাতার 'অক্সফোর্ড মিশন' নামক খৃষ্টান-মণ্ডলী হইতে প্রকাশিত 'এপিফেনী' নামক পত্রে একজন লেখক 'রবিবাবুর এই বক্তৃতা পড়িয়া কয়েকটি সারালো ও ধারালো কথার অবতারণা করিয়াছেন।' অতুলচন্দ্র দত্ত তাঁহার সারসংগ্রহ ও সমর্থন করিয়াছেন। 'এপি-ফেনী'র লেখক বলিতেছেন,—

'মানিলাম ইয়ুরোপীয় সভ্যতা বিফল হয়েছে; মানিলাম ইয়ুরোপীয়রা দেশপ্রেমের নাম দিযা পিশাচলীলা করিতেছে * * মানুষের কায়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চরমব্যবস্থা করিয়াও বর্তমান ইয়ুরোপীয় ও মার্কিন সভ্যতা যে আসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তা আমরা একশোবার স্বীকার করিতেছি। সভ্যতার বিফলতা বুঝিতে যদি এই ধরি যে, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ অনুসারে জীবনধারণ হইতেছে না; জাতিতে জাতিতে সদ্‌ভাব থাকিয়া মহামানবের চরম বিকাশের সহায়তা হইতেছে না; জাতির মধ্যে শ্রেণী, দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের সুখ-সুবিধার মুখ চাহিতেছে না; তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমান প্রতীচ্য সভ্যতা বিফল হইয়াছে। * * * কবি রবীন্দ্রনাথ ভাবরাজ্যের একজন নায়ক, তাঁর উক্তির তলে তলে যদি এই ইঙ্গিত থাকে যে, (সম্ভবতঃ তাই-ই) ভারতীয় বা এশিয়ার যে-কোন প্রাচীন সভ্যতা সার্থক হইয়াছে, আর ইউরোপীয় সভ্যতা নিরর্থক ও বিফল হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের একটু ঝগড়া করিতে হয়। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গোটাকতক কথা শুনাইব। (ক) যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগেও হয় নাই? (খ) কুরুক্ষেত্র সমরটা কি একটা পৈশাচিক কাণ্ড নয়? * * * বর্তমান যুদ্ধে যে ঘোর নির্দয়তা, নৃশংসতা ও পশুত্বের অভিনয় কবি দেখিতেছেন, তাহা কি তাঁহারই দেশের সভ্যযুগের যুদ্ধে ঘটে নাই? তারপর আধুনিক ভারত-সভ্যতা—প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধ, যত দ্বন্দ্ব, বিপ্লব এক ভারতে হইয়াছে এমন বোধ হয় সমগ্র ইয়ুরোপেও হয় নাই। ব্রাহ্মণ সভ্যতাকে নাকি জগতের সব সভ্যতার সেরা বলিয়া গণ্য করা হয়—আজ ৪০০০ বছর ধরিয়া এই সভ্যতার একচ্ছত্র আধি-পত্যের ফলেও আজ ভারতবর্ষে ৫ কোটির অধিক অস্পৃশ্য পারিয়া জাত বর্তমান। জাপানের প্রাচীন সভ্যতাও কি এইভাবে বিফল হয় নাই? বিগত যুগে জপানের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, দুর্দশা, জাতিতে জাতিতে বিরোধ

ঈর্ষা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি, প্রবল বর্ণের দ্বারা হীন বর্ণের [উপর] অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার, ধর্মের অত্যাচার প্রভৃতি, এ সব কি আধুনিক জাপ অস্বীকার করিতে পারেন? যদি সে সভ্যতা বিফলই না হইবে তবে জাপান পশ্চিমের কাছে সভ্যতা ধার করিলেন কেন? * * * শুধু জাপানে কেন? গ্রীস, রোম, মিশর, আসীরিয়া, ইয়ুরোপ, আমেরিকা সর্বত্রই সেই এক কথা—এক কাহিনী। কোথাও সভ্যতা সফল হয় নাই।

সভ্যতা কোনো যুগে কোনো দেশবাসীকে দেবতা করিয়া তুলে নাই। মানুষের পশুভাব স্বার্থের চেষ্টা, সব সভ্য জাতিতেই দেখা যায়। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধ হইলেই তাতে নির্দয়তা, মিথ্যাচার, নৃশংসতা, প্রবঞ্চনা, সবই ঘটিয়া থাকে। শুধু ইয়ুরোপ সে অপরাধে অপরাধী নহে। তার পরের কথা এই, বর্তমান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পশুত্বের চরম অভিনয় দেখিতে পাইলেন? মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তার কি কোনো বিকাশ তিনি এক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছেন না? এই মহাসমর যে একটি অগ্নি -পরীক্ষার মত, ইহার ভিতর দিয়া ইয়ুরোপের শুভ-বুদ্ধি ক্রমশঃ যে ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে যাইতেছে, তাহা দেখিলেন না? একদল যেমন একদলের টুঁটী ছিঁড়িতেছে, তেমনি একদল যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আহত ও আর্তের সেবা করিতেছে; * * * রবীন্দ্রনাথ যদি একবার সমর-ক্ষেত্রের সীমানায় বেড়াইতে যাইতেন, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে দেবতারও সাক্ষাৎ আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।'

দেখা যাক্, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় এপিফেনী'র কি উত্তর দেন!

২৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩২৪

নারায়ণ আষাঢ়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চল্‌তি ভাষা—বনাম সাধু ভাষার মামলায় ডিক্রী দিতেছেন,—'বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায় চল্‌তি ভাষার title (স্বত্ব) সাব্যস্ত হইল, কিন্তু Possession (দখল) আপাততঃ সাধু ভাষারই থাকিবে। সাধু ভাষাকে চল্‌তি ভাষা eject (উচ্ছেদ) করিতে পারিবে না। উভয়পক্ষ নিজ নিজ খরচা বহন করিবে।'—আমরা বলি, তথাস্তু। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টার, তিনি আপীল না করিয়া ছাড়িবেন কি?

২৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩২৪

ভারতী শ্রাবণ

'উত্তর প্রত্যুত্তরে' লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন,—'ভারতবর্ষে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন?' অনেকে। আপনাদের দেশেই বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, চৌধুরী আশুতোষ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি অনেকে। বাংলার বাহিরেও তিলক, লাজপৎ, স্বামী রামতীর্থ প্রভৃতি ইহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, নানারূপে ও নানাভাবে, 'বৈদেশিক ন্যাশন্যালিজমে'র বিরুদ্ধ মত এদেশে প্রচারিত হইয়াছে। ঠিক রবীন্দ্রনাথের উক্তির 'প্যারালেল্ প্যাসেজ' না হইতে পারে, আসল বস্তুটার কথা বলিতেছি। অজিতবাবু ভারতবর্ষের 'ন্যাশন্যালিজমে'র ধারা অন্বেষণ করিয়া দেখুন না। রবীন্দ্রনাথ জাতির জাতীয়তা বিকাশের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ, অসামান্য; সেজন্য আমরা ঋণী। কিন্তু এ ধারার উৎস তাঁহারও অগ্রবর্তী। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব খর্ব হইতে পারে না।

২৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৩২৪

প্রবাসী ভাদ্র

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে' আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান' নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী'র এই সংখ্যায় তাহাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শীল মহাশয়ের নামের মহিমাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। 'Cult of Nationalism' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সর্বাবরণ মুক্ত মানবের 'যে আদর্শ ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন,' তাহা আমরা দেখি নাই; দেখিবার উপায়ও নাই। কারণ, গবর্মেন্ট এ দেশে তাহা প্রচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সেই অজ্ঞাত আদর্শের বিচার অসম্ভব। শীল মহাশয় প্রবন্ধের প্রথমে বলিয়াছেন,—রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে 'লইয়া আসিলেন একটা বড় অশান্তি, একটা ঝঞ্ঝাবাত একটা storm and stress * * যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।' শীল মহাশয় কি শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সত্যই মানেন? 'storm

and stress' পাছে বাঙগালী না বুঝিতে পারে বলিয়া তিনি কৈসরের দেশের ভাষায় বন্ধনীর মধ্যে 'strurm und drang' বলিয়া যাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা 'আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়.' ইহাই যদি তাঁহার মত হয়, তাহা হইলে বাংগালীর জীবন হইতে তাহার চিহ্ন পর্যন্ত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য গোলদীঘীর গোলামখানায়—'কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়' নামক সর্ববিধ গোলামীর লীলাক্ষেত্রে—শীল মহাশয় সার ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর সাহচর্য করিতেছেন কেন? 'সর্বাবরণ মুক্ত' মানবের আদর্শই যদি তাঁহার কাম্য হয়, তাহা হইলে বাংগালীর উত্তরপুরুষের জন্য তিনি সর্ববন্ধনযুক্ত আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন কেন? অবশ্য, সার আশুতোষ যে 'সর্বাবরণমুক্ত' মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অর্থাৎ যথেচ্ছাচারের অতি সুন্দর আদর্শ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক্তার শীল কি সেই আদর্শের পূজা করিয়াই বাংগালীকে মুক্তির পথে প্রবর্তিত করিবেন?—তাহার পর প্রশ্ন করিব,—বিদেশ হইতে 'ঝড় ও ঝঞ্ঝা' আনিয়া কি কোনও জাতিকে 'মুক্তির পথে বাহির' করা যায়? জার্মানীর পণ্যের মত তাহার 'strurm und drang' ও কি কেহ জাহাজে তুলিয়া আমদানী করিতে পারে? আবহাওয়ার যে অবস্থায় ঝড় ও ঝঞ্ঝার আবির্ভাব হয়, দেশে তাহার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হইলে কি ঝড়-ঝঞ্ঝার উদ্ভব সম্ভব?—ডাক্তার শীল মনে করেন,—'পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের' একটি 'আদান-প্রদান' চলিতেছে। পূর্ব প্রদান করিতেছে, ইহা সত্য; তবে তাহা কাঁচা মাল ও পাকা সোনা। পশ্চিম তাহা গ্রহণ করিতেছে। পূর্বের ভাবের আদানে পশ্চিমের তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সে বিষয়ে বরং পূর্বের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক; এত অধিক যে, সময়ে সময়ে সেজন্য আমাদের লজ্জা করে। শীল মহাশয়ের মত অনেক মনীষী অবাধে আদান করিয়াছেন, এবং করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রদানের সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। আর এক কথা প্রদান করিবে কে? যাহারা প্রদান করিতে পারে, তাহারা ত পশ্চিমের আমদানী মালেই আপনাদের গুদাম পূর্ণ করিয়াছে; তাহাতে দেশী মালের স্থান নাই। পূর্ব,—অন্ততঃ আমাদের পূর্ব যেমন সহজে অসংকোচে পশ্চিমের দান গ্রহণ করে, পশ্চিম তাহা পারে না। দেড়শত বৎসর আমাদের সংস্রবে থাকিয়াও ইংলন্ড আমাদের একটা ভাবেরও ভাবুক হইতে পারে নাই, ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। তবে 'কালে বাণু পণ্ডিত হইতে পারে'। তাহার পর,—'পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদার ও উন্নত তাহার সহিত পূর্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) ceremonials (অনুষ্ঠান) myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও

হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে—হিন্দুসভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তি-তত্ত্বে ও মুক্তি-সাধনায় সাম্য-বৈষম্য, সসীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহা সম্মিলন, এক মহাশ্চর্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দু ধর্ম কেবলি কর্মকাণ্ড নহে কেবলি rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানা জাতির ও ধর্মমতের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে।' 'reconciliation' কি 'সৌসামঞ্জস্য'? সে কথা যাউক;—পদ্ধতি, প্রতীক, পুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রতীক প্রভৃতি ছাড়া নয়। তাহার আদ্যোপান্তে একটা সম্বন্ধ, সঙ্গতি, ধারা আছে। তাহার একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে রাখা যায় না;—প্রতীক প্রভৃতিও সেই মুক্তির সাধন। স্তরে স্তরে, ক্রম-পর্যায়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, ইহাই হিন্দুর বিধান। বন্ধনে সংযত সাধারণ মানব অনুশীলনের দ্বারা আপনাকে মুক্তি-সাধনার যোগ্য করিবে; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সাধনার পথে অগ্রসর হইবে; সাধনায় উন্নত হইতে হইতে অবশেষে পূর্ণ পরিণতি ও সিদ্ধি লাভ করিবে; তখন কোন বন্ধন থাকিবে না, ইহাই হিন্দুর বিধান। পুরাণ মাত্রই myths নহে। আচার্য শীল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ইঙ্গিতে দুই-একটা কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অত্যন্ত কৃপণ যেমন অতিকষ্টে দুই-এক পয়সা খরচ করে, সেইরূপ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন ধারা'য় আপনার ইংরেজী পড়াশুনার ও বাঙ্গালা লেখাপড়ার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ললিতবাবু এ প্রবন্ধে বলিয়াছেন;—'ইতরশ্রেণীর মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব মহত্ব সংযম আত্মত্যাগ আছে তাহা বর্ণনীয়; অবহেলিত, পদদলিত, ঘৃণিত, নীচ জাতির হৃদয়েও যে কমনীয় ও মহনীয় ভাব আছে, যে মনুষ্যত্ব দেবত্ব আছে, তাহা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, 'নিদিধ্যাসিতব্য।' ললিতবাবুর বক্তব্য এই যে, ইংরেজী সাহিত্যের নূতন ধারায় এই 'নীচ জাতি' স্থান লাভ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালাতেও তাহার সূচনা হইয়াছে। শ্রীমান রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। ললিতবাবুর প্রবন্ধে উদাহরণ ভিন্ন অন্য কোনও নূতন কথা নাই। রাধাকমল রবীন্দ্রনাথে ইহার অভাব দেখিয়াছেন, ললিতকুমার বলিতেছেন,—'যত দূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই নবধারা সঞ্চারে অগ্রণী, তেমনি

আমাদের সাহিত্যে "এসিয়ার রাজকবি" রবীন্দ্রনাথ এই নবভাবের, নবরুচির, নবধারার, নবসাহিত্যকলার প্রবর্ত্তয়িতা। কবিতা ও ছোটগল্পে তিনিই এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।' রাধায় ও ললিতায় বুঝা-পড়া হউক। —এই আলোচনার আর একটা দিক আছে। সংক্ষেপে তাহা এই;—যাহা ইউরোপের সাহিত্যে আছে, তাহাই ভারতের বা বাঙ্গালার সাহিত্যে থাকিবে, এ কামনার কারণ কি? ইংরাজী সাহিত্যের 'আদর্শে' নয়—নকলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজীয়ানার প্রবর্তন হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা গতানুগতিকতার লক্ষণ, মৌলিকতার পরিচায়ক নহে। ইউরোপের 'ইতরে' ও বাঙ্গালার 'ইতরে' প্রভেদ আছে। সমাজের সংস্থানেও পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। —স্বাভাবিক কারণে ইউরোপের সাহিত্যের যে বিবর্ত হইয়াছে, তথাকথিত 'ইতর' নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি হইতেছে সেই সকল কারণের সমবায়ে এ দেশে সেই অবস্থার সৃষ্টি না হইলে, ইউরোপে হয় বলিয়া, আমাদের সাহিত্যেও তাহার যোড়-কলম বাঁধিলে চলিবে না। ইউরোপের সাহিত্যে উদাত্ত চরিত্রের বিকাশের পর স্বাভাবিক কারণে মানব সাধারণের ছবি ফুটিতেছে। তোমার আধুনিক সাহিত্যে সে পূর্বস্তর কই? গোড়া কই? আগেই ডগার সৃষ্টি করিবে? নিজের জীবনই দেখিতে পাও না, পরের জীবন, উচ্চস্তরের জীবন কেমন করিয়া দেখিবে?—ইউরোপে• 'ইতর' ও 'দরিদ্র' প্রায় একার্থক। ভারতে দারিদ্র ও ধর্ম ইউরোপের মত এখনও 'ভিন্ন' হয় নাই; একান্নবর্তীই আছে। অন্তত বাঙ্গালার 'দারিদ্র' ও 'অপরাধ' একার্থবাচী নহে। এ দেশের সনাতন সাহিত্যে মানব-সাধারণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া কখনও রসের সৃষ্টি হয় নাই। ধনীর সাহিত্য ও গরীবের সাহিত্য ইউরোপে আবশ্যক হইয়াছে। এখানে রাজা-প্রজার সাহিত্য একই ছিল। এক থাকাই স্পৃহনীয়। তাহাই আমাদের আদর্শ।—ইউরোপে আছে বলিয়াই এখানেও তাহা থাকিবেই, অথবা না থাকিলে চলিবে না, এমন কোনও কথা নাই। যদি তর্কের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও মনে রাখা উচিত, যে অনুভূতির প্রভাবে ইউরোপ এখন Demos-কে স্বীকার করিতেছে, দেশে সে অনুভূতির সঞ্চার না হইলে, সাহিত্যে সাধারণ-ভাবে মানব-সাধারণের ছবি ফুটিবে না, ফুটিতে পারে না। দেশ যখন আবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তখন সকলের সুখ-দুঃখে তাহার বেদনাবোধ জাগিয়া উঠিবে;—সেই বেদনাবোধ সাহিত্যকেও অনুপ্রাণিত করিবে। বোধ হয়, ভারতবর্ষে সে বেদনাবোধ একটু জাগিয়াছে। তাই এ দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপের চশমা দিয়া যেন আমরা দেশকে দেখিবার চেষ্টা না করি। ইউরোপের উচ্চস্তরে ও নিম্নস্তরে যেরূপ সম্বন্ধ, প্রতীচ্য সমাজে উভয় স্তরের যেরূপ সংঘর্ষ, ভারত-

বর্ষে 'পতিত জাতির দুর্দশা সত্ত্বেও, অবস্থা সেরূপ বিষম—সেরূপ শোচনীয় নহে। অন্তত আমাদের আদর্শ উচ্চ। তাহা যেন আমাদের মনে থাকে।—আর একটা কথাও স্মরণীয়। বিজিত, পরাধীন, নিষ্ক্রিয় দেশে জীবনের সে স্ফূর্তি কই, যাহাতে মানব-জীবন বিচিত্র ও নানা রসে পূর্ণ হইয়া উঠে?—যে তীব্র সুখ, যে তীব্র দুঃখ 'গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারী'র মত মানুষকে 'চাঙ্গা' করিয়া তোলে, সে তীব্র সুখ, সে তীব্র দুঃখ তোমার সমাজের কোন্ স্তরে আছে? যে তীব্র দুঃখবোধে নিস্পিষ্ট রুসিয়ায় টলস্টয়ের মত, ডেস্ট্রেভস্কীর মত, গোর্কীর মত মানবমিত্রের উদয় সম্ভব হইয়াছে, তোমার দেশে সে অরুন্তুদ দুঃখের তীব্র, তীক্ষ্ণ, অনুভূতি কই? শুধু 'ফরমাসে' লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না; হইতে পারে না; কখনও কোনও দেশে হয় নাই; হইবে না। জাতির অনুভূতিই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যই জাতির অনুভবকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শুধু 'সাত নকলে' পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রই সম্ভব; টলস্টয়, ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্ভব নয়। 'অন্য' ও 'ভিন্ন' দেশের আদর্শে 'জাতীয়' ও স্বদেশী' সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। যখন জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ ফুটিয়া ওঠে, তখন জাতীয় প্রতিভারও উদয় হয়। সে প্রতিভা নকল করে না, ফরমাস খাটে না। তখন সেই প্রতিভা জগতের নানা আদর্শ দেখিয়া, আপনার ভাবে আপনার আদর্শ গড়িয়া লয়। সেই আদর্শে জাতি অনুপ্রাণিত হয়। তাহার সাহিত্যও জাতির উপযোগী, আত্ম-শক্তি বিকাশের অনুকূল হয়; সে সাহিত্য 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'; তাহাতেই আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। সেই ভাবী সাহিত্যই মণি; এ সাহিত্য সে হিসাবে 'মৃদাং চয়ঃ'। 'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ণ মৃদাং চয়ঃ।' এই জন্য এ মাটির সাহিত্যে জাতীয় জীবনের কোনও স্তরই জাতীয়ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না। এই 'মৃদাং চয়ঃ' মাটি চাপা পড়িবে; ঘোর সংঘর্ষের চাপে কয়লাও হইবে। আরও চাপে, আরও উত্তাপে, মহাকালের মহারসায়নে সেই অন্ধকার স্তূপে হীরকও উৎপন্ন হইতে পারে। কেবল ফরমাসে, নকলনবীশীতে বাঙ্গালা সাহিত্য গোলকুণ্ডায় পরিণত হইবে না।

ডাক্তার সার রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন এমন চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, শানানো ধারালো রচনা বাঙ্গালীকে দেন নাই। ইহাতে অনেক কথা আছে। তবে অনেক কথার সামঞ্জস্য বা পূর্বাপর সঙ্গতি পাই নাই। সামাজিক সিদ্ধান্ত-গুলি 'নানা মুনির নানা মতে'র উৎস। হিন্দুর বিরোধী। সে সম্বন্ধে মত-ভেদ অনিবার্য। এ অংশের অনেক কথা বাঙ্গালীর পক্ষে সুপথ্য। 'কর্তার

ইচ্ছায় কর্মে'র প্রকাশে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাও অল্প লাভ নহে।

ভারতী ভাদ্র

রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'ভারতী'তেও ছাপা হইয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের 'গান'—'দেশ দেশ নন্দিত করি' চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধে বিষম অভিযান।

"নূতন-যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ মাঝে
স্থান দাও স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।
জনগণ পথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
কোটি মৌন কণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

প্রমথ চৌধুরী এণ্ড কোং কি বলেন? চল্‌তি ভাষায় 'চল্‌তি চাক্তী' চলিতে পারে, বড় কাজ চলে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিলেন। অন্ততঃ তাঁহার প্রতিভা এই গানের ভাষায় চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে।— ইহার 'দিন আগত ঐ, তবু ভারত কই?' এই ধুয়ার অর্থ ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া বুঝিতে হয়। ইহাতে উদ্দীপনা আছে, কিন্তু 'অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল ধরণী'র অপূর্ব ঝংকারও নাই, অতুলনীয় সৌন্দর্যও নাই, সে প্রাণের স্পন্দনও নাই।

২৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩২৪

প্রবাসী মাঘ

রবীন্দ্রনাথের 'স্বাধিকার-প্রমত্তঃ' প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য।—ইউরোপও এই প্রবন্ধে উপকৃত হইতে পারে। আশা করি, ইহা ভাষান্তরিত হইয়া প্রতীচীকে বুঝাইয়া দিবে—ভারতবর্ষে বর্তমানকালে অন্ততঃ

এমন একজন দেশভক্ত সাধক ও মানবতার পুরোহিত আছেন,—যিনি এই পশুবলের যুগে ঘোষণা করিতে পারেন—'আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কি দিতে পারে? পূর্বে এক-রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল তাহার বদলে আর—একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড় জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে? মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না—কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী। ইউরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়? যে-হাত দিয়া সে কোন সত্য বস্তু দিতে পারে লোভে তার সে-হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই—সে যে রিপুর দাস—যে মুক্ত, সেই মুক্তি দান করে।' রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য সভ্যতার আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছেন —তাহাই তাহার সত্যরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রেয় ও হেয়, দুই রূপই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এবং 'চোখে আংগুল দিয়া' দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের সংগে এই সভ্যতার সংঘর্ষে যে বিষম দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, নানা কারণের সমবায়ে তাহা ঢাকা থাকে। কিন্তু রবির কিরণে সে কুহেলিকার জাল ছিন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই, যে-শক্তিতে মানুষের সংগে মানুষকে মিলাইয়া যায়, যে-সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবী করিতে থাকে; অর্থাৎ যাহা দানের সংগে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সংগে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।' ইতিপূর্বে এদেশের আর কোনও 'সার' এ কথাটা এমন স্পষ্টভাবে এমন আন্তরিকতার সহিত বলিতে পারেন নাই। এই যে 'মাথার উপর উপকার বর্ষণ', কোনও জাতি ইহাতে সুস্থ থাকিতে পারে না। দানের বিনিময়ে প্রতিদান চলে, কিন্তু যে দানে হৃদয় নাই, তাহার প্রতিদানে 'হৃদয়ের মূল্য' হিসাবে কপটতা ভিন্ন আর কিছু দিতে পারে না। অথচ এই মূল্যই যাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দিতে হয়, সে জাতি সত্যভ্রষ্ট ও কপটতার ক্রীতদাস না হইয়া থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ভাব-বৈষম্যের এই গোড়ার কথাটা বলিয়া দিয়া জাতির কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'যখন আর্য সাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি করিলেন, তখনই ভিতরেব

দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। * * এবং 'তিনি [রাজা রামমোহন রায়] ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য, এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' পক্ষান্তরে, পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সম্রাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়—এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মায়, তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে, সেইখানেই * * মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর আর পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফলে—'এতদিন যে স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।'—পৃথিবীর বর্তমান নারকীয় অবস্থার কারণ,—'ইউ-রোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে।' কিন্তু 'পরের সম্বন্ধে বিবেচনা' করিতে না শিখিলে 'কোনও জাতির চিরদিন সুবিধা ঘটে না। আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কি বুঝায়?' রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—'য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভাল করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক্ বিলম্বেই হোক্ তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কি পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-রফ্‌তানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতি-হাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসঙ্কোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং

অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শাস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশ বিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধূলার উপর দাঁড়াইয়া আছি যে-পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে যে-পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধূলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যা বেলায় তারা ভগ্নদণ্ড ও জীর্ণ কন্থার যাত্রা শেষ করিল, কত সাম্রাজ্যের অহঙ্কার ঐ পথের ধূলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টা পাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী, সত্যের বলে যার বল একদিন যাহা অন্য সকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাস-বিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।' ভারতের কবি ভিন্ন এ সত্য এমন করিয়া আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিত না, রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ বর্ণ-চিত্রে এমন ছবি আঁকিয়া জিজ্ঞাসুর মনে এ সত্য এমন মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিত না, নিশ্চয়ই বাঙ্গালী--এ গর্ব করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন,—'ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে এক দিন জগদ্ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এক দিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহঙ্কারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে, তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে উপকরণই যে সত্য তাহা নহে, অমৃতই সত্য।' রবীন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার উপর সার্বভৌমিকতার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন 'হেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিতে না যাই।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই বলিয়াছেন,—'বড় ক্ষেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোট ক্ষেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়।' যে জাতির অবস্থা 'ইতিহাসের আরম্ভের আদি মানবের মত, তাহার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তাহার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ' থাকিবে। আগে জাতীয়তা, তার পর 'মানবতা'।—ইংলণ্ডের কবি, ইউরোপের কবি রডিয়ার্ড কিপলিং অবজ্ঞার পর্বতচূড়ায় দাঁড়াইয়া প্রাচী ও প্রতীচীর ভবিষ্যৎ শ্বেতাঙ্গ জাতির বোঝা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। কিন্তু আমাদের কবি প্রজ্ঞাবলে প্রাচী ও প্রতীচীর বৈষম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু জাতিকে উপদেশ দিয়াছেন,—'ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। *সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটা সামঞ্জস্য আছে* যে, তাহা একদিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আরেক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। একদিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে

তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবীর কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না, অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনার পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতা-বোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে-একে বিশ্বের গূঢ় রহস্য সকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহার প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়, তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ যেমন মূল্যবান, তাঁহার উদার গুণগ্রাহিতাও সেইরূপঃ—দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা হিন্দুস্থানের কবির চিত্ত অধিকার করিতে পারে না, ইহাতেও আমরা গৌরব-গর্ব অনুভব করিতে পারি।—রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, 'বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেই জন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না, সেই জন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।'

২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩২৫
প্রবাসী চৈত্র

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়ী' নামক কবিতা। ইহার ছন্দ 'বাঙ্গালা', কিন্তু ভাষা 'চলিত' নয়। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা নহিলে চলে না, প্রতিভা ভাবের যোগ্য ভাষাই বাছিয়া বাহির করে, তাহার একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের সৃষ্টি অসম্ভব। বিজয়ীর ভাষায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বহ্নিদলের রক্তকমল ফুট্‌ল যেন দম্ভভরে:
দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।'

এ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

২৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

সবুজপত্র বৈশাখ

প্রথমে শ্রীরবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রথিত গল্প 'মুক্তি'। ইহা কবিবরের নব-রচিত ছন্দে সহজ কথায় লেখা। ছোট জীবনের ছোট কথা, কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, ইহাই ত মানবজীবনের বড় কথা। বিশ্বের একটা সনাতন স্মৃতি করুণার লেখায়, চিন্তার রেখায় এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতী

এই সংখ্যায় 'ভারতী' একচল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বি-চত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল।—দ্বিজেন্দ্রলাল, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, সরলা, হিরণ্ময়ী এই ভারতীর পূজারী ছিলেন। এই 'ভারতী'র পীঠে কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-সাধনার সূচনা। সেই ভারতী। 'ভারতী' পূর্বগৌরবের স্মরণে, পূর্বপথের অনুসরণে ধন্য হউক।—সে স্মৃতির যাহা পরিপন্থী তাহা বর্জন করিয়া 'ভারতী' আবার নব-ভারতের নূতন আশার ছটায়, মহিমায় মণ্ডিত হউক।— * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরদিনের দাগা' বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। পদ্য-গল্প অবশ্য নূতন নয়; গল্পগুলির রচনারীতি সম্পূর্ণ অভিনব। গল্পটি শেষ করিতে করিতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। অত্যন্ত সহজভাবে, নূতন ছন্দে, নূতন ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর মর্মের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রবাসী বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' বরযাত্রী ঠকানো প্রশ্নকে ঠকাইয়া দিয়াছে। * * * রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ' উপভোগ্য। আশ্চর্য। আজকাল তাঁহার অনেক লেখাই বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যোত্তমের ও সম্প্রদায়ের রচনায় দন্তস্ফুট হয় না। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'।

২৮শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩২৫

ভারতী জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের 'মায়ের সম্মান' কবিতায় রচিত গল্প।

প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'ই জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র শ্রেষ্ঠ রচনা।

২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩২৫

প্রবাসী আষাঢ়

'মালা' রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্প। রবিবাবুর কলম হইতে 'পাগলা ঝোরার' মত গল্প ঝরিতেছে। আখ্যানবস্তু অত্যন্ত অল্প, ভাবের ধারায় গল্পটি পুষ্ট হইয়াছে। একটু রোমাণ্টিক, একটু আধ্যাত্মিক বটে।

ভারতী আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথের 'ভোলা' পদ্য-গল্প। Modern বাল-গোপালের ছবি।

২৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩২৫

প্রবাসী শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আসল' পদ্যগল্প—একটা স্মৃতির চর্চা। বর্ণনা Realistic। আট বছর বয়সের ভূমিকা, যাট বছর বয়সের উপসংহার। সম্বন্ধটা ক্ষীণ-অস্পষ্ট। ছন্দটা বড় দুরূহ। একটু একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—

'যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।'

ইহার উপর আর কথা চলে না। বাঙ্গালা দেশে কবির ভাগ্যে 'নোংরা' সমালোচন একেবারেই ফলে নাই, এমন কথা আমি বলিতে না পারি, কিন্তু ইহাও স্থির যে, এত অ-নোংরা, শুচি, সমালোচন এ দেশের কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। এত স্তুতি, এত স্তব, এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, এত অল্প সমালোচনা, এত স্তাবকের হনুকরণ ও সমালোচকের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন্ কবি লাভ করিয়াছেন? 'তবু ভরিল না চিত্ত?' বাঙ্গালী যে 'রাজা ও রাণীর' মত ক্রমাগত বলিতেছে—'একান্ত তোমারই আমি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশের ভালবাসায় অত্যন্ত অবিশ্বাসী। অতএব, এ ক্ষেত্রে ভাল দিকটা বলিয়াই উপসংহার করি—'আসলে'র একটি উপমা বড় সুন্দর। পাগল মেয়েটিকে কাঁধে তুলিয়া লইল। কবি উপমা দিয়াছেন—

'ভোলানাথের জটায় যেন ধুত্‌রো ফুলের কুঁড়ি।'

রবীন্দ্রনাথ উপমার রাজা।

২৮শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩২৫

ভাণ্ডার শ্রাবণ

প্রথম-[শ্রাবণ] সংখ্যার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সমবায়' নামক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সমবায়ের আবশ্যকতা, উপযোগিতা ও বর্তমান কালের জীবন যুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে তাহার অপরিহার্যতার কথা বাঙ্গালীকে সহজ সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, —'এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড় হইয়া উঠিবে। ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়, ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক জায়গাতেই বড় হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড় টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায় প্রণালীতে, চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড় হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড় হইবে।' রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিয়াছেন,—'আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সংগে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া।' অর্থাৎ, দেশের কাজ করিবার সর্বপ্রধান সাধন 'সমবায়'। সেই সমবায়ের প্রচারে ভাণ্ডারের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সাহায্য পাইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩২৬

ভারতী চৈত্র

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় 'সুসময়' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ভ্যাংচাইয়া সুখী হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'হনুকরণ' স্মরণে বাধ্য হইয়াছি।

২৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

ভারতী বৈশাখ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'মিসটিক কবি' নামক প্রবন্ধটি মিস্‌টিক্ বটে। ইহা 'সূক্ষ্ম জগতের কথা'......এক স্থলে দেখিতেছি, 'Mysticism আর এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আর-এক জগতের কথা নয় যতখানি আর-এক জগতের ভঙ্গিমার কথা বলা।' 'আর-এক-জগৎ' আছে তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু সে জগতের 'ভঙ্গিমা' কি, তাহা এ জগতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে বিষয়েও বোধ করি, এই মতান্তরের দেশেও মতান্তরের সম্ভাবনা নাই। 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,' তাঁহার দেশের 'ভঙ্গিমা'ও বোধ করি অজ্ঞেয়। পরকালের 'ভঙ্গিমা'ও নিশ্চয়ই মূকাস্বাদনবৎ। লেখক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন।' আমরা জানিতাম, এ পারের পরে ও পার, ইহলোকের পর পরলোক, ঐহিকের পর-পারে আধ্যাত্মিক, এবং অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রনাথ ও পারের কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন, বা বলেন, এ আবিষ্কার নিশ্চয়ই মৌলিক।

প্রবাসী বৈশাখ

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসুর 'রেণু' রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত পদ্য গল্প। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর রচনায় শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'অন্যে পরে কা কথা।'

২৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩২৬

ভারতী আষাঢ়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-বর্জন উপলক্ষে 'বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে' কবিতায় যে 'নীরব নিবেদন' করিয়াছেন, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার যোগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাই বাঙালার ভাবের একমাত্র পুষ্পাঞ্জলি। কবির কষ্টকল্পিত মুদ্রাদোষে কবিতাটি মাটি হইয়াছে। ইহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে কিন্তু কবিত্ব নাই। ঘটনাটি যেমন জাতির জীবনে চিরস্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনাথের এই ভক্তির দান সাহিত্যে তেমনই চিরস্মরণীয় হইবে এমন আশা করা যায় না।

প্রবাসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 'গানে' হেঁয়ালি আছে, বিশেষত্ব নাই।

'শ্রীঃ' 'রাজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা ক্রমে তপোবন হইয়া উঠিতেছে। এখানকার সাহিত্যও গেরুয়া পরিয়া হিমালয়ে চলিল। 'বুড়া বয়সের আর বাকী কি?' বাঁচিয়া আর সুখ কি?—একদিকে সচল আয়তনের ভেকধারীরা চামর ঢুলাইয়া কামায়ন গান করিতেছে; আর এক দিকে নাটিকা, কবিতা, টপ্পা প্রভৃতি জটাবল্কল ধারণ করিয়া 'যৌবনে যোগিনী' সাজিয়া আসরে আসিয়া 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' স্মরণ করিতে বলিতেছে। 'সামঞ্জস্যের কথা' কহিতে পার কিন্তু সামঞ্জস্য হয় না। রচনাটির প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে যথেষ্ট লিপিচাতুরী আছে, 'মানুষের জীবনের সঙ্গে বিশ্বের একটা যোগ—তাহার আনন্দ এবং তাৎপর্য' আছে, কিন্তু লেখক সে আনন্দ ভোগ করিবার অবকাশ দেন নাই, সে 'তাৎপর্য' ধর্মের তত্ত্বের ন্যায় 'নিহিতং গুহায়াম্।' ইহার কারণও সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বলিতেছেন,—'ফুল বেল পাতা আমি ছিঁড়িতে পারি, চটকাইতে পারি, খাইতে পারি, মাখিতে পারি,—কিন্তু এমন করিয়া বসন্তকে পাইব না।' নিশ্চয়ই 'সবুজ পাতা'।

রবীন্দ্রনাথের 'বাতায়নিকের পত্র' তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমরা পড়িতে, মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথের এই যুগধর্মের বিশ্লেষণ ও সনাতন মানব-ধর্মের নির্দেশ—তাঁহার কম্বুকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত এই ভারতবাণী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিবে। ইহা ইউরোপের পথেও মহৌষধ, এশিয়ার পক্ষে ও আমাদের পক্ষে মৃত সঞ্জীবনী সুধার কাজ করিবে। ইউরোপ যদি তাহার ভাবনা না ভাবে, বর্তমানের মোহে ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা যেন বর্তমানের আলোকে আমাদের অবস্থার বিচার করিতে পারি, অবস্থার মত ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতের পথে প্রবর্তিত হইতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বাতায়নিকের পত্রে সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র ক্ষুদ্র সমালোচনায় 'অহং' ও 'সোহহং' এর আমদানী করিয়াছেন। সমালোচকের শক্তি যে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী', তাহারই প্রমাণ; এবং বলা বাহুল্য, ইহাও উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূতন কিছু করো' বাঙ্গালার নবীন ভাবুকদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় হয়। জয়দেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। ভারতচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার আধ্যাত্মিক ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম 'ঐথরিক' ব্যাখ্যা হিমালয়ের মত উচ্চ হইয়া যোড়াসাঁকো ও বোলপুরের মধ্যে 'স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।' তাহার উপর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ত কলির সন্ধ্যা।

অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধ্যাত্মিক উপন্যাসের অন্ততঃ উপন্যাস-বিশেষের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ফ্যাশন হইয়া উঠিবে।

২৯শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩২৬
প্রবাসী শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্তার ভূত' নূতন ধরণের রূপক। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের কর্তার ভূত আমরা উদ্ধৃত করিলাম। (সম্পূর্ণ 'কর্তার ভূত' উদ্ধৃত)

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

শ্রীকাজি নজরুল ইস্‌লাম বঙ্গ-বাহিনীর একজন হাবিলদার। ইনি করাচীর সেনানিবাসের কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও মাতৃভাষাকে স্মরণ করিয়াছেন, মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদ্য-গল্পগুলি পড়িয়াছেন, এবং তাহার অনুকরণে 'মুক্তি' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী সৈনিক-শিবিরে যে ভাষার সাধনা করিতেছেন, সে ভাষার আশা করিব না? অনুকরণ সম্পূর্ণ সফল হইলেও অনুকরণ। এ অনুকরণ সর্বাংশে সফল হইয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু একজন নব-ব্রতী মুসলমান রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাষার এতটা সন্নিহিত হইয়াছে, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

২৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩২৬
সবুজপত্র বৈশাখ

'সবুজপত্র'র পুনরাবির্ভাবে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। নূতন উদ্যমের প্রথম সংখ্যা চিঠিতেই প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির ইতিহাস' আমরা উদ্ধৃত করিলাম। (সম্পূর্ণ কথিকাটি উদ্ধৃত)

২৯শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
কার্তিক ১৩২৬
সবুজপত্র আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথের 'কথিকা' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।
(সম্পূর্ণ কথিকাটি উদ্ধৃত)

২৯শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৩২৬

প্রবাসী অগ্রহায়ণ

রবীন্দ্রনাথের 'শিবনাথ শাস্ত্রী' হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম,—'শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে: সেটি তাঁহার প্রবল মানব বৎসলতা। মানুষের ভালমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব বড় শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্য-নীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল, এই জন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন বাজার দরের কষ্ঠিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোট ও বড়, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জ্বল ও সজীব ছিল, কোনো ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন—মানব বাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁর মনে কেবলি জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর মিলন হইয়াছে সেখানে তার নানা ছোট বড় কথা নানা ছোটবড় ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মত তাঁর মনের মধ্যে তাজা থাকিয়া গেছে।' রবীন্দ্রনাথের 'একটি চাউনি' ও 'একটি দিন' উপভোগ্য।...রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসবে' তাঁহার উক্ত-নামধেয় নাটকের 'ভিতরের কথাটি' বুঝাইয়াছেন। স্টেড নিজে তাঁহার নিজের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইহা নূতন। (১) 'বাংলা কথ্যভাষা', (২) 'উদ্যোগশিক্ষা', (৩) 'শারোদৎসব', (৪) 'প্রতিশব্দ', (৫) মিলনের সৃষ্টি, (৬) 'বিদ্যাসমবায়', (৭) 'শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আচার্যের উপদেশ', (৮) 'অনুবাদচর্চা', (৯) 'তেল আর আলো', (১০) 'মনোবিকাশের ছন্দ', (১১) আহারের অভ্যাস' ও (১২) 'শীলগ্রহণ' রবীন্দ্রনাথের রচনা, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের 'শান্তিনিকেতন' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; অগ্রহায়ণের 'প্রবাসীতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী' সুতরাং 'শান্তিনিকেতনে'র দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইয়াছে।

৩০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩২৭
প্রবাসী চৈত্র

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যবিচারে' সংক্ষেপে তাঁহার ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।' মম্মটের সেই পুরাতন কথা মনে পড়িল,—'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।' সন্দীপের মত 'ন প্রবর্ত্তিতব্যম্' 'ঘরে বাইরে' শেষ করিয়া পাঠকের মনে ইহা জাগে কি না? সন্দীপ যে আদর্শ চরিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে, এক প্রকার স্পষ্টভাবে গতানুগতিক বাঙ্গালীকে তাহা বলিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ভারতী

'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন' ছদ্ম-নামে আত্মগোপন করিয়া ফুটনোটে বরাত দিয়াছেন,—'মাঘের "নারায়ণে" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।' অর্থাৎ, আমি আড়ালে আছি, আবডালেই থাকিব, কিন্তু যাহাকে 'বিকর্ণ' অর্থাৎ কান-কাটা, ঘণ্টাকর্ণ, গৃধ্র, কীট, বলদ-ধুরন্ধর বলিতেছি, তাহার পরিচয়টা তোমরা জানিয়া রাখ। 'শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে করলে শুধু কীটপণা'—পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নবকুমার কবিরত্ন! তুমি যে শীলতা, ভব্যতা, সভ্যতা ও কবিতা 'ফেঁড়ে ফেঁড়ে করলে বিষম বীরপণা' সে বিষয়েও ত কোন সন্দেহ নাই।—নবকুমার ঘোমটা দিয়া আত্মগোপন করিলেও লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। অন্তত আমরা চিনিয়াছি, এবং মর্মাহত হইয়াছি। বড় রত্ন সহবত, শিক্ষা, দুর্লভ নর-জন্মে সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ কবি —এ সকলও কি তরজা-ওয়ালা সাজিয়া প্রতিপক্ষকে শকার-বকার করিবার প্রলোভন হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না? 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' বুঝিবার কান যাহার নাই, সে যদি বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ হয়, তাহা হইলে যাহারা আত্ম-গেপন করিয়া সাহিত্যে খেউড়ের আমদানী করে, তাহারা কি? রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বুঝিয়াও যাহাকে বিনামার আচ্ছাদনে আত্মগোপন করিয়া এমন কুকর্ম করিতে হয়, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? রবীন্দ্রনাথের ছন্দ যাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, সে ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু কাপুরুষ হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের যুগে, তাঁহার সমক্ষে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে, তাঁহার ভক্তের পক্ষে

যদি এমন অনাচার সহ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের সাধনা ব্যর্থ হইতেছে,—'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের কবি, ভাবী বাঙ্গালার কবি, বর্তমানে অন্তত তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্ত-মণ্ডলীর পক্ষে তাঁহার বিপুল শক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। বিধাতা কি এইরূপ খেউড়-সাহিত্যের ভিত্তি করিবার জন্যই বাঙ্গালীকে রবীন্দ্র-সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলাম।—রবীন্দ্রনাথের পর কি আমরা ত্রিবিক্রম ও কবিরত্নকে লইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব? ভক্তি কি ভক্তকে ভক্তি-ভাজনের ভাবে, অনুপ্রাণিত করে না? 'তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং তদুপাসনমেব'—সাহিত্যের তপোবনে সাধকের মূলমন্ত্র নহে? দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত, স্বর্ণকুমারীর অর্চিত, রবীন্দ্রনাথের পুষ্পাঞ্জলি-পূত 'ভারতী'তেও ইহা দেখিতে হইল। যে চতুর্দশপদী কবিতা উপলক্ষ করিয়া ত্রিবিক্রম তরজায় বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধের সূচনায় লিখিয়াছেন,—'হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, "ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে **পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম।** পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।' সে ক্ষেত্রে 'ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছিল', এ ক্ষেত্রে রোষ ও আক্রোশ পচা, ধসা গলা ঘায়ের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে।—এ রোগ সংক্রামকই বটে। অধিকন্তু যত সংক্রমিত হয়, ততই বীভৎস ও মারাত্মক হইয়া উঠে। সংসারে ত্রিবিক্রমের দল দুহাতে ছড়াইতে পারে, ছড়াইয়াও থাকে; কিন্তু প্রতিভাশালী নবকুমার কবিরত্ন,—তুমিও? আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে?

৩০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
নবযুগ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ

শ্রীহট্ট কলেজের ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার সারমর্ম 'আকাঙ্ক্ষা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, বুড়োদের উপর বাঁধা হুকুম রয়েচে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে।

নকীব হাঁকচে, সরে যাও, সরে যাও। কেন রে বাপু, ষাট পঁয়ষট্টি বছরের পাকা আসন ছাড়ব কেন? ঐ যে আসচেন মহারাজ, ঐ যে কুমার, ঐ যে কিশোর। ভগবান কেবলি ফিরে ফিরে তরুণকে মর্ত্ত্যের সিংহাসনে পাঠিয়ে দিচ্চেন। তার কি কোন মানে নেই? তার মানে এই যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পিছনে বাঁধা পড়ে থাকতে দেবেন না। নূতন মন নূতন শক্তি বারে বারে নূতন করে তাঁর কাজ আরম্ভ যদি না করে, তাহলে অসীমের প্রকাশ বাধা পাবে। অসীমের ত জরা নেই। এই জন্য বুদ্বুদের মত জরা কেবলি ফেটে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীর কোল জুড়ে তরুণ ফুলের মধ্যে তরুণ প্রভাতের আলোয় দেখা দেয় তরুণের দল। ভগবান কেবল নূতনকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকচেন, আর তারা দলে দলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর করে তাদের জন্য দ্বার খুলে দিচ্চে।' দেহের জরা মনকে জরাজীর্ণ করিতে পারে না। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ মনে নবীন—তিনি তরুণের তারুণ্য দিয়া ভবিষ্যতের ভাগ্য গঠন করিবার আদেশ দিতেছেন।

আঙুর

বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের একটি 'কথিকা' আছে। আমরা উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ছেলে-মেয়েরা এ রূপকের রস ভোগ করিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে, ইহা তাহাদের মা-বাপদের পক্ষে অত্যন্ত সুপথ্য। তাই আজ উল্টা-রথের দিন রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' বহু প্রচারের জন্য আবার ছাপিয়া দিলাম.—(কথিকাটি উদ্ধৃত।)

পরিশিষ্ট

১। ২য় বর্ষে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনপ্রণালী সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনা।

২। সমালোচনা-সাধনা

৩। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা

৪। নব বঙ্গদর্শন

৫। নব বঙ্গদর্শন

৬। সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনা

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, সুরেশচন্দ্রকে লেখা

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, সুরেশচন্দ্রকে লেখা

৯। পূর্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রবাবুর পত্র সম্বন্ধে শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতির বক্তব্য

১০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পত্র

পরিশিষ্ট

১

(২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদন প্রণালী সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনা।)

প্রথম বর্ষে "সাহিত্য" পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি, সাহিত্যের উন্নতিসম্পাদনের জন্য, আমরা যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু, প্রথম বর্ষে, আমাদের যাহা আশা ছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। আমরা অনেক বিষয়ে নিরাশ্বাস হইয়াছি, "সাহিত্য"কে সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমাদের মনের মত করিতে পারি নাই। কিন্তু বার বার নিরাশ হইয়াও আমরা আশা ছাড়িতে পারি নাই। তাই দ্বিতীয় বর্ষেও "সাহিত্য" লইয়া, সাহিত্য সংসারে প্রবেশ করিতেছি।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মহোদয়গণের অনেকে দ্বিতীয় বর্ষে সাহিত্যে লিখিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অনেক নবীন লেখক, উৎসাহ সহকারে "সাহিত্যের" উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইবেন, আশা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অনুগ্রহে ও উৎসাহে, আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়াছি। এখন এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমরা এই গুরুতর কার্য নির্বাহ করিবার জন্য, চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করিব না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জন্যই "সাহিত্যে"র জন্ম হইয়াছে। প্রথম বর্ষের সূচনায় আমরা লিখিয়াছিলাম,--"জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।" এই উদ্দেশ্য লইয়া, আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে আবার সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"সাহিত্যে" যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে সমুদয়ের মতামতের নিমিত্ত, কেহ যেন সম্পাদককে দায়ী না করেন। লেখকগণের মতামতের সহিত সম্পাদকের মতের সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, প্রবন্ধ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেই, তাহা সাদরে "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইয়া থাকে।

আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও নবীন মতের সম্মিলন এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় হইব। কর্তব্য কার্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে হয়। সামাজিক ও অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে যদি কেহ স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ মতবাদ দেখিতে পান, আশা করি সেজন্য আমাদের অপরাধী করিবেন না। নিরপেক্ষভাবে সকলের মতামত প্রকাশ করাই সম্পাদকের কর্তব্য। এ বিষয়ে কোনও সম্পাদকই সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষের সঙ্কীর্ণ

গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধে হইলেও, যে কোনও আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইবে। যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা সাহিত্যের উপকার আশা করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হইব না। এ জন্য যদি আমরা কাহারও অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করি, আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আমাদের ক্ষমা করেন।

বাঙ্গালার প্রতিভাশালী প্রবীণ আচার্যগণের পদবীর অনুসরণ করিয়া, আমরা সাহিত্য সেবাব্রত গ্রহণ করিতেছি। সেকালের লেখক মহাশয়গণের অনুগ্রহে ও একালের নবীন লেখকগণের উৎসাহে, "সাহিত্য" আমাদের জাতীয় ভাব-প্রবাহের সঙ্গম হউক। আমাদের পূর্বাচার্যগণের অনুকম্পায়, একালের নবীন ভাব ও মত, সেকালের ভাব ও মতের কিরণে বিকশিত হইতে থাকুক; সকলের সমবেত চেষ্টায়, আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রভায় পূর্ণ ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক।

২

সমালোচনা সাধনা

মাসিকপত্রিকা;

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত

সাহিত্য ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১২৯৮

আমরা সাদরে "সাধনার" আবাহন করিতেছি। পত্রিকার আকার প্রকার অতি সুন্দর ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বলা যাইতে পারে। সাধনার প্রথম সংখ্যায়, বিলক্ষণ নূতনত্ব আছে, নানাবিধ প্রবন্ধের সমাবেশে বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। অমারা সর্বান্তঃকরণে, সাধনার উন্নতি ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি কামনা করি।

আমরা রবীন্দ্রবাবুর "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি; উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভভাগ, অতি মনোরম, বেশ স্বাভাবিক! ইহার প্রাঞ্জল ভাষা, সরল প্রণালী ও সহজ অলঙ্কারে, গল্পটিকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। আদুরে খোকার খামখেয়ালী মেজাজ কেমন স্বাভাবিক। কিন্তু যখন রাইচরণ নিজের বড়ো খোকাটিকে, মুন্সেফ বাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে, তখন আমাদের কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মুন্সেফ বাবু যেন গল্পটি সমাপ্ত করিবার জন্যই, সন্দেহ সংশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের ছেলেটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এইজন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।

আমরা সেদিন একখানি বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম, রুসিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাউন্ট টলস্টি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—একজন প্রকৃত ভালো লেখকের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ কিছু ভালো বলিবার থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ, তাহা ভালো রকমে বলা চাই, তৃতীয়তঃ, অন্তরের সহিত বলা চাই। ডিকেন্সের এই তিনটি গুণই ছিল। থ্যাকারের বলিবার বিষয় বড় বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; কিন্তু তাঁহারও আন্তরিকতা ছিল না।" রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারও শেষ দুটি গুণ যথেষ্ট আছে. তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার; তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।

"ঋতুসংহারের" সমালোচনা আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে। ইহাতে আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই; লেখক, সরলভাষায়, ঋতু সংহারের সৌন্দর্য বেশ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন।

"প্রাণ ও প্রাণী", বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তব্য বিষয় তিনি সরল ভাষায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"সোরাব ও রোস্তম" নামক গল্পটি একটি ইংরাজী কবিতার ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এ গল্পটিও আমাদের ভালো লাগিল না। মূল কবিতায় স্ত্রী চরিত্রের অস্তিত্ব নাই, লেখক তাহা স্বয়ং উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন খাপছাড়া হইয়াছে। ম্যাথু আর্ণল্ডের প্রতিভাকে ভিত্তি করিয়া, তাহার উপর নূতন সৃষ্টি করা, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় বড় যুক্তিসঙ্গত নহে। লেখককে বড় সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, বোধ করি এইজন্য তাঁহার ভাষাও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। চর্বিতচর্বণের দৌরাত্মে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। এ অবস্থায়, ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের শরণ গ্রহণ বড় মন্দ কথা নহে, বরং আশাপ্রদ। আমরা আশা করি, সোরাব ও রোস্তম লেখক এবার অকৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া এ পথ পরিত্যাগ করিবেন না। কেন না, তাঁহার ব্রতই সাধনা।

"সাময়িক সার সংগ্রহ", বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই প্রবন্ধের লেখক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অল্পের মধ্যে কেমন করিয়া লিখিতে হয়, তিনি তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইহাতে, নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহে যেরূপ দক্ষতার প্রয়োজন, লেখক তাহার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। এই সকল সংগৃহীত সংক্ষিপ্তসারের উপর লেখকের নিজের সমালোচনা আছে। তাহাতেও বিশেষ সংযম ও সমীচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি," এই সংখ্যার আর একটি মনোজ্ঞ বিষয়। কিন্তু এত

অল্প যে, পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। আমরা আশা করি, বারান্তরে ডায়ারি একটু অধিক করিয়া প্রকাশিত হইবে।

সাধনায় একখানি ছবি আছে,—স্বপ্নপ্রয়াণ। চিত্রখানি ভাল হয় নাই, আর বাঙ্গালা দেশে এখন চিত্রশিল্পের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইহা অপেক্ষা ভালো ছবিও বোধ করি অসম্ভব।

"সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনায়," ভারতী, নব্যভারত ও আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আছে। লেখক, মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "শিক্ষিতা নারী"র সমালোচনায় বলিয়াছেন—"প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে। অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।

* * * যিনি প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য।"

আমাদের বোধ হয়, লেখকের মত এই যে, মেয়েদের বাহিরে কার্যক্ষম করিবার উপযোগী শিক্ষা না দিয়া তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে জগতের জননী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু কথা এই যে, জননীর উপযুক্ত শিক্ষা দিতে গেলে কেবল নাটক নবেল পড়াইলে চলিবে না। অবশ্য দু-একটি গুরুতর বিষয়েও শিক্ষা দিতে হইবে এবং সেই সংগে তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু একটা বড় বিপদের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু অনুশীলিত হইলে, তাঁহারা আমাদের চিন্তাশীল লেখকের সাহায্য ব্যতীতও নিজেদের জন্য ভাবিতে ও কাজ করিতে শিখিবেন। পৃথিবীর আরম্ভ হইতে এতদিন ভাবুক লেখকেরা যে পথ দেখাইয়া আসিয়াছেন, সেই পথের উপর তাঁহাদের বড় বিশ্বাস থাকিবে কি না, সে বিষয়েও আমাদের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন হয়ত কাঁচিয়া বসিয়া আমাদিগকে পুনর্বার বলিতে হইবে,—"জগতের এই দুর্বিসহ ভার বহন করা তোমাদের কাজ নয়।" এইরূপ কঠিন ন্যায়শাস্ত্রের বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে, অবশেষে আমাদিগকে মহাস্ত্র পাশবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আর একটি কথাও মেয়েরা বলিতে পারেন—"তোমরা নানা রকম শিক্ষার ও কার্যের ভিতর থাকিয়াও তোমাদিগের পুরুষত্ব হারাও না, আর আমরা বাহিরে গেলেই আমাদিগের কোমলতা, সহৃদয়তা, সন্তানপালন প্রভৃতি সবই নষ্ট হইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য। এ ন্যায়টুকু পুরুষদিগের একচেটে। তোমরা যদি বল, সভ্যতার খাতিরে তোমাদিগের শিক্ষা দরকার, আমরাও বলি, সভ্যতার খাতিরে আমরাও সমাজে একটুকু পা ছড়াইবার জায়গা পাইতে পারি।" যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের চিন্তাশীলা লেখিকার মত কি, আমরা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।
সাহিত্য ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন ১৩০১

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। শ্রাবণ, ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি নূতন প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" হইতে একখানি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইবে শুনিয়া আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পর্বতের মূষিক প্রসব দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিকের নিকটস্থ হওয়া দূরের কথা, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা একখানি চতুর্থ শ্রেণীর পত্রের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছে। এ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি? বিগত ১০ই ভাদ্র তারিখে এই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অথচ পত্রিকায় মুদ্রিত আছে, "শ্রাবণ, ১৩০১।" ১৩০১ সালে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু শ্রাবণ মাসে নহে। "শ্রাবণ" না লিখিয়া "ভাদ্র" লিখিলে এমন কি ক্ষতি হইত? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালার অনেক বড়লোক যোগ দিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস্, সি-আই-ই; যে সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহার সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে পত্রের সম্পাদক, তথায় এরূপ ব্যবহার শোভা পায় না। মিথ্যা যতই সামান্য হউক; তাহা সর্বথা ঘৃণার্হ। এই সংখ্যায় "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" নামক সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার পূর্বে একবার আলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভায় পঠিত হইয়াছিল। বোধ হইতেছে, সভায় পঠিত হইবার পূর্বে ইহা পুস্তিকাকারেও আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমরা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হইতে "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" পুস্তক কিনিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি,—আমাদের পূর্বশ্রুত ও পূর্বপঠিত সেই প্রবন্ধটি "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা"র পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে,—কিন্তু এই পুনর্জন্মের পূর্বে যে ইহা আরও দুই অবতারে দুই আকারে ইতিপূর্বেই বাংলা দেশে প্রকটিত হইয়াছিল,—পত্রিকার কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। একি ব্যাপার? অনেক সময়ে লেখকগণের দোষে সম্পাদকগণকে এরূপ বিপদে পড়িতে হয় সত্য, কিন্তু এ স্থলে যিনিই লেখক তিনিই সম্পাদক। সম্পাদক জানিয়া শুনিয়া একবার পুস্তকাকরে প্রকাশিত নিজের প্রবন্ধটি, স্বীকার না করিয়া কেমন করিয়া পত্রস্থ করিলেন? সম্পাদককে একজন সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক বলিয়া জানি,—তাঁকে এইরূপে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চক্ষে ধূলা দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যিনি

সম্পাদক হইয়া নিজে এমন কাজ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর কি বলিব, সাহিত্য-পরিষদের "কার্যনির্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন, " নিয়মাবলীতে একথা লিখিত আছে। তাঁহারাই বা কিরূপ তত্ত্বাবধানে করিতেছেন" এরূপ সাহিত্য সভা এদেশে নূতন। সুতরাং সভার কার্যনির্বাহকগণের সমুচিত সাবধানতা আবশ্যক। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে,—সম্মুখস্থ পত্রিকাখানি দেখিয়া মনে হইতেছে,—সাহিত্য-পরিষদের সাবধানতা দূরে থাক, দায়িত্ববোধও বড় অল্প। যদি পরিষদের কার্যনির্বাহকগণের দায়িত্ব বোধ থাকিত, তাহা হইলে; বিশমোল্লায় এত গলদ হইত না। মোটের উপর, পত্রিকাখানি বিফলতা ও অক্ষমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র দেদীপামান দৃষ্টান্ত।

৪

সাহিত্য ১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৩০৮

নব বঙ্গ-দর্শন

উল্লেখ

"সাহিত্য" পত্রের প্রচলিত প্রথানুসারে, ইহাতে কতকগুলি মাসিকপত্রের অল্পাধিক উল্লেখ আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু গত বৈশাখ হইতে যথারীতি বাহির হইতে থাকিলেও, এই কয় মাস কালের মধ্যে একটিবারও 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় "নব বঙ্গদর্শনের" বা বঙ্গদর্শনের অভিনব আবির্ভাবের উল্লেখমাত্রও করা হয় নাই: এবং অপরাপর পত্রের ন্যায়, প্রতিমাসে উহার মাসিক সংখ্যার অভ্যর্থনা ও আলোচনা করা হয় না। ইহার কারণ কি? যে পত্র সুপরিচিত পুরাতন নামে আত্মপরিচয় দিয়া, লোকের মনে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরস্মরণীয় স্মৃতি ও বঙ্কিম-প্রমুখ লেখকবর্গের প্রতিষ্ঠা প্রভাবিত করিয়া, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথবাবুর রজত-রশ্মি-রাগের 'রোশনি'তে পুলকিত হইয়া প্রত্যাগত, পুনঃসমুদিত ধূমকেতুবৎ সাহিত্যাকাশে ভাসমান, সেই "নব বঙ্গদর্শনের" এতাবৎকাল আবাহন ও আরতি না করিবার কারণ অবশ্যই জিজ্ঞাস্য।

কিন্তু "সাহিত্য" কর্তৃক নব বঙ্গদর্শনের সাদর সম্ভাষণ ও পূর্বরাগ-উচ্ছ্বসিত নবীন মিলনের প্রীতি-রসাচ্ছাদিত পূর্ণালিঙ্গন না হউক, অন্ততঃ মামুলি মাসিক সমালোচনার 'সাহিত্যিক' 'করমর্দন' (অবশ্য এ যাবৎকাল) না হইবার যে কয়েকটা কারণ অবিমিশ্র অনুমানে আত্মশরীর গঠিত করিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত ভ্রান্ত। গভীর 'বাজার-গল্পের' উর্বর ইথরে উত্থিত কতিপয় জনশ্রুতির একটি এইরূপ যে, "নব বঙ্গদর্শন" এতই উচ্চাদর্শ উচ্চে অবস্থিত ও অভ্রান্ত, উন্নত, অনন্যতন্ত্র চিন্তার আধার, এমনই অতলস্পর্শী গভীর ও উদার সদ্ভাবের ভাণ্ডার, পরন্তু উহা পুটপাকের

এতাদৃশ প্রগাঢ় রসে পরিপূর্ণ এবং এতই ক্ষীর, সর, সারের গুরুভার গৌরবে সমন্বিত যে, উহার নিকটবর্তী হওয়া, এমনকি, উহার নিম্নতর কাণ্ডের "নাগাল" পাওয়া সামান্যের সাধ্যাতীত। অপিচ, উহার উচ্চতর চূড়ায় আরোহণ করা অসাধারণের পক্ষেই সুদূর পরাহত। অতএব "নব বঙ্গদর্শনের" সমুন্নত সন্দর্ভাবলী বুঝিয়া ও বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের সমালোচনা করা "সাহিত্যের" মত ক্ষুদ্র সমালোচকের সংকীর্ণ ও যৎসামান্য শক্তিতে সম্ভবে না। সমালোচনার নিম্নাধিকারী "সাহিত্য" সে বিপুল বেয়াদাপিতে প্রবৃত্ত না হইয়া সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে, আবার উহার ঠিক বিপরীত উক্তিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। এবং সে উক্তিও যুক্তি-সঙ্গতিতে নিতান্ত গোত্রহীন নয়। সে উক্তিটা এইরূপ যে, "সাহিত্য" সাহঙ্কারে "নব বঙ্গদর্শন"কে এতই সামান্য ও নগণ্য মনে করে, এমনই অগ্রাহ্য ও অবহেলা করে যে, অবিচলিত উপেক্ষায় তাহার নামটিও কখনও উচ্চারণ করে না ও করে নাই। পুনশ্চ, এমন অভিযোগও উঠিয়াছে যে, যে হেতু "নব বঙ্গদর্শন" সাহিত্যের অভিনব প্রতিযোগী; প্রবল ও অসামান্য ক্ষমতাশালী, অতএব "সাহিত্য" উক্ত পত্রকে আপনার সমালোচ্য অপরাপর পত্রের মধ্যে 'দশজনের এক জন' করিয়া তুলিয়া তাহার বেখরচা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করাটা ব্যবসায়ের ব্যাঘাতজনক বলিয়াই সে কার্য করে নাই!

বলা বাহুল্য, এবং অগ্রেই বলিয়াছি যে, জনশ্রুতির এই সকল অযথার্থ উক্তি, যুক্তিতর্কের বর্ণরাগে যতই উজ্জ্বল প্রতিভাত হউক, আদৌ ভিত্তিহীন। "সাহিত্যের" নিকট "নব-বঙ্গদর্শন" নিশ্চয়ই সামান্য, নগণ্য ও নিতান্তই তৃণবৎ তুচ্ছ নহে; পরন্তু, দুরারোহ, দুরবগাহ, দুরন্তও হইতে পারে না। উহা অন্যান্য মাসিক পত্রের ন্যায় "সাহিত্যের" সুযোগ্য সহযোগী রবিবাবুর সম্পাদিত অতীত "বালক" ও "সাধনা"র মত আর একটি সাময়িক তরঙ্গ। অতএব তদ্বৎ অর্চিতব্য ও আলোচ্যই বটে।

নব বঙ্গদর্শন উহার পৌরাণিক স্মৃতিতে সাহিত্যের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতমেরও জ্যেষ্ঠতম হইলেও, অদ্যকার এই রবি-রশ্মি-যুত নবানুরাগে নিশ্চয়ই কনিষ্ঠ বটে; এক আধ দিনের নয়, একাধিক দশ বৎসরের। অতএব সমাদরেই "সাহিত্য" এই নবীন সহযোগীকে সাহিত্য প্রাঙ্গণে সমাহ্বান করিয়া সুখী হইতেছে।

বঙ্গদর্শনের এই পঞ্চম পরিণতি বা তৃতীয় পুনর্জন্ম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের অবশ্যম্ভাবী কর্মফল। কেন না, 'কর্ম-ফাঁস' থাকিলেও 'ভোগশেষ' না হইলেই না "পুনর্জন্ম" হয়? পুনর্জন্মবাদ অঙ্গীকার করিলে কৃতাকৃত-কর্মজনিত ও প্রারব্ধ সঞ্চিত ফলভোগের স্বীকার অগত্যাই করিতে হইবে; নহিলে পৌনঃপৌনিক জন্ম-মৃত্যুর পরিক্রমণ সম্ভবে না। কর্মফল নিবন্ধই জীব 'জঠর-যাতনা' ভোগ করে, পুনঃপুনঃ জন্মে ও মরে। বঙ্গদর্শনের জীবাত্মা কি তবে সাময়িকপত্ররূপে সময়ে সময়ে উদিত ও বিলীন হইয়া, জন্মমৃত্যুর যোগ-বিয়োগে বারবার 'কর্মভোগের' ভার-

বহন করিতেছে; এবং পর্যায়ক্রমে মৃত্যুর বিড়ম্বনা ও জঠর-যাতনার বিষয়ীভূত হইতেছে।

তবে, 'গরজ বড় বালাই' বটে। যে গরজে পড়িয়া পরস্পর আকাশ-পাতালের ন্যায় প্রভেদবিশিষ্ট পৃথক পৃথক পত্র ও পাত্রকে "বঙ্গদর্শন" বলিয়া,—কেবল "বঙ্গ-দর্শন" নয়,—বঙ্কিমচন্দ্র চিহ্নিত, চালিত ও পালিত, বঙ্কিমের অক্ষুণ্ণ ও অবিকল আভা প্রভা বিভায় বিম্বিত "বঙ্গদর্শন"—ঘনীভূত বঙ্কিম-বৈভব-সঞ্চিত "বঙ্গদর্শন" বলিয়া, একই সূতায় বাঁধিবার, একই গুণে ও গোত্রে গাঁথিবার, প্রস্তাব ও প্রয়াস হইয়াছে, সে গরজের গা-খানা যে খুবই খোলসা দেখা যাইতেছে! তাহার গায়ের 'কুরতী'টা, কতক গরদের ও কতক গর্ণেটের পুরাতন বস্ত্রখণ্ড সস্তা ভাবুকতার ও কাব্যের কাঁচ কথার কৃত্রিম সুতায় "যো সো করে" যুক্তিতর্ক শেলাইয়া কোনও গতিকে 'গা-ঢাকা' গোছ করিয়া লইবার চেষ্টা হইলেও, সেটাতেও সুবিধা হয় নাই। শাফইত সর্বাঙ্গে দেখা যাইতেছে তবুও সেটা না দেখাই ভাল। যাহা অসঙ্কোচে দেখা যায় না, যাহা দেখিতে স্বভাবতঃ বা শিষ্টসমাজের চিরাভ্যস্তপ্রথাবশতঃ লজ্জাশীলতায় আঘাত লাগে সে দৃশ্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে চক্ষু বুজিয়া থাকাই বিধেয়।

বঙ্কিমবাবু নিজেই বঙ্গদর্শনকে "জলবুদ্‌বুদ" অভিধানে অভিহিত করিয়াছিলেন। উহার নূতন অধিনায়ক রবিবাবুও সেই প্রসঙ্গে "বুদ্‌বুদ" শব্দ পুনরুক্ত করিয়াছেন। "জলবুদ্‌বুদে"র 'জের' কোথায়? বুদ্‌বুদ বিলয়কালে অপরের উত্তরাধিকারের জন্য আপনার অবশিষ্ট কিছুই ত রাখিয়া যায় না। নিজস্ব নিজের সঙ্গে লইয়াই বারি-বক্ষে বিলীন হয়। অতএব এই আলঙ্কারিক হিসাবেও নববঙ্গদর্শনকে বিগত বঙ্গ-দর্শনের 'জের' বলা চলে কৈ? বড় জোর এই বলা যাইতে পারে গো, ঐ বুদ্‌বুদের অচিহ্নিত, অনির্ণীত, আনুমানিক, উত্থান-স্থানে অপর এক অভিনব বুদ্‌বুদের উদয় হইয়াছে।

বঙ্গদর্শনের "জাহাজ" নামও বঙ্কিমবাবু নিজে দিয়াছিলেন। যথার্থই আমরা উহাকে সাহিত্যের জাহাজ বলিয়া জানি, এবং তদ্রূপই শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করি। তৎ-পরিচালিত "প্রচার"-পত্রের প্রকাশকালেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জ্যোষ্ঠাত্মজ গতাসু "বঙ্গ-দর্শন"কে "জাহাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন-জাহাজের' নির্মাতা ও অদ্বিতীয় আদি নাবিক নিজেই—বঙ্কিমবাবু স্বয়ংই আর তখন সে জাহাজ চালাইতে চাহিলেন না। জীবনের যে সময়ে, প্রতিভার যে পূর্ণ ও প্রফুল্ল স্ফুরণে, বঙ্গদর্শন-জাহাজ গঠিত, সজ্জিত ও অপ্রতিহতভাবে চালিত হইয়াছিল তাহা তখন অতীত, বিগত। আত্মবল বুঝিয়াই তিনি আত্মসংবরণ করিলেন। স্বহস্ত-নিয়ন্ত্রিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহে একটি পানসী ভাসাইয়া তাহারই মাঝি হইয়া বসিলেন।

কিন্তু কেন? কিসেরই বা তত অভাব, অপ্রতুল ছিল? অমন কৃতকর্মা কাপ্তেন, অত বড় পাকাপোক্ত জাঁদরেল,—যাঁহার ইঙ্গিতে, অঙ্গুলি হেলনে, বাঙ্গালা সাহিত্য

তাহার মহারথীগণ সহ উচিত বসিত ও তাহা অসামান্য সম্মান মনে করিত—তিনি তখনও ইচ্ছা করিলে, একখানা কেন, অবহেলে আরও পাঁচখানা জাহাজের পাড়ি জমাইতে পারিতেন। কিন্তু তবুও তিনি পুনরায় বঙ্গদর্শন স্পর্শ করা প্রাজ্ঞোচিত মনে করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মুহূর্তের প্রমাদে বঙ্গদর্শনকে পুনর্জীবিত করিবার আদেশ দিয়া বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন যে, নিজের জীবনকালে ও নিকটস্থ স্থলেও বঙ্গদর্শন পুনর্বার বঙ্গদর্শন-বৎ পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কখনও সুযোগ হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রবর্তিত ও পরিচালিত করিয়া কাহারও কিছু ইষ্ট হইবে না। প্রত্যুত বঙ্গদর্শনের নিজেরই মহা অনিষ্ট ঘটিবে।

ফলতঃ উপরি-উল্লিখিত অবস্থায় স্বতঃই ইহা মনে হয় যে, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও পূর্বঅর্চনার আধার ও বহুকাল অনন্ত নিদ্রায় শয়ান, গতাসু বঙ্গদর্শনের গভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া তাহার নাম ও সত্ত্বার নিরর্থক বিমর্দন বিলোড়ন করিলে, নিতান্ত অন্যায় হয়। তাহাতে সবিশেষ প্রত্যবায়ও আছে। পরন্তু নিজের বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু নিজে যে কার্যে নামিতে সাহসী হন নাই, তাহা জোর করিয়া করিতে যাওয়া অপরের পক্ষে কতটা সংগত তাহা বুঝাই যাইতেছে।

নূতন বঙ্গদর্শন সাহিত্যের সবল হউন, দুর্বল হউন, আপাততঃ অন্যতম প্রতিযোগী বটে। প্রতিযোগীদের সমালোচনা করা সর্বথা অপ্রীতিকর, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিস্ময়করও বটে। এ সম্বন্ধে সতত সাবধান না হইলে চলে না। সরল সত্য কথার শত্রু অনেক। সর্বদা সতর্ক হইয়াও কুলায় না। সাময়িক সাহিত্যের উপস্থিত 'অতিসার'-জনিত শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় কিঞ্চিৎ কঠিন সমালোচনা কর্তব্যবোধে কার্যতই প্রায় করিতে হয়। সহযোগীদের সেটা সহ্য হয় না। প্রায় প্রত্যেক কথাতেই প্রতিযোগিত্বের আরোপ করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। উনি আমার প্রতিযোগী, অতএব হিংসা-দ্বেষের বশীভূত হইয়া, আমার অনিষ্টের উদ্দেশ্যেই ঐ ঐ সব দোষের আরোপ করিয়াছেন! কাজেই কোন কথা চলে না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এটা কি উচিত ও সাহিত্যসেবকগণের উপযুক্ত কথা? ব্যবসায় দৃষ্টিতে দেখিলে, মাসিকপত্রের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারিগণ সকলেই ত প্রায় সহানুভূতিরই পাত্র। কোন সহযোগীকে ত এমন সবল ও সচ্ছল দেখি না, যাহাতে করিয়া, নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয় নীচপ্রকৃতি স্বার্থপর লোকেরও হিংসা-দ্বেষের উদ্রেক হইতে পারে। সচলতার ও সচ্ছলতার ভান ও ভড়ং করিয়া কপটতা-পূর্বক আপন আপন দুরবস্থার উপর শাটীন কিংখাপের আবরণ দিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিতে চাও, কর; নহিলে আসলটায় সকলেরই সমান দুর্দিন। সাহিত্য-সংসারে সম্প্রতি প্রায় সকলেরই "ডোলে গরু শামুকে ধান"। ইহাতে কেবল করুণা ও কৃপারই উদয় হয়, হিংসা দ্বেষ ত আসে না। ইহাতে বিরোধ না হইয়া, সাহিত্য-

বৃত্তির সাধারণ উন্নতি ও লিপি-ব্যবসায়ের আত্মরক্ষণকল্পে পরস্পরের মিলন-বন্ধনের সৃষ্টি হইবার যে কথা, হওয়াই যে স্বাভাবিক। তা সে পক্ষে আমাদের দৃষ্টি কৈ? শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা মাসিকপত্র মাত্রেরই প্রসার, প্রতিপত্তি ও পরমায়ুর কামনা করি। কেন না, তাহা নহিলে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব না। উপবাসী থাকিয়া কেহ কোনও বিষয়ের সাধনা করিতে পারে না; পবনাশন সন্ন্যাসীরাও পারেন কিনা সন্দেহ। সাহিত্যমূলক বৃত্তি-ব্যবসায় সাহিত্যের উপজীব্য বটে; কিন্তু সর্বোপরি সাহিত্যের উন্নতিই এই ক্ষুদ্র "সাহিত্য"পত্রেরও স্বাবলম্বিত ব্রত; একাকী এ ব্রতের উদ্‌যাপন করা যায় না। ইহাতে শত দিক দিয়া শতজনের সাধনা আবশ্যক। আমরা সরল অন্তরে, নিঃসঙ্কোচে অন্ততঃ এ কথা বলিতে পারি যে, এই পত্র আত্ম-সিদ্ধি-পন্থায়, আত্মগত-নীতির অনুসারে, অপর পত্রকে সহযোগী সাধক বলিয়াই জানে, প্রতিযোগী প্রতিবন্ধক মনে করে না। পরন্তু অপর দিক দিয়া দেখিলেও, প্রকৃতপক্ষে এই পত্রের প্রতিযোগী নাই বলিলেও চলে। যে হেতু অপরাপর অনেক সহযোগীর অনেকানেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও, সাহিত্যের সাধনার্থ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হউক, নিজের একটি নির্দিষ্ট 'পথ' আছে; যাহার অবিচলিত অনুসরণ সাহিত্য একাই করিয়া থাকে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা, কাহারও সহিত তাহার যদি আদৌ থাকে, তাহা অতীব অল্প। কিন্তু প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিসের? আত্মোন্নতি, আত্মশ্রীবৃদ্ধিই না তাহার একমাত্র আসল উদ্দেশ্য? তা, নিন্দা, গ্লানি, হিংসা, ক্রোধ বা বিদ্বেষবর্দ্ধিতে কি কখনও কাহারও উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হয়, না হইয়াছে? প্রতিযোগিতার জয়েচ্ছা যাহাদের মনে জাগরূক, আত্মশ্রীবৃদ্ধি যাহারা চায়, অন্ততঃ তাহারা ঐ পথের পথিক হইয়া আত্মক্ষয় করে না। তাহারা সমালোচনাকে শত্রুতা ও সমালোচককে শত্রু মনে করে না। কেননা, প্রকৃতপথে চালিত হইলে, প্রতিযোগিতায় অশুভ নয় সর্বথা শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। "সাহিত্য" তাহার স্তাবককে শত্রু এবং সরল সমালোচককে মিত্র বলিয়া গণনা করে। সমালোচনা শত্রু-পক্ষ হইতে উপস্থিত হইলেও আমরা আত্মসংশোধন করিয়া, আত্মবল বর্ধিত করিতে পারি। যদি সাহিত্য-সংসার সরলতাকে একেবারেই সাগরগর্ভে বিসর্জন দিয়া সূক্ষ্ম-শিল্পের অদ্বিতীয় আধার হইয়া উঠিয়া না থাকেন, তাহা হইলে আমাদের এই সাদা কথা কয়টি, যেরূপভাবে বলা হইল, সেইভাবেই গ্রহণ ও বিচার করিবেন।

প্রকৃত বা পরিকল্পিত হউক, প্রতিযোগিতার একটা প্রকাণ্ড ছায়া ও তজ্জনিত অহেতুক, অনর্থক ও একান্ত অবাঞ্ছনীয় অযশস্কর সন্দেহ উদ্দীপনের শঙ্কা যথার্থই নবসহযোগীর উল্লেখ ও আলোচনা করিবার পথে আমাদের কণ্টক হইয়াছিল। স্বভাবতঃই আমরা একটা 'ইতস্ততঃ'র মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম। সহযোগী সম্বন্ধে সহসা কোনও কথা বলিতে আমরা সাহসী হই নাই। অবাধ প্রশংসা-গীতি হইলে কোনও কথাই থাকে না। তাহা তখন জলের মত গাহিয়া গেলেই হয়। সে গান

বেতালা হইলেও বাহবার করতালি ও বন্ধুতার আলিঙ্গন অর্জন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গান সর্বদা গাহিবার সুযোগ ত সকলের ঘটে না। যার পর নাই সাবধানে ও সংযত বিধানে প্রত্যেক কথা ওজন করিয়া বলিলেও নিস্তার নাই। স্পষ্ট কথা বা অপ্রশংসার কথা হইলেই, প্রতিযোগিতার আরোপ, সেত আছেই। তদ্ভিন্ন, পরম শত্রুতার অপবাদ, অভব্য আক্রমণের নিন্দা! কে এমন কর্মভোগ সহসা করিতে চায়? আবার সমালোচনাধর্মী কাগজে সমালোচনা না হইলেও চলে না। তাহার অভাবেও নানা অপরাধের আরোপ হয়। দুই দিকেই দায়। নবসহযোগীর পরিতোষার্থ প্রশংসা-গীতি-রচনার একখানি উপাদানও আমাদেরই দুরদৃষ্টবশতঃ এতাবৎকালের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমরা সবিশেষ সচেষ্ট হইয়া ও মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সহযোগী যে সূত্রে আপনার নামকরণ ও আত্মাভিব্যক্তির সমর্থন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা আদৌ তাহার অনুমোদন করিতে পারি নাই। কর্তব্যের অনুরোধে আমরা তাহার যে কঠিন সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা অপেক্ষাও কঠিনতর সমালোচনা তাহার প্রাপ্য হইয়াছিল। ফলতঃ গতাসু বঙ্গদর্শনের পবিত্র স্মৃতিসংযুক্ত ও প্রগাঢ় শান্তিসুপ্ত পৌরাণিক সত্তার উপর সজোরে আত্মশরীরস্থাপন, ও আত্মাসনের গঠন করিতে যাইয়া সহযোগী অংকুরেই যে গুরুতর প্রমাদ করিয়াছেন, তাহা পুরাতনের ও পবিত্রের অবমাননা।

পক্ষান্তরে, নূতন পত্ররূপেও তিনি কিছু অভিনব করিতে পারেন নাই, এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ, সারগর্ভ বা সুন্দর,—এমন কিছু শিক্ষাপ্রদ, বিশুদ্ধ, বিস্ময়কর বা বিরাট,—এমন কিছু অনন্যতন্ত্র, অত্যাবশ্যক, বা অপূর্ব পাঠ্যবিষয় লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, যাহা প্রকৃতই বঙ্গদর্শনের যোগ্য, এবং যাহা দ্বারা তিনি আত্মাবির্ভাবের আবশ্যকতা তিলপরিমাণেও প্রতিপন্ন করিতে পারেন। যাহা ছিল, তাহার উপর পুনশ্চ প্রতি মাসেই তিনি এমন সকল দোষাশ্রিত দ্রব্য উৎপন্ন ও আমদানি করিতেছেন, তাহা অবহেলায় উপেক্ষিত না হইয়া, আদৌ আলোচনার যোগ্য হইলে, কেবলমাত্র কঠিন সমালোচনারই বিষয়ীভূত হয়। এমন অবস্থায় নিতান্ত মোহান্ধ না হইতে পারিলে ত আর আহা-মরি করা যায় না; চাকচিক্যমুগ্ধ, চিক্কণতানুকারী, চিত্তপুত্তলীচেলা না হইতে পারিলে ত আর প্রশংসার প্রীতি বাঁশরী বাজান চলে না। সরল সাদামাটা ভদ্র সন্তানের পক্ষে তাহা কিছুতেই সম্ভবে না। তবে, প্রশংসাপত্রের পরম শত্রু হইতে পারিলেও এ ক্ষেত্রে প্রশংসা চলিতে পারে। কিন্তু, ভগবান মাথার উপর, সৌভাগ্যক্রমে আমরা কাহারও শত্রু নই। চাটুকর বা চেলা যদি না হই, নিশ্চয়ই কাহারও শত্রু নই যে, বৈরাগ্য সাধনের উদ্দেশ্যে, কৃত্রিম স্তুতি গীত গাইয়া, কপট করতালি দিয়া, অজ্ঞতার আত্মাভিমানের অভিনয়ে উচ্চস্বরে এনকোর 'এনকোর এনকোর' করিয়া, এক কথায় অপ্রাপ্য প্রশংসার প্রচার করিয়া, দুর্বল মানুষকে মাটি

করিব, বা তোমামোদের মিষ্ট মদিরায় মত্ত, স্বপথভ্রান্ত, খ্যাতিলুব্ধ, দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিকে পুরাপুরি পঙ্গু করিবার পৃষ্ঠপোষক হইব।

নবসহযোগী নিজে কিন্তু তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী সমালোচক-বর্গকে বিপুল পরিমাণেই ভরসা দিয়াছিলেন;—অসীম অভয় দিয়াই রাখিয়াছিলেন সে এমন অসঙ্কোচ, এমন সাহসিক, এমন সুস্পষ্ট সতেজ ও সাহঙ্কার অভয়বাণী, এমন সম্যক্‌রূপে স্বতন্ত্র, এমন অশ্রুতপূর্ব ও অসীম আত্মশক্তির বিজ্ঞাপক বিরাট উক্তি যে, কখনও দুর্বল ও ভ্রান্তিপ্রবণ প্রাণী মানুষের মুখে তেমনটি আর কখনও উচ্চারিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সহযোগী প্রথম সংখ্যায়, তাঁহার সূচনা সগর্বে ঘোষণা করিতেছেন;—

"* * * আমরা ক্ষমা চাই না, আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচি-ভ্রংশ, সত্যের অপলাপ, সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়।"

বলা বাহুল্য যে, এই বিরাট উক্তির 'অভ্রভেদী' উচ্চতা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিন্ধু মহা-মনস্বী ব্যাস, বশিষ্ঠ, শুক, জনকাদি মুনিঋষিগণেরও স্পর্শাতীত। তবে বিংশ শতাব্দীর সম্পাদক—যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শনের বিশাল শক্তিশেল ও বিপুল বরাভয়,—তিনি অবশ্যই এরূপ শক্তির অধিকারী। তাঁহার বিশ্বগ্রাসী অনন্ত আকাশব্যাপী সূক্ষ্মজ্ঞান কবি-কলমে কল্লোলিত হইয়া সেই "বৃদ্ধ শিশু"দের স্থূল ও সংকীর্ণ বুদ্ধিজাত অন্ধকাররাশিকে অবজ্ঞায় অন্তর্জ্জলি করিয়া, আজ জগৎকে, বিশেষতঃ "এই অন্ধকার দেশ"কে স্বকীয় শুভ্র "সূর্যালোক" দেখাইয়া বলিতেছে,—

"অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ,—
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ
নাহি জানে নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
*　　*　　*
নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক
জনমের গ্লানি!"

সম্পাদক মহাশয়ের মতে, "এই অন্ধ দেশ" "অন্ধকার গর্তের অন্ধ সরীসৃপ।" আর আধুনিক য়ুরোপীয় আচার্যগণ নিশ্চয়ই নিতান্ত নির্বোধ। য়ুরোপীয় জাতি সাধারণতঃ "বণিক-বিলাসী" বটেই। আর আধুনিক য়ুরোপীয় কবিকুল ইঁহার বিবেচনায় কেবল "শ্মশান-কুক্কুর" এবং তাঁহাদের কবিতা "কাড়াকাড়ি-গীতি।" সুতারং তিনি গাহিয়াছেন,—

"কবিদল চীৎকারিছে, জাগাইয়া ভীতি,
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।"

তা আর আশ্চর্য কি? তাঁহার প্রখর কবিপ্রতিভার অদ্বিতীয় সৃষ্টিতে ও তাহার অত্যুন্নতা গীতিনীতির নির্মল দৃষ্টিতে এখনকার য়ুরোপীয় "কবিদল" "শ্মশান কুক্কুর" ব্যতীত আর কি হইতে পারেন! তাই বলিতে হয়, 'যে তোমাকে প্রেম শিখালে, তাকে তুমি খুব শিখালে।'

এমন আব্রহ্মস্তম্বভেদী আত্মাভিমান আর কোথাও কেহ দেখে নাই। বঙ্গদর্শনের পুরা কোটালের সময় বঙ্কিমবাবুও বিলক্ষণ একটু বাঁকা-তন্ত্রী ছিলেন বটে; কিন্তু এ আত্মগরিমার উচ্ছ্বাসের তুলনায় সে ত বিনয়নম্রতার মৃদু নিঃশ্বাস! সে ছিল পূর্ণ কুম্ভের প্লাবন, আর ইহা শূন্য ভাণ্ডের ভিতরে দমকা বাতাসের গর্জন!

বাঙ্গালা সাহিত্যে যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ-প্রবণ বিচারপ্রণালী বিদ্যমান থাকিলে নব-সহযোগীর সম্পাদকীয় চেয়ার হইতে অধিকতর সতর্ক, সংযত ও বিজ্ঞ-বিচক্ষণোচিত উক্তি নিশ্চয়ই উদ্ভূত হইত। যেখানে ক্ষমা অক্ষমা কিছুই নাই, সেখানে "ক্ষমা চাই না" বলিতে বাধে না। যেখানে বিচারের প্রথাই নাই সেখানে "কঠিন বিচার প্রার্থনা" করিতে আর ভয় কি? তাহা বিদ্যমান থাকিলে সম্পাদক মহাশয়কে স্বভাবতঃই সাবধান হইতে হইত; এবং ইহার বহু পূর্বেই তিনি সংযত হইয়া আত্ম-সংবরণ করিতে শিখিতে পারিতেন। সম্পাদক মহাশয় নিজেও রাশীকৃত গল্প গীতি কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-জীবনে সমালোচনার সহিত সম্ভবত খুব কমই সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন। পরন্তু, যে স্বল্প পরিমাণ সমালোচনায় তিনি এ নাগাদ সম্মানিত হইয়াছেন, তাহাতে তারিপ ও তৈলের গন্ধ বই আর কিছুই প্রায় পান নাই। বিচার-বিশ্লেষণের অগ্নিপরীক্ষায় যে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং যে সংশোধিত শক্তি ও সংযম লাভ হয়, তাহা হইতে চিরকালই দূরে রহিয়াছেন। নহিলে ইহা স্থির যে লিপি-চালনার আরম্ভ হইতে একাল পর্যন্ত তিনি অসঙ্কোচে, অবিশ্রান্ত ও অবাধভাবে যে ভূরিপরিমাণ রচনার উৎপাদন করিয়াছেন,—সম্ভবত তাহা অধিকতর সারগর্ভ ও সুন্দর হইতে পারিত; তাহাতে প্রকৃতপক্ষেই অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যের যথার্থ উপকার হইত। তাঁহার কথা হইতেছে, এই জন্যই তন্নামোল্লেখ কথাটা বলা গেল; নহিলে ইহা সকলেরই পক্ষে সমান প্রযোজ্য। বিচারাভাবে ও অবিচারে আমা-দিগকে আত্মদর্শী হইতে দিতেছে না; দিন দিন অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল, উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্দাম, অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানী করিয়া তুলিতেছে, ইহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। আমরা বাহিরের আলোকাভাবে, স্বাভাবিক আত্মপ্রীতির প্রচণ্ড অন্ধকারে পড়িয়া, অনবরত আত্মস্ফীত হইতে হইতে আপনাআপনি আপনার কাছে, আত্মবৎ দুই-চারিজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে 'একশা' অমর হইয়া, উদাসীন ও আত্ম-বিরোধী বর্তমানকে বেতাইয়া, এবং বিচারাবিচারের একান্ত অযোগ্যের কোটায় ফেলিয়া, ভাবী সুবিচার ও অবশ্যম্ভাবী স্মৃতি-মন্দিরের সুনিশ্চিত আশায় বিভোর হইয়া থাকি। এ ভাব কি কখনও শুভাবহ হইতে পারে?

আমাদের সহৃদয়, শিষ্টাচারী বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবুর নামাঙ্কিত "নিবেদন"ও আলোচ্য বটে। তিনিই তদীয় "সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের" নায়কতায় ও সম্পাদকতায়, এবং আত্মানুজ শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সহকারী সম্পাদকতায় ও কার্যাধ্যক্ষতায়, নব বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং "রাজকার্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু দূরে অবস্থিতি"-বশতঃ ঐ উভয়ের "হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ" করিয়া, পরন্তু "বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায়" তাঁহার "চিরন্তন ক্ষোভ দূর", অপিচ ১৮ বৎসর পূর্বে তাঁহার "হস্তে বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র লোপ হওয়ার লজ্জা" নিবারণ করিয়া, এবং তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এত দিনে সাহিত্য-সংসারে একটি ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি "নিশ্চিন্ত"। অবশ্যই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এতগুলি কার্য একসঙ্গে সুসম্পন্ন হইয়া গেলে কে না "নিশ্চিন্ত" হয়? শ্রীশবাবুর নিবেদন এই নিশ্চিন্ততার সূচক, এবং পূর্বের "প্রধান সহায়" বসু চন্দ্রনাথবাবুর কাছে "কৃতজ্ঞতা" ও °সঞ্জীববাবুর পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রবাবুর ধন্যবাদ-বিজ্ঞাপক ও সর্বোপরি "ভাষায় প্রকাশাসাধ্য", রবীন্দ্রবাবুর "উপকারে"র স্মারক একটি অনুবন্ধ। এখন, শ্রীশবাবু এই অনুবন্ধ "নিবেদন" করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই নিবেদনে একটি কথা খোলসা করিয়া বিজ্ঞাপন করিলে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। যাহা "ভাষায় প্রকাশসাধ্য", তাহার প্রচারের প্রয়াস বরং সম্মুখস্থ অসীম সময়ের কোনও প্রশান্ত প্রহরের জন্য সম্প্রতি মজুত রাখিয়া আপাততঃ যাহা ভাষায় অতি সহজেই প্রকাশ হইতে পারিত, সেই পূর্বসংঘটিত ও অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যবিজ্ঞাপিতব্য ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত করিলে ভাল হইত। প্রকৃতপক্ষে তাহাই অনভিজ্ঞ ও সন্দেহান্বিত জনসাধারণের নিকট শ্রীশবাবুর একমাত্র নিবেদিতব্য। নিশ্চয়ই তিনি তাহা বলিতে বাধ্য ছিলেন ও হন, এবং তাহাই "সাহিত্য-সংসার" তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে চাহিয়াছিল ও চায়। "নিবেদনে"র প্রথম লাইনে শ্রীশবাবু প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন,—"১২৯০ সালের কার্তিক মাসে বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন হইতে ইহার প্রধান সহায় ছিলেন।"

প্রধানতঃ চন্দ্রনাথবাবুর সহায়তা-স্বীকার করিবার আবশ্যকতা ও অভিপ্রায়েই 'বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীবাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন গ্রহণ করার কথাটা প্রসঙ্গতঃ ঔদাস্যের সঙ্গেই বলা হইল। শেষ উক্তিটি তাহার কাল নির্দেশক বিশেষণ রূপে প্রথমটিকে মুহূর্তের জন্য উপস্থিত মাত্র করিল। শেষোক্তের 'লেজুড়' না হইলে প্রথমোক্তের উচ্চারিত হইবার আদৌ অবসর থাকিত না। অথচ সবিস্তারে প্রথম কথা আমূল বিবৃত করিয়া পুরা কৈফিয়ৎ দেওয়া শ্রীশবাবুর প্রকৃত, সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল, এবং এখনও আছে, এবং উহা অব্যক্ত রাখিলে চিরকালই থাকিবে। শ্রীশবাবু "বঙ্গদর্শন" নাম দিয়া এক নূতন মাসিক বাহির করিলেন, অথচ ১৮ বৎসর

পূর্বে ঐ নাম তিনি কি সূত্রে, কোন্ মূলে, কি দলিলে পাইয়াছিলেন, সেই আসল কথাটি ব্যক্ত করা আবশ্যক বুঝিলেন না। ইহা কিছু বিস্ময়কর ও সংশয়ের উদ্দীপকও বটে। বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমবাবুর পরিবার হইতে "বঙ্গদর্শন" নাম ব্যবহার সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, নাম ব্যবহার সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নিষেধ করা হইয়াছিল, তখন শ্রীশবাবুর, অন্ততঃ আত্মসমর্থনার্থও, নানা কারণে, (আইনতঃ না হউক, নৈতিক বাধ্যতাবশতঃ) খুবই কর্তব্য ছিল, বঙ্গদর্শনের সহিত তাঁহার সংশয়-সংকুল ও নিরতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন সম্বন্ধটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া সাহিত্য-সংসারে ও সাধারণ সমক্ষে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা। বুঝিলাম না, তিনি কেন তাহা করেন নাই। আত্মকল্পিত তথাকথিত একটা সাধারণ ঋণ,—যাহার জন্য তিনি কাহারও নিকটে কিছুমাত্র দায়গ্রস্ত ছিলেন না, এবং যাহার জন্য কেহ তাঁহাকে দায়গ্রস্ত করেও নাই, নিরীহ জনসাধারণ যাহার বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিল না ও স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া শোধ দিতে গেলেন ও দিয়া "নিশ্চিন্ত" হইলেন; অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত, তাহা হইতে আত্মস্খালন উপযুক্ত ভাবিলেন না, ইহা খুবই আশ্চর্য বটে।

'বঙ্কিমবাবুর যত্নে, শ্রীশবাবু সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে, বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিলেন', এই অস্পষ্ট ও অনাবশ্যক অপর কথার সহিত কথিত কথাটিই ত প্রচুর নহে। বঙ্কিম-বাবু কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন; কি অভিপ্রায়ে, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সূত্রে ও উপলক্ষে, এবং কি জন্য 'যত্ন' করিয়াছিলেন? সে যত্নের উপাদান কি ছিল ও প্রমাণ কি আছে? বঙ্কিমবাবুর তখন ও তাহার পূর্বে বঙ্গদর্শনের সহিত কিরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ছিল, এবং সেই স্বার্থের কিরূপ সংযোগে ও প্রয়োগে তিনি 'যত্ন' করিয়াছিলেন? আত্ম-প্রয়োজনে উপযাচক হইয়া, বা অন্য কোন উত্তেজনে উদ্দীপ্ত হইয়া যত্নটা করিয়া-ছিলেন? সঞ্জীববাবুর সঙ্গেই বা তখন বঙ্গদর্শনের কি প্রকার অর্থগত বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিল? আইনতঃ তখন বঙ্গদর্শনের আসল স্বত্বাধিকারী কে, বা কে কে ছিলেন? বঙ্কিমবাবু, কি সঞ্জীববাবু, অথবা উভয়েই? শ্রীশবাবু 'গ্রহণ করিলেন'; দান গ্রহণ করিলেন? কি সম্মানে? কিনিয়া লইলেন, অথবা চাহিয়া লইলেন? আহূত বা আত্মপ্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করিলেন? অথবা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলেন? "বঙ্কিমবাবুর যত্নে আমি যখন গ্রহণ করিলাম।" এ কথাটাতে বঙ্কিম, বাবুর যত্নে শ্রীশবাবুর অনুগ্রহের গন্ধই বেশী বাহির হইতেছে না? "গ্রহণ শব্দটা" বড়ই অসংযত ও কিছু অবিনীতভাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে। গ্রহণের নানা পর্যায় ও প্রক্রিয়া আছে, এবং অর্পণের সহিত তাহার অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ। তবে কুড়াইয়া লওয়া হইলে স্বতন্ত্র কথা। তাহা যখন এ স্থলে নয়, তখন "অর্পণ ও গ্রহণ" উভয়েরই পারস্পরিক সম্বন্ধ কি ছিল এবং প্রক্রিয়া কি প্রকার হইয়াছিল? বঙ্কিমবাবু ও সঞ্জীববাবু দানপত্রে বা বিক্রয় কোয়ালায় অর্পণ করিয়াছিলেন? অথবা

কেবল মৌখিক কথায় ধর্ম ও চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করিয়া দিয়াছিলেন? অথবা গোপনে দান করিয়াছিলেন? শ্রীশবাবুর দলিল বা 'টাইটেল ডিড্' কি আছে? অপর সাক্ষ্য-প্রমাণই বা কি আছে, অথবা নাই? বিশেষতঃ সাহিত্য-সংসারের মনের খটকা দূর করিয়া দেওয়া, সদাশয় শ্রীশবাবুর খুবই কর্তব্য ছিল। সে কর্তব্য পালন না করাতে তদীয় সম্পাদকের অঙ্গীকৃত "সাহিত্য-নীতি" সূত্রপাতেই ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। তদ্ভিন্ন সার্বভৌমিক ও ব্যবহারিক নীতিও এ ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই, ইহাও লোকে বলিবে।

৫

সাহিত্য ১২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩০৮

নব বঙ্গদর্শন

আলোচনা।

শ্রীশবাবুর নিবেদনের পর সম্পাদকীয় গদ্যে "সূচনা" ও পদ্যে "প্রহেলিকা"; 'ডবল ব্যারেল্ড গন্'। কিন্তু সহযোগীর কাব্য-রস এখন বাদ রাখিয়া একবার তাঁহার উচ্চচূড় চিন্তা-শৈলে আরোহণ ও বিচরণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমে সূচনার আলোচনাই সংগত।

শ্রীশবাবুর নিবেদিত ও অমরকরমন্ত্রপূত সঞ্জীবনী সুধায় বঙ্গদর্শন 'পুনর্জীবিত' হইবামাত্র, অষ্টাদশবর্ষের সুদীর্ঘ সুপ্তিশেষে গা ঝাড়া ও গোঁফে চাড়া দিয়া উঠিতে উঠিতেই, তৎক্ষণাৎ সম্পাদক মহাশয় বিক্রমাদিত্যের "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"-বিশিষ্ট অক্ষয় দিব্য সিংহাসন সন্নিভ বঙ্কিমবাবুর "বঙ্গদর্শন"-রূপ বত্রিশ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অপরাপর বিচারারম্ভের পূর্বে, শ্রীশবাবুর ত্যক্ত সাহিত্য-নীতির 'জের' বা 'লেজুড়' ধরিয়া বঙ্গদর্শনের বিগত ও আগত, বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরোধী সত্ত্বাপঞ্চক দৃঢ় দড়াদড়ি দ্বারা একত্র বাঁধিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে প্রয়াসের পূর্বাভাস আমরা "উল্লেখেই" দিয়াছি। পরাভাস ও ভাষ্য এখনই আবার একটু দিতে বাধ্য হইতেছি। ইতিমধ্যে একটি প্রশ্ন হইতেছে এই যে, রবিবাবু এই বত্রিশ সিংহাসনের যে পর্যায়ে উঠিলেন, সেটি কোন্ ও কেমন পর্যায়? এবং বঙ্কিমের অব্যবহিত পরিত্যক্ত ও অপরের অসংস্পৃষ্ট পরবর্তী পর্যায় কি না? রবিবাবু অত্র সিংহাসনে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হইলেন কাহার? শ্রীশবাবুর "নিবেদন" শ্রবণ করিয়া ত জানিতেছি যে, বঙ্কিম বিক্রমাদিত্যের পর সঞ্জীব শালিবাহন উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পর শ্রীশচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ ভোজরাজদ্বয় কর্তৃক উহা অধিকৃত হয়, এবং ঐ দুই

মহাশয় একত্র এই সিংহাসনে উপবেশন ও শাসনদণ্ডের পরিচালন করেন। তাহার পর উহা অষ্টাদশ বৎসর ভূগর্ভে নিহিত থাকে। এখন রবিবাবু উহাতে আরোহণ করিয়াছেন। উপস্থিতক্ষেত্রে সর্বাদি অধিষ্ঠান ইঁহারই বটে। কিন্তু প্রারম্ভকাল হইতে পরদায় পরদায় মাপিয়া ইহার কোন্ পর্যায় হইল ? রবীন্দ্রনাথ বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমকেশরী বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার পাইলেন, অথবা চন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র ভোজ বাহ্লীকের উত্তরাধিকারী হইলেন ?

বঙ্কিম বিক্রমাদিত্য বঙ্গদর্শনকে জলবুদ্বুদের সহিত তুলিত করিয়া উহার আবির্ভাবকালে লিখিয়াছিলেন, "এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল: নিয়মবলে বিলীন হইবে।"

উদয়ের চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়কালে (সেই বিদায়ই চিরবিদায়) বত্রিশ-সিংহাসন বর্জন করিয়া উক্ত বিক্রমাদিত্য লিখিয়াছিলেন; "বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজ সেই জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজ সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

পঁচিশ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের ঐ বুদ্বুদ রূপকের অনুসরণ করিয়া বত্রিশ-সিংহাসনের রবি রাজা তদীয় সূচনায় কাব্য ও বৈরাগ্য রসের উচ্ছ্বাস তুলিয়া ও তাহাতে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বুকনি দিয়া ঐ বুদ্বুদেরই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন;

"এই নশ্বর জগতে জলবুদ্বুদের সহিত কাহার তুলনা না হয় ? ক্ষুদ্র সাময়িকপত্রের ত কথাই নাই, অতুলপ্রতাপান্বিত রোম সাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্বুদ উঠে, মিশায়; আবার উঠে, আবার মিশায়, আবার উঠে। আবির্ভাব: তিরোভাব: পুনরায় আবির্ভাব; ইহাই বিশ্বের নিয়ম, বিনাশ কিছুরই নাই।"

অতএব সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত এই যে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের বত্রিশ-সিংহাসনের বিনাশ হয় নাই। তাহা এতকাল শূন্য ছিল: এখন তিনি তাহাতে আরোহণ ও উপবেশন করিয়াছেন।

অতি উত্তম। সাহিত্য-সংসার দেখিয়া সুখী হইয়াছে; রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। নশ্বর জগতের অবিনশ্বর হওয়াও খুব মঙ্গলকর। পরন্তু সম্পাদকীয় লেখাটিও শুনিতে বেশ সুন্দর। তাহার 'নবেলী' লাবণ্য ললিত লবঙ্গলতার মত লতাইয়া লতাইয়া কানের ভিতর দিয়া প্রাণে গিয়া পশিতেছে; কিন্তু লেখাটির "লজিক"টুকু চমৎকার নয় কি ? তা অমন ললিত লেখায় "লজিক" দেখে কে,—সঙ্গতি অসঙ্গতিরই বা সন্ধান করে কে ?

বঙ্গদর্শনের বিনাশ না থাকা আপাততঃ বড় আবশ্যক, অতএব "বিনাশ কিছুরই নাই"; বিনাশ কিছুরই নাই, অতএব বঙ্গদর্শনেরও বিনাশ নাই: বিনাশ কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না।

বেশ! নিশ্চিন্ত! অখণ্ডনীয় অটল সিদ্ধান্ত আবার চাই কি সম্পাদক মনে করিলেন, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যের গোড়া ঘেঁসিয়া নিপুণহস্তে এমন কবিত্ব-কুঠারের কোপ্ চালাইলেন যে, বঙ্গদর্শনের অবিনাশিত্ব সাপ্রমাণ হইয়া প্রমাণের জের আরও অনেকখানি রহিয়া গেল। আবার তাহার সঙ্গে সযুক্তি মস্ত একটা বিচিত্র উক্তি হইয়া গেল।

উক্তি বিচিত্র বটে যুক্তিও বিপুল। "বিনাশ কিছুরই নাই"; কেন না, "জল-বুদ্বুদ্ উঠে, মিশায়, আবার উঠে, আবার মিশায় আবার উঠে।" এই দেখ, বঙ্গদর্শন বুদ্বুদ বিশ বৎসর বেমালুম বিলীন হইয়া 'গেছিল', আবার উঠিল, ফুটিল; তবে আর বিনাশ রহিল কিরূপে? বুদ্বুদ্ উঠে, মিশায়, আবার যে ফুটে! অতএব সব অবিনশ্বর!

তা বটে। কিন্তু যে বুদ্বুদটা মিশায়, ঠিক সেইটাই কি সশরীরে আবার উঠে? না অন্য রকমের আর একটা উঠে?

বঙ্গদর্শন বুদ্বুদ্ ত উঠিল। রোম সাম্রাজ্য বুদ্বুদ্, মোগল সাম্রাজ্য বুদ্বুদ্ উঠিয়াছে কি? স্মরণাতীত কাল গত, হিন্দু সাম্রাজ্য বুদ্বুদ্ কালস্রোতের শরীরে মিশাইয়া 'গেছে', কই কখনও ত আর উঠিল না। নিশ্চয়ই সে বুদ্বুদগুলো বঙ্গদর্শন বুদ্বুদের চেয়ে নিতান্ত ছোট না হইলেও হইতে পারে। তবে তাহাদের তিরোভাবের পর আর আবির্ভাব হইল না কেন, হয় না কেন? অবিনাশী "সাধনা" বুদ্বুদ্, "বালক" বুদ্বুদ্ এখন কূটস্থ চৈতন্যের কোন কোটরে বিরাজ করিতেছে? মৃত বঙ্গদর্শনের চিতায় 'তা' দিতে দিতে তাহারাই ত বরং ফুটিয়া ফুটিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার উপায় কি বলুন দেখি? যখন "বিনাশ কিছুরই নাই" তখন "বালক" ও "সাধনা"ও ত মরিয়া বিনষ্ট হয় নাই। এখন তাহারাই ত বত্রিশ-সিংহাসনে উঠিয়া বঙ্গদর্শন শবের দুই স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছে।

সম্পাদক হয়ত শুনিয়াছিলেন, এবং তেমন মনোযোগ দিয়াও শুনেন নাই যে, প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়েরই বিনাশ নাই, তাহার তিরোভাব হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আকারে পুনরাবির্ভাব হয়। যে বস্তুটার বিলয় হইয়া যায়, সেইটারই যে আবার উদয় হয়, তাহা নয়। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকৃতির অনন্ত শক্তিতে মিশ্রিত হইয়া স্বজাতিত্ব হেতু তাহারই সমবায়ে প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির প্রয়োজনানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গঠিত ও প্রকটিত করে। স্থূলতঃ আসল কথাটা এই।

বঙ্কিমবাবুর ও তদীয় সহযোগী লেখকবর্গের প্রতিভায় চারি বৎসরকাল পরি-চালিত বঙ্গদর্শনকে, অর্থাৎ তাহারা স্থিতি ও গতি কর্তৃক সৃষ্ট, অবলম্বিত ও অনুকৃত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ানিচয়কে যদি একটা শক্তি বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে সে শক্তি বহুকাল পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া, তাহার পর অপরাপর শক্তির সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও বিক্ষিপ্তভাবে ব্যয়িত ও অভিব্যক্ত হইয়া স্বকার্য সাধন করিয়া চুকিয়াছে।

সে শক্তির অভিব্যক্তি তৎপরবর্তী ও বর্তমান সাময়িক পত্রনিচয়। কিন্তু এই সহজ সত্যটুকু স্বীকার করিলে সম্পাদকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কাজেই তিনি অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি বিশ বৎসর পরে ব্যবহার করিবার অবসর পাইবেন বলিয়া বিলুপ্ত বঙ্গদর্শনের সমস্ত শক্তিখানি কই-মাগুর মাছের মতন এক-স্থানে জড় হইয়া 'জেয়ান' ছিল। এখন তিনি সেটাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

সম্পাদক সানুকূল উত্তরের কামনা করিয়াই আধ জোরে আধ আবদারে জিজ্ঞাসা করিতেছনে,—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কি বাঙ্গালীর হইবে না?"

বড়ই দুঃখের কথা যে, ইহার উত্তরে লোকে বলে যে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হইয়াছিল। কিন্তু সঞ্জীব শ্রীশাদির বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের উপরোধ সত্ত্বেও বাঙ্গালীর পছন্দ হয় নাই। রবিবাবুর বঙ্গদর্শন হইবে কি না ঘোর সন্দেহ। এই কারণেই বঙ্কিমের কীর্তি অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত রাখিবার কামনায় আমাদের পরম পূজনীয় তদীয় সহধর্মিণী বঙ্গদর্শন নামের পুনঃপ্রচারে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি? বঙ্কিমের জন্য ব্যথাটা তাঁর নয়, আমাদেরই প্রাণে বড় বেশী। কেন না, বঙ্গদর্শনের পসারখানা ও বঙ্কিমের সাহিত্য-সম্ভ্রমটার আমরা প্রয়াসী। কাজেই আমরা তাঁহাকে যত ভালোবাসি, তাঁহার পরিবারবর্গ কি আর তত?

সম্পাদক সতেজে বলিতেছেন,—"আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।"

কিন্তু সে নামকে আপনারা যে বিকৃত ম্লান ও মলিন করিবেন না ও করিতেছেন না, তাহার প্রত্যয়ার্থ প্রমাণ কি সঙ্গে আনিয়াছেন, এবং বঙ্কিমের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য করিবার উপযোগী যোগ্যতা কি আছে? প্রাজ্ঞতা ও প্রতিভা প্রায় তাঁহার কাছাকাছি হবে কি? সেটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা হইয়াছে কি?

ইহারই উত্তরে হয়ত আপনারা বলিতেছেন,—"বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার (নব সম্পাদকের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।" এবং তাহাতেই তিনি সর্বথা সমর্থ হইয়া সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে বিরত থাকিবেন।

এরূপ প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়া, বঙ্কিমত্ব প্রাপ্ত হইলে, আর কথা কি? কিন্তু কৃত কার্যগুলি যে 'সরেজমিনে' মজুত।

পুনশ্চ, সম্পাদক উক্ত কথাই পুনরুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপিত করিতেছেন,—"বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউক না কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, বঙ্গদর্শনের প্রাচীন মহারথী এখনও যাঁহারা ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।"

তা প্রায় বৎসর পুরিল ত সেনাপতি "পতাকা" উড়াইয়াছেন, কতগুলি "মহারথী"

অতিরথী তাঁর "পতাকাতলে সমবেত"? দেখিবার মধ্যে দেখিতেছি ত কেবলমাত্র স্বগণভ্রষ্ট চন্দ্রশেখরকে। তা তাঁকেও পংক্তির বাহিরে, একখানা ছেঁড়া পাতা পাতিয়া গোটা দুই ক্ষুদ্রের অন্নে, আপ্যায়িত করা হইয়াছে। রবিতেজে মলিন মুখুয্যে মহারথীর রথচথ ত কিছুই দেখিতেছি না। "তেঁহ" "ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই" ভাবের পদক্ষেপে শেষ পৃষ্ঠার ডগের উপর রথিত্ব করিতেছেন। তাও মাসে মাসে নয়। সেনাপতির মরজি অনুসারে।

সেনাপতি স্বয়ং শত অক্ষৌহিণী। যে "আধুনিক" আড়াইটি কি তিনটি তুরুক-শোয়ার পতাকাতলে দাঁড়াইয়াছেন, "তাঁহারা বঙ্গদর্শনের নামেই নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।" তাত বটে! ঐটার জন্যই সেটা আটক ছিল।

'অতীত'টা ইতিহাসের বিষয়ীভূত বলিয়াই এতকাল লোকে জানিত। এখন নব-সহযোগী অতীতটাকে "ইতিহাসের বিবরমধ্য" হইতে সটান বাহির করিয়া, প্রখর সূর্যালোকে আনিয়া, অতীত ও বর্তমানের একটা অখণ্ড, অভিন্ন অস্তিত্ব বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কারণ, সেটাতেও তাঁহার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ বঙ্কিমের ইতিহাসখানা, তিনি উক্ত "বিবর" হইতে বাহিরে আনিয়া বর্তমানের অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অস্তিত্বের সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।

"জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ" করিবার জন্য বঙ্কিমবাবুর ইতিহাসটা আত্ম-অস্তিত্বের ইতিহাসের সহিত রবিবাবু বাঁধিয়া দিবেন; কিন্তু, বঙ্কিম যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা করিতে পারিবেন না, তাহা আগেই নিপুণতার সহিত বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া রাখিতেছেন। যেহেতু বঙ্কিমের কাল ও বর্তমান কাল এক নয়; উভয়ে অনেক তফাৎ। অতএব "আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিতে পারিব না।" তবে কি "উপভোগ" করিবার প্রত্যাশা করিব বলুন দেখি?

একবার বলা হইতেছে, বঙ্গদর্শনের সমস্তখানিই ছিল বঙ্কিম। আবার বলা হইতেছে, সাময়িকপত্র বহু লোকের সমবেত চেষ্টার ফল। এইরূপ সঙ্গতি অনেক স্থলেই।

রবিবাবু বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের কালটাকে "সাহিত্যের সংকীর্ণ খাত ও স্বকীয় বঙ্গদর্শনের কালটিকে" "সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রবাহ" বলিয়া, এবং তদ্দ্বারা অবশ্য তাঁহার নিজের কাজের কাঠিন্যের আভাসটা ইসারায় বুঝাইয়া, লিখিয়াছেন,—"এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চির-স্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে।"

বলিতে পারি না, এ উক্তির আদৌ কোনও অর্থ হয় কি না। তা সৃষ্টির আরম্ভ

হইতে এত কালের মধ্যেও কি "বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকা হইতে চিরস্থায়ী" সত্যকে বাছিয়া লওয়া ও রাখা হয় নাই যে, নব-বঙ্গদর্শন-কারকে সে কাজটাও করিয়া "বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে তাঁহার পত্রে প্রতিফলিত" করিতে হইবে? আপাততঃ তিনি তাঁহার আগামী নববর্ষের সম্পাদকীয় মঙ্গলাচরণে পাঠকবর্গকে বলিবেন, এই সংবৎসরের মধ্যে "বঙ্গচিত্তের" কি কি "আদর্শের" প্রতিফলন তিনি ফলাইয়াছেন? এক বৎসরের বঙ্গদর্শনে যাহা প্রতিফলিত দেখা যাইতেছে, তাহার চৌদ্দ আনা পোনের গণ্ডা অপরের। এই চিত্তগুলির আত্মাভিব্যক্তিই কি 'বঙ্গচিত্তের আদর্শ' এবং 'শ্রেষ্ঠ আদর্শ' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? সম্পাদকীয় আদেশ ত তাহাই বটে।

রবিবাবু কেবল "বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিফলিত" করিয়াই ক্ষান্ত নহেন তাহাদের মধ্যে "সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠা" করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ়। আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, "বঙ্গচিত্তের" অপরাপর "শ্রেষ্ঠ আদর্শ"গুলিকে "নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে" না আনিয়া কেবলমাত্র "সাহিত্যের আদর্শকে"ই সেখানে 'প্রতিষ্ঠা' করা হইতেছে যে? অপর "শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি" কি অপরাধে সে সম্ভ্রম ও সে সুখ হইতে বাদ পড়িল ও বঞ্চিত হইল? আর "সাহিত্যের আদর্শই" বা কোন গুণে, ও গৌরবে অপরিবর্তনীয় পাক্কা স্বরূপে, সটান নিত্যকালের অচল শিখরের উপর উঠিল? তা, তাহাকে "অচল শিখরের উপরে" 'একশা' টানিয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার একটু আগে "সাহিত্যের আদর্শ"টা কি, একটু ঠিক করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? একটু খুলিয়া বলিয়া দিলে ভাল হয় না কি? কেন না, নিম্নস্থ নবলোকের সকলেই দেখিতেছি যে, "সাহিত্যের আদর্শ" স্বপ্রকৃতিতেই পরিবর্তনশীল। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থা-ভেদে, জাতিভেদে, রুচিভেদে "সাহিত্যের আদর্শ" ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই সাময়িক আদর্শানুসারে সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে, আত্মশরীর গঠিত করিয়াছে ও করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের শরীর ও আত্মা ও ইতিহাসেই ত ইহার শাফাই সাক্ষী বিদ্যমান। পরন্তু "সাহিত্য" বলিলে তাহার শরীর ও আত্মা উভয়ই একত্র লইতে হয়; কোনটির একটি বাদ দিয়া, কূট কৌশলে পাশ কাটাইয়া গেলে চলে না; একটা নিরাকার ও নিরর্থক ন্যায়ের ফাঁকি তুলিয়াও সেটাকে "নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে" উঠান যায় না। অস্থলে, অকালে, "নিত্যানিত্য, অচল, অনন্ত, চিরস্থায়ী, সত্য, শ্রেষ্ঠ আদর্শ" এ সব লম্বা চওড়া কথার কাওয়াজে কেবল বিদ্রূপ ও বিরক্তিই উদ্দীপিত হয়। ঐ সকল পাণ্ডিত্য একটু একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, বরং শব্দার্থ ও তাহার ব্যবহার ও তদ্রূপ ছোটখাট বিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয়; তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা উভয়ই আছে।

রবি বাবু তাঁহার উপরি-উক্ত "প্রতিষ্ঠা-প্রতিজ্ঞা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কার সহিত করিতেছি।"

"বিনয়!" বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের "বিনয়" তা মন্দ নয়। বিনয় একটু থাকা ভাল। এবং "প্রতিজ্ঞা" "বিনয়ের" সহিত করাও ভাল। কিন্তু আশঙ্কার সহিত কোনও "প্রতিজ্ঞা" করা চলে না। 'আশঙ্কা' 'প্রতিজ্ঞার' প্রতিবাদ-জ্ঞাপক। "আশঙ্কা" সংশয়জনিত ভয় সূচিত করে। ভয়, সংশয় বা সন্দেহ শঙ্কা করিয়া "প্রতিজ্ঞা" করা হয় না। নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ নিঃশঙ্কচিত্ত "প্রতিজ্ঞা"য় সাহসী। শঙ্কায় সন্দেহে দোদুল্যমান ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা করা স্বাভাবিকতার বিপরীত,—অসম্ভব। কেন না "প্রতিজ্ঞা", সর্বথা দৃঢ়তাসূচক ; আশঙ্কায় সংকুচিত ও সন্দেহে বিচলিত হওয়ার জ্ঞাপক নহে, ঠিক তাহার বিপরীত। ফলতঃ; "আশঙ্কার সহিত" একত্র "প্রতিজ্ঞা" শব্দের ব্যবহার চলে না। হয় "আশঙ্কার" স্থলে "সাহস" অথবা প্রতিজ্ঞার স্থলে "প্রস্তাব" শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। শব্দ, অভিধানে অনেকানেকই আছে। তাহাদের উপযুক্ত, সঙ্গত ও শিষ্ট ব্যবহার হইলেই তবে বাক্য অর্থবোধক ও ভাবোদ্দীপক হয়।

সহযোগীর প্রথম সংখ্যাতেই দেখিতেছি, "বঙ্গচিত্তের" এক "শ্রেষ্ঠ আদর্শ"—"হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা।" এ 'শ্রেষ্ঠ আদর্শ' লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ও সংবৎসর ঘুরিতেছেন : শ্রীযুক্ত "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" নামক জনৈক খৃষ্টশিষ্য। ইনি বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় (হায়! বঙ্গদর্শন!) এই প্রবন্ধে হিন্দু জাতির বংশধরগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম শিখাইতেছেন! নিশ্চয় এটা বর্তমান বঙ্গচিত্তের ও বঙ্গদর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু বর্ণাশ্রমের এই আদর্শের উপদেষ্টার নামের উপর,—অন্নপ্রাশনের ও খৃষ্টীয় চূড়াকরণের প্রকৃত নামের উপর উপাধ্যায়ান্ত এই উৎকট পরদার আড়ালটা কেন? এটা কি বড়ই বেশী সন্দেহসঙ্কুল নয়? না এটাও "বঙ্গচিত্তের" একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ? রবি বাবুর দ্বাদশপদী একটি পুরা সনেট বর্ণাশ্রমের শিরে "মটো" অঙ্কিত করিয়া, এই বাঙ্গালী পাদরী তাঁর যে আর্যোপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, ক্ষমা করুন, আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিব না। তা "নিষ্ঠা" শব্দটিই চলিত, সেইটিই লোকে ব্যবহার করে। কেহ নিষ্ঠা স্থলে "নিষ্ঠতা" বলে না।

যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর ও বাঙ্গালা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল "বিষবৃক্ষ" ও "চন্দ্রশেখর" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবি বাবুর "চোখের বালি" বাহির হইতেছে। কর্তব্যানুরোধে এ বালি ঘাঁটিবার কর্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েক দিন পরে। আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবি বাবু নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্য

নীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে 'অমার্জনীয়' প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা, সেই রুচিভ্রংশতা, সেই সত্যের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একযোট হইয়া তাহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবি বাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি :—সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! সরলভাবেই বলিতেছি, রবি বাবু অজ্ঞাতে এই গলিত-পঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন। নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ ব্যাপারটা কেবল বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, সমগ্র সাহিত্য সংসারের একটা অতি বিস্ময়কর ও রহস্যময় সুসদৃশ ঘটনা। চোখের বালি সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিলাম, তাহা উহার আলোচনাকালে আমরা অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং তৎকালে উক্ত বিস্ময়কর রহস্যের আমরা মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব। তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাহার সরল ও বেদনাহীন কঠিন সমালোচক হইলেও, তাহার শত্রু ও নিন্দুক নহি।

তা, যাহাই হই, আমরা বলিতেছি ও আমাদের অত্যল্প আলোকানুসারে অবশ্যই বরাবর বলিব যে, রবি বাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই। ভগবান তাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা এরূপ কার্যের আদৌ উপযোগী নহে। শক্তির প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতিটা ঠাওর না করিয়া ও তাহার পরিধিটাকে প্রকাণ্ড ও সর্বদিকস্পর্শী ভাবিয়া ইদানীং তিনি অনবরত তাহার অপব্যবহার ও অপচয় দ্বারা প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতেছেন।

"চোখের বালি" যে বইখানির অবিকল অনুকৃতিবৎ, তাহার নাতিহ্রস্ব ও কিঞ্চিদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর নব বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই করিয়াছেন। অপ্রিয় সত্যোদ্ঘাটনে ও বিকৃতি বিশ্লেষণে ন্যায়তঃ বাধ্য বিচারক ও সমালোচকের অনুপযুক্ত অতিরিক্ত সদয়দৃষ্টিতে দেখিয়াও দোষজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্তনে অধিকতর অভিলাষী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনতিক্রমনীয় কর্তব্যের অনুরোধে, যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতেছেন: —" * * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক ; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়ি বাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকার্য: দ্বিতীয়োক্ত রকমে ব্যর্থ প্রয়াস! *** এই উপন্যাসের মুখ্য চিত্র উমাকেই দেখ।

উমা একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই—একটি রক্ত মাংসের বেদান্তদর্শন হইয়াছে মাত্র। *** পাঁচকড়ি বাবু স্বর্গের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পাপ চিত্র পাঁচকড়ি বাবু আঁকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা?"

নূতন লেখক পাঁচকড়ি বাবুর সম্বন্ধেই যখন ইহা অতি সদয় ও মৃদু মন্তব্য, উচ্চতর স্তরের অভ্যস্ত ও পুরাতন লেখক রবীন্দ্রনাথ বাবুর বই "বালি" সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বুঝিয়াছেন ও বলিতে চাহেন, জানিতে চাওয়া অন্যায় নহে।

রবি বাবুর এই বই অতঃপর "বঙ্গদর্শনে" বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধ হয়, ভাল হয়। কারণ, তাঁহার এই "চোখের বালি" বঙ্কিম বাবুর হউক, তাঁহার হউক বা আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চূণকালী মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত মাসে মাসে পূর্বনামজাদা 'মান্যমান' লোকের মুখময় চূণকালী মাখানটা ভাল দেখায় কি?

রবি বাবু তাঁহার ভাষা এমনতর ভাঙিয়া চুরিয়া 'ভ্যাল্সা' করিয়া ফেলিতেছেন কেন? অবিশ্রান্ত রচনাতিসারই কি ইহার কারণ? তাঁর নিজেরই কথায় বাঙ্গালীর "নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও যেমন দাবিয়া গেছে," ("ইয়ার" সঙ্গে এই 'গেছে'টা নিত্য সম্বন্ধে লেগেই আছে, এবং বোধ করি খাঁটি 'বাংলা' ব্যাকরণের খাতিরেই হবে. ক্রমাগত কাণ ঝালাপালা 'করিয়া দেছে'।) তেমনই দাবা নাড়ীরই মত তাঁর ভাষার দেহখানার অস্থিমজ্জা দারিদ্র্যে ও দুর্বলতায় দিন দিন 'যেন দাবিয়া যাচ্ছে'। রবি বাবু গদ্য পদ্য অনেকই লিখিয়াছেন; লিখিতেছেনও অনেক। দৈনিক সংবাদপত্রের দেশী সম্পাদকেও এত লেখা লেখে না ও এত ছাপে না। কিন্তু বোধ করি তাঁর নিদারুণ দাবুনিতেই, এখন সেটা নেহাত রগ-বসা "হইয়া গেছে"।

সহযোগীর এ সংখ্যার প্রবন্ধ পর্যায়ে সম্পাদকীয় খাস কামরায় খৃষ্টোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় ব্যতীত আরও দুইজন নব্য লেখক আছেন একজন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। 'আরেকটি' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রথমোক্ত বাঙ্গালী টেইন। অতএব সেই সূত্রে "বাঙ্গালা প্রাচীন পদ্য সাহিত্য" সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইঁহার জরাজীর্ণ সমালোচনার ধার ও সুবলয়িতা ভাষার ভার পূর্ববৎ যথাযথ জাগ্রত আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, তাহার ইতরবিশেষ হয় নাই তিনি "লিপি সংগ্রহ" · "কামিনীকুমার" প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে যে গদ্যছন্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর ভূতপূর্ব ভাষা, তাঁর নিজের ভাষাটি অভূতপূর্ব বটে।

"যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি" নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ। লেখক ইহাতে বঙ্কিমী কায়দায় মহাভারতগত কেবল দ্যূত নয়, কাব্য-সাহিত্যাদিরও সমালোচনায় সচেষ্ট হইয়াছেন; এবং "মৌলিক, প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণচরিত্র, মহাভারতের ভিত্তি, কাব্যাংশে অতুলনীয়, কাব্য-সাহিত্যে অতীব বিরল, সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য, সর্বলোক বিস্ময়কর, প্রোজ্জ্বল বর্ণ" ইত্যাদি

বাক্যজাল বিস্তার করিয়া সাড়ম্বরে আসর লইয়াছেন। আপশোষ কেবল এই যে, আসল কাজের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 'হাই কালচারের' হাবভাব ও হাকিমী কায়দার 'কসরৎ' করিয়া দ্যূতক্রীড়া ও দ্রৌপদীদুর্গতির সেই দারুণ দাবানলের মধ্যেও বেশ একমাত্রা হাসির অবসর দিয়াছেন। তা, ইহাই বা কম কি? নাম সাকিমাদির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া, প্রকাশ্য সঙ বাহির না করিয়া, প্রচ্ছন্ন ও প্রগাঢ়-ভাবে যদি সঙের করণীয় কাজটা সিদ্ধ হইয়া যায়, সাময়িক-সম্পাদকের তাহাতে সুবিধাই আছে। আসর-রক্ষার্থ স্বয়ং সাজিতে হয় না, অপরকেও রঙ মাখিতে সম্মত করিয়া সঙ সাজাইতে হয় না।

৬

"সাহিত্য" ও সাহিত্য সমালোচনা

সুচালিত সহযোগী মাসিকপত্র সকলের উল্লেখ ও আলোচনা এই পত্রের একটা অঙ্গ। এটা এখন ইহার পুরাতন ও প্রচলিত পদ্ধতি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। পদ্ধতিটি আমরা নিজেরাই প্রবর্তিত করিয়াছিলাম; করিয়া ভালো কি মন্দ করিয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। কারণ, পরে এই পদ্ধতি অপরে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেও, এবং ইহা দ্বারা উপযুক্ত আদর-সম্ভ্রম-বিরহিত ও অবহেলার অন্ধকার কক্ষে নিহিত, নিত্যবর্ধনশীল, সহযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকগণের সাধারণতঃ উপেক্ষিত ও অজিজ্ঞাসিত রচনাবলীর—অন্ততঃ অনেক প্রবন্ধের একটা উল্লেখ আলোচনা প্রাপ্তির পথ—সাধারণ্যে প্রদর্শিত, চিহ্নিত ও আকৃষ্ট হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট সুযোগ হইলেও, আমরা ইহাতে কোন অংশেই সুখী হইতে পারি নাই। স্বদেশীয় সহযোগী সাহিত্যের সুনিয়মিত সমালোচনাপদ্ধতির প্রবর্তনের দিন হইতেই, এই ক্ষুদ্র পত্রের ও অকৃতী সম্পাদকের কেবল শত্রুবৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, চিরপোষিত ও একান্তবাঞ্ছিত বন্ধুত্বের স্থলে, অজ্ঞাতে অকারণে মর্মান্তিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। বলুন, ইহা অপেক্ষা অভাগ্য ও আক্ষেপের বিষয়, সংসারী ও সামাজিক জীবের পক্ষে আর অধিক কি হইতে পারে?

সাহিত্যের সাধারণ ও নির্বিবাদ প্রাঙ্গণের সম্যক্ অসূয়াশূন্য ও শান্ত স্থানে দাঁড়াইয়া, স্বকীয় আলোক ও সমালোচনার শিষ্টানুমোদিত ও সমীচীন নিয়মানুসারে রচনার সাহিত্যগত গুণাগুণের নির্দেশ করিয়া স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিলে, রচয়িতার

স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ও তদীয় ব্যক্তিত্ব ব্যথা পাইয়া, অবৈধভাবে বিদ্বেষ-বিষাগ্নির উদ্গার করিতে, অথবা সেটা চতুরতার সহিত তৎকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়া সময়ান্তরে অপর প্রকারে সমালোচককে অভিশপ্ত ও অপদস্থ করিতে, কেবল অভাগ্য ইংগ-বংগেই দেখা যাইতেছে।

অন্যত্র কিন্তু ব্যবস্থা এরূপ নয়। সমালোচনার শর তীক্ষ্ন্যানুভব হইলে বা অন্যায় নিক্ষিপ্ত বা অসহ্য বোধ হইলে, সশস্ত্র সাহিত্যক্ষেত্রস্থ হইয়া, সম্মুখ সংগ্রাম করাই সভ্যতানুমোদিত রীতি, এবং সরলতা ও সাহসিকতার পরিচায়ক। শত্রুর সুপ্তাবস্থায় গুপ্তঘাতকের ছুরিকার চালনা করা অন্ততঃ সাহিত্যসেবীদের পক্ষে শোভা পায় না তা আমাদের বড় সাধের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় এইরূপ মহত্ত্বেই পঁহুছিতে চলিয়াছে।

বলিতে কি নিজের নিকটে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়া, সহযোগী সাহিত্যের সমালোচনার স্বপ্রবর্তিত পদ্ধতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপযুক্ত উপায় থাকিলে, আমরা নিশ্চয়ই ঐ অকৃতজ্ঞ কার্য হইতে এতদিন অবসর গ্রহণ করিতাম, প্রতিভাভিমানস্ফীত, বাক্‌সিদ্ধ সহযোগী লেখকবর্গের অতিবেগে অমরপুরগামী অপরিসীম অহঙ্কারের পুষ্টিসাধনে অক্ষম হইলে, তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া কোনও ক্রমেই আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হইতাম না। সংসারে নিজের নির্বিঘ্নতা ও নিশ্চিন্ততা কে না চায়, এবং সম্ভব ও সহজ হইলে, কেই বা তাহার সহিত একমাত্রা অধিক ইস্ট ও আরাম সংযুক্ত করিবার চেষ্টা না করে? মোসাহেবী সমালোচনা ও "বসোয়েলী" উপাসনার বিনিময়ে সুলভ সৌহৃদ্যের সুখসংগ্রহে শক্তিবান না হইলেও, অন্ততঃ সমালোচনাটাকে বাণপ্রস্থে প্রেরণ করা বা অসীম সমাধিতে বিলীন করা, কিছুই অসাধ্য ছিল না। কিন্তু অঙ্গীকৃত ও স্বপ্রবর্তিত কার্যের মধ্যপথ হইতে নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন বা পলায়ন করাটা নিতান্তই কাপুরুষতাব্যঞ্জক, এবং এক্ষেত্রে একান্তই আত্মপ্রীতি ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক হইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার অপ্রীতিকর কাজটা অগত্যাই ছাড়িতে পারি নাই, এবং বলা বাহুল্য যে, এই পত্রের চিরাগত ও অপরিবর্তিত বর্তমান ব্যবস্থায় সেটা সম্প্রতি সম্ভবও হইতেছে না।

আত্মপক্ষের এই কথা কয়টা,—আন্তরিক আক্ষেপেরই কথা কয়টা বলিবার অবসর অনেকদিন হইতেই হইয়াছিল, এবং দিন দিন তাহার কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া, কেবল 'ক্রমবিকাশ' হইয়া চলিলেও, 'বলি বলি' করিয়া বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতি আরোপিত অমূলক অভিযোগ ও অসূয়ার কথা কেবল শুনিয়াই চলিয়াছি, এবং শুনিতেই থাকিব, তাহার সন্দেহ নাই। তথাচ আজ এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, এবং যাহা আমরা অকপটে অনুভব ও বিবেচনা করি, স্পষ্টই ব্যক্ত করিলাম। সরলান্তঃকরণের কথা সর্বত্রই কিঞ্চিৎ সহৃদয়তার সহিত গৃহীত হইবে, মনে করা অন্যায় বা অতিরিক্ত প্রত্যাশা না হইতে পারে। সকলেরই,

বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সুমার্জিত বুদ্ধির অধিকারী সাহিত্যসেবী সহযোগী ও আমাদের সর্বথা শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে বিবেচনা করা কর্তব্য যে, সমালোচনা-সঞ্জাত উচিত উক্তিতে যদি একটা অঙ্কুশ সংযুক্ত থাকা যথার্থ ঘটনাই হয়, তবে একান্ত ইতর ও নিন্দাজীবীর কদর্য জিহ্বা ভিন্ন অপর কোথাও সে অঙ্কুশ অসূয়ার বা অপ্রীতির বেদনাদায়ক অংকুশ নয়; সেটা সমালোচনার নিজেরই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গ। সমালোচনা বিকৃত ও বিকলাঙ্গ না করিয়া, তাহার সে অঙ্গের সে অঙ্কুশের তীক্ষ্ণতা নিস্তেজ তরল ও কোমল করা যদি আদৌ সম্ভব হয়, তবে বড় জোর, তাহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় বিনয় নম্রতার নবনীত মাখাইয়া, বা মাত্রাহীন শিষ্টাচারের অজস্র দুগ্ধ তক্র ঢালিয়া, সে চেষ্টা চলিতে পারে; যদিও অল্পাধিক পরিমাণে তাহা একটা বিসদৃশ ও বিদ্রূপকর ব্যাপার বই আর কিছুই হয় না। কিন্তু তাহারও ঊর্ধ্বে উঠিয়া, সেটাকে যদি তোষামোদে তৈলাক্ত করিয়া স্তুতিবাদের তৈলেই পুনঃপুনঃ 'সাঁতলাইতে' হয়, তাহা হইলে তাহার আর স্বাভাবিক ধাতু রক্ষিত হয় না, সমালোচনা উপাসনারও উপরে আরও অর্ধ গজ অতিরিক্ত উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। "সাহিত্য" তাহাতে অবশ্যই অসমর্থ। নহিলে পার্যমানে কাহারও আত্মাভিমানে ন্যায় বা অন্যায় আঘাত করিয়া, অপ্রীতি উৎপাদন করিতে ও অভিসম্পাতভাজন হইতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা করে না। কেন করিবে? "সাহিত্য" তাহার জন্মাবধি শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে, পরিচিত অপরিচিত বিচার না করিয়া, সকলকেই যথাবিহিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে; তাহা হইতে কখনও বিচলিত হইবে না।

অন্ততঃ এই একটা বিষয় আমরা নিঃশঙ্ক ও নিঃসংশয় চিত্তে ব্যক্ত করিতে পারি যে, "সাহিত্য" সাহিত্যক্ষেত্রে আর কিছু করিতে না পারুক; অদ্যাবধি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও সেই সদা-পরিবর্তনশীলা সংসারে নিজের অবলম্বিত অভিমত, নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রত্যাহার বা অস্বীকার করে নাই। সুখে দুঃখে, সুখ্যাতি ও নিন্দায়, সে আত্মগত প্রণালীতেই পরিচালিত হইয়া একই নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে; চাঞ্চল্যে চালিত বা সুবিধা-অসুবিধার বশবর্তী হইয়া, স্বপথবিচ্যুত ও স্বধর্মভ্রষ্ট হয় নাই, ইহাই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা। এবং সত্যপরায়ণ হইলে, তাহার শত্রু ও প্রতিযোগী পক্ষেরও কেহ ইহা অস্বীকার করিবেন না, এমন আশাও করিতে পারি। সাহিত্যের সমালোচনা সময়ে উগ্র, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতে পারে, হইয়াই থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উপাদান ও অভিপ্রায় কখনও নিছক নিন্দা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তবস্তুতি নহে; ইহাও অপক্ষপাতী বিচারকগণ স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। সুখ্যাতির স্থলে "সাহিত্য" মুক্তকণ্ঠেই সুখ্যাতি করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে কর্তব্যানুরোধে দোষ দর্শাইতেও সে সংকুচিত হয় না। তথাচ, সবিশেষ ক্লেশের সহিতই তাহাকে সে কার্যটি সম্পন্ন করিতে হয়! যাঁহাদের আত্মাভিমান আত্মপ্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে চায় না, মৃদু স্পর্শেই মানিনী কামিনীর মত ফণা

উঁচাইয়া 'ফোঁস ফোঁস' গর্জে, প্রধানতঃ তাঁহারাই সাহিত্যের সমালোচনায় সব সময় ঠিক আপনাদের বাঞ্ছানুরূপ বস্তুটি না পাইয়া, তাহাতে অসূয়া অশিষ্টাচারাদির স্বকপোল কল্পিত গন্ধ পান, এবং সেই গন্ধে মগজগুলোকে পরিপূর্ণ ও প্লাবিত হইতে দিয়া অসীম আত্মপ্রশংসাপিপাসার নিদারুণ অন্তর্জ্বালায় অগ্নিক্ষিপ্ত বার্তাকুবৎ দীর্ঘদাহে দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। জানি না, ইহা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক দুঃখের দহন; কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা তাঁহাদের আত্মসৃষ্ট অহেতুক দুঃখ, এবং দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্খাজনিত দুর্গতি। সংসারের অসংখ্য প্রকৃত ক্লেশের অতিরিক্ত জীবের এই আত্মকল্পিত অসহ্য ক্লেশে আমরা নিজেই নিরতিশয় ক্লিষ্ট। কিন্তু এই ক্ষুদ্র "সাহিত্য" কোনও অংশে ইহার কারণ নহে। তথাপি যদি "কারণ" বলিয়া কল্পিত হয়, সেটা অমূলক কবি-কল্পনামাত্র,—কল্পনাকারীর ভ্রান্তি ও সাহিত্যের অভাগ্য।

"সাহিত্য" সাহিত্যাধিকার ভিন্ন অপর কোনও অধিকারেই কখনও কাহারও সমালোচনা করে না। সম্যক্‌রূপে সেই অধিকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া, এবং তাহার অতীত, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া সকলেরই, বিশেষতঃ সব্রতে ব্রতী সাহিত্যসেবী মাত্রেরই শুভকামনা করে। সব সময়ে সকলকে তুষ্ট করিতে না পারিলেও কখনও রুষ্ট করিতে চাহে না; ইহা উল্লিখিত আত্মসংহত্ত্বাভিমানী ও কৃত্রিমকলাভিনয়ী ক্রূর ও কপট ব্যক্তিগণ ভিন্ন আর সকলেই বুঝেন ও বুঝিবেন, সন্দেহ নাই।

(সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৮ হইতে সংকলিত।)

৭

একটি পত্র

সহৃদয়েষু,—অল্পদিন হইল, আমি কোন কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোন কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমত সমালোচনা বলা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, আমার সেই লেখাটুকুকে সমালোচনা না বলিয়া আর কোন উপযুক্ত নাম দিলে যদি তাহার ভাব গ্রহণের অধিকতর সুবিধা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি, সমালোচক অনেক সময়ে নিজের নামকরণের সহিত নিজে বিবাদ করিয়া লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। পদ্মমাত্রকেই পদ্মলোচন নাম দেওয়া যায় না—যদি মোহবশতঃ অপাত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যদি সেই নামধারী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি চক্ষুর আকৃতির অপেক্ষা

নাসার দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর রাগ করা সঙ্গত হয় না।

সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বুঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয় আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—কিরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহসপূর্বক বলিতে পারি না—যিনি বিশেষ কৌশল পূর্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশী বুঝেন তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়, ভূমিকা এবং উপসংহার ফাঁদিয়া আগাগোড়া মিল করিয়া বড় বড় প্রবন্ধ লেখা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হওয়াতে পৃথিবীতে অনেক বাজে কথা এবং মিথ্যা কথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর মানুষের একটি বর্বর অনুরক্তি আছে---এইজন্যে প্রায় সকল জিনিসেরই গজে মাপিয়া মূল্য স্থির হয়। এই কারণেই সকল কথা বড় করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু সত্য রবারের মত স্থিতি-স্থাপক পদার্থ নয়। বরঞ্চ তাহাকে বাড়াইতে গেলেই কমাইতে হয়। খাঁটিকে খাঁটি করিতে হইলে তাহাকে যেমনটি তেমনই রাখিতে হয়, ওজন বাড়াইবার জন্য তাহাতে যতই জল মিশান যায়, ততই তাহার দর কমিয়া আইসে। একটা কাব্যগ্রন্থ যখন ভালো লাগে, তখন তাহার সম্বন্ধে বেশী কথা বলা কতই শক্ত! ঠিক মনের কথা, তাহা লিখিলে রীতিমত প্রবন্ধ কিম্বা গ্রন্থ হয় না। এই জন্য বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া, পরিচ্ছেদের উপর পরিচ্ছেদ স্তূপাকার করিয়া, তত্ত্বের উপর তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া, নিজের মানসিক পরিশ্রমের একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া, সেটাকে খুব একটা উন্নত সত্য বলিয়া মনে হয়। বেশি পরিশ্রমের ধনকে বেশি গৌরবের বলিয়া মনে হয়। মাঝের হইতে যেটি ঠিক সত্য, যেটি আসল কথা, সেটি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

ঠিক সত্য মানে কি? কাব্যসম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ-সাতশ' প্রমাণ তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি ততটুকু সত্য। অবশ্য শিক্ষা এবং প্রকৃতিগুণে কোন কোন সহৃদয় বিশেষরূপে কাব্যরসজ্ঞ, এবং তাঁহাদের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত সাহিত্যপ্রিয় লোকদের নিকট চিরকাল সমাদৃত হয়। অপর পক্ষে কোন কোন হৃদয়ে কাব্যের জ্যোতি রীতিমতো প্রতিফলিত হইবার মত স্বচ্ছতা নাই, কিন্তু যেমনই হউক, কাব্যসম্বন্ধে নিজের নিজের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না।

কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া, নিজের

ভালোমন্দ লাগাকে খাতির না করিয়া, বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূলে পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।

একথা অস্বীকার করা যায় না, একজন অশিক্ষিত লোকের যাহা ভালো লাগে শিক্ষিত লোকের তাহা ভালো লাগে না, এবং অশিক্ষিত লোকের যেখানে অধিকার নাই, শিক্ষিত লোকের সেখানে বিহারস্থল। অর্থাৎ বুনো আম গাছ মাটি এবং বাতাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু বহুকাল চাষের গুণে সেই গাছের এমন একটা পরিবর্তন হয় যে, মিষ্ট রস উৎপাদন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কিন্তু দুই গাছই একই পদ্ধতি অনুসারে ফল ফলায়। উভয়েই নিজের ভিতর হইতে কাজ করে।

কাব্য-সমালোচনা-সম্বন্ধে ও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিজের হৃদয় দ্বারা রস গ্রহণ করে, তবে অবস্থা গতিকে হৃদয়ের পার্থক্য জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানের মীমাংসার স্থল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসার স্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না।

এইজন্য কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির মধ্যে পড়িয়া আর একরূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে, ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশ কাল পাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়। তখন তাহা হইতে কেবল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সম্ভব। আরো একটি কথা আছে। বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে কোন তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোন আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোন কালে মিথ্যা হইবার যো নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে পারি, যাহাতে আমার ভালোমন্দলাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু আমি যদি একটা ভ্রান্তমত অধিকাংশ সাময়িক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি তথাপি সেটা স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্য মতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্তমান কালের স্বদেশবৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হউক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্তনকালে তাহার কোন মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে কতখানি ভালো লাগে, আমি যদি ভালো করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, আমি যদি সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কি সুন্দর, তবে সে কথা কোন কালে অমূলক হইয়া যাইবে না।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দিয়া কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব-হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবলই তাহাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্তে ভাব প্রকাশ করা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য ৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১২৯৯। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে লিখিত।

৮

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

"সাহিত্য সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু"—

"পুরী।"
"৬ই ফাল্গুন।"

"মান্যবরেষু

চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল একদিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে যে দুই-একটা কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

"বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোন লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই।

"আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিকপত্রের সমালোচনা বাহির

হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়—দুই-একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃ প্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উপর্যুপরি অনেকগুলি বাদ-প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধনা করিতেছিলাম, তবে তাহা আপনার ভ্রম—ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। "কড়াক্রান্তি" প্রবন্ধে এমন দুই-একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।*

"হিং টিং ছট্" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন "অনেকেই বুঝিয়াছে, যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু—" এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই অবশ্য আপনি অনেককে জানেন এবং আমিও অনেককে জানি—আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

"চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ

* তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্যে মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের "আদর্শ সমালোচনা"র দু-একটি ছত্র মনে পড়ে।

কর্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কোন কাজ করিতে পারে এ কথা দেশ কাল পাত্রবিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

"আপনি লিখিয়াছেন "মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই ত রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।" মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মত শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

"উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচারদ্বারা পৃথিবীতে কোন উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য এ কার্য যদি বারম্বার করার আবশ্যক হয় তবে বারম্বারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারম্বার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার পুনর্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোন গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। —শ্রীরঃ

সাহিত্য ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩০০

৯

পূর্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রবাবুর পত্র সম্বন্ধে শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতির বক্তব্য

গতবর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে "তর্কবৈচিত্র্য" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধপ্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র।

কিন্তু, এই পত্র একসঙ্গে সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্রবাবু কোন্ বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই। সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নিজের নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়া পাঠানোই রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্রবাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেইজন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহার অনুরোধে এবং সাধনায় অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িক পত্রের লেখক ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্রবাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। "তর্কবৈচিত্র্য" প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন দিতে পারেন।

সাহিত্য-সম্পাদক

সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০০

১০

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পত্র

(কলিকাতায় কার্যোপলক্ষে গেলে রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করিয়া আসিতাম না। ইহাতে চিঠি লিখিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমিয়া যায়, আলাপ-

প্রসঙ্গেই নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। কিন্তু যখন মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অভিনন্দন লইয়া কলিকাতার পত্রিকাদিতে আলোচনা হয়, তখন প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য, এবং যাহা অভিনব অথচ সর্ববাদিসম্মত নহে, তাহাতে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল এইরূপ লিখি। তদুত্তরে '২য় পত্র'খানি পাই।)

২য় পত্র

১২, পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০শে মাঘ, ১৩১৮।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। (রবীন্দ্র সম্বর্ধনার বিবরণ সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দনপত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র-পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র, কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান নির্দেশের বা পদবী-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই।) রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপ যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে।

বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা-প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ-গ্রন্থ-সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি

সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্বতন 'সাহিত্যরথী'দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। 'কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেন না; কেন না বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মরমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 'নবীনচন্দ্রের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চূণকালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন, ও উহা পরিষৎ-মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্তিস্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব অন্যায় করিয়াছেন তাহা বলা চলে না। অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। এই চাঁদা সর্বসাধারণের নিকট তোলা হয় নাই, তাঁহাদের নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালা শিক্ষিত-সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশমাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সম্বর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফঃস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন, বুঝি না।

হুগলীর সাহিত্য-সম্মিলনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব, এই আশাতে আছি। তখন অনেক কথা বুঝাইবার ও জানাইবার অবসর পাইব। আমরা যথাসাধ্য কর্তব্য সম্পাদন

করিয়া যাইতেছি—তবে বুদ্ধির দোষে, বিবেচনার দোষে, সামর্থ্যের অভাবে, অবকাশের অভাবে আমাদের নানা ত্রুটি, নানা অপরাধ ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতে পারে। এবং যেখানে বহুমতাবলম্বী বহুলোকের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে হয়, সেখানে কোন কাজই সর্ববাদীসম্মত হয় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদের ত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করিবেন। যেখানে ত্রুটি দেখিবেন, সেখানে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন। আপনাদের মত বন্ধুর পরামর্শ ও উপদেশ আমরা সর্বদা শিরোধার্য করিব। তথাপি ত্রুটি পদে পদে ঘটিবে। দেশের অবস্থা বুঝিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন ও সহিয়া লইবেন।

প্রদর্শনী উপলক্ষে পরিষদের কার্যালয় এক মাসের উপর একরকম বন্ধ আছে। আপনার প্রেরিত পুস্তকগুলির কোন সন্ধান লইতে বা ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমি নিজে অসুস্থ হইয়া এক মাস কলিকাতার বাহিরে ছিলাম। সম্প্রতি ফিরিয়াছি।

আপনার কুশলপ্রার্থী

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তৃতীয় পত্রের শেষ প্যারাগ্রাফ)

"রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সম্বর্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখাইয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থির হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না, আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইবে না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখরক্ষা হইয়াছে। আপনার কুশল প্রার্থনা করিলাম।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, শ্রাবণ (১৩২৭) সংখ্যায় প্রকাশিত সুরেশচন্দ্রকে লিখিত *রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পত্র থেকে সংকলিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ।